রহস্যভেদী বাসব

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর- ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

প্রখ্যাত রহস্য ঔপন্যাসিক কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "রহস্যভেদী বাসব"-এর শেষ খন্ড প্রকাশিত হল। আশা করি, আগের খন্ডগুলির মত এই খন্ডটিও গুণগ্রাহী পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। ইতি,

প্রকাশক

ঃ শেষ খণ্ডে যে যে গল্প আছে ঃ

শঙ্খচীলের কান্না

রীমা রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল।

পাঁচটা কুড়ি। শীতের বিকেল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। শাল ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসাবিত করল। গজ পঁচিশেক দূরেই 'ইস্টর্ন-ইলেকট্রনিক্স'-এর নিয়ন সাইন করা বিরাট বোর্ডটা চোখে পড়ল। ওখানে পৌঁছে রিকশা থেকে নামল রীমা।

দোকানের বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে, সুদৃশ্য কাযদায় থরে থরে সাজানো টি. ভি. এবং আরো কত কি। কাচের ভারি পাল্লা দেওযা দরজা ঠেলে রীমা ভেতরে প্রবেশ করল। তখন দোকানে মাত্র দুজন ক্রেতা। একজন তরুণ কর্মচারী প্রায় ছুটে এল।

বিস্ময়ের সুরে বলল, বৌদি—আপনি—

—চলে এলাম। তোমাদের সাহেব কোথায়?

—অফিস ঘরে আছেন। কি সমস্ত হিসাব করছেন।

রীমা নিজের অ্যাটাচিটা তার হাতে গছিয়ে দিয়ে অফিস রুমের দিকে চলল।

সুইংডোর। হাতের ছোঁয়া পেতেই একধারের পাল্লা সরে গেল। প্রদোষ তখন এক মনে কি লিখে চলেছে। ওর ধারাল মুখে পরিশীলিত ভাব বিরাজ করছে। রীমার মনের মধ্যেটা উদ্বেল হয়ে উঠল। ভারি নিঃশ্বাসের চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে।

প্রদোষ মুখ তুলল।

অবাক হয়ে গেল!

তারপর হাসি মুখে বলল, একি! ম্যাডাম, আমার পর্ণকুটির খালি করে এই সময় এখানে!

—তোমার জন্য মন কেমন করছিল।

—কি কথাই শোনালে। জান, এক এক সময় কি মনে হয়?

রীমা টেবিল ঘুরে প্রদোষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কি মনে হয়?

—মনে হয়, ব্যবসা-ট্যাবসা সব ছেড়েদি। এমন কোথাও চলে যাই যেখানে যুগযন্ত্রণার আঁচ নেই। আমরা দুজনে দুজনের ভালবাসার মধ্যে ডুবে থাকবো।

হাসবার চেষ্টা করে রীমা বলল আর পেটের যন্ত্রণা? আমরা খাব কি?

—তাও তো বটে। তখন দেখা যাবে—

কথা শেষ করে প্রদোষ উঠে দাঁড়াল।

—এখানে বাড়াবাড়ি করবে না। সুইংডোর ঠেলে যে কেউ এসে পড়তে পারে।

প্রদোষ আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

রীমা টেবিলে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সান্যালমশাই, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—বলো—

—দুপুরে মা ফোন করে ছিলেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য যেতে বললেন। কি সমস্ত কথা আছে।

—বেশ তো! কাল সকালে কোন ট্রেন ধরে নাও।

রীমা প্রদোষের কাঁধে হাত রেখে বলল, আজই যেতে হবে। মা ঐ কথাই বললেন। আমি বরং সকালের কোন ট্রেনে ফিরে আসব।

—আজই যখন যাবে তখন ঘণ্টা কয়েক আগে বেরুলে না কেন? দিন সময় ভাল নয়। রাত হয়ে যাবে—

রীমা মৃদু হেসে বলল, আগে বেরুতাম কি ভাবে? তোমার রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো? রামচরণকে বুঝিয়ে এসেছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—তা না হয় হল। কিন্তু তোমার মা হঠাৎ ডেকে পাঠালেন কেন বলতো?

—বোঝা যাচ্ছে না! দেখি গিয়ে। এবার কিন্তু স্টেশনে যেতে হবে।

—এখন তো কোন লোকাল নেই।

—তুফান ধরব। ফোনে খোঁজ নিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা লেট রান করছে।

প্রদোষ রীমাকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশানে পৌঁছাল। ফাস্ট ক্লাসের একটা টিকিট কেটে, প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে ঢুকতেই এসে পড়ল তুফান এক্সপ্রেস। প্রথম শ্রেণীতে বিশেষ ভীড় ছিল না।

দশ মিনিট রুখে থাকার পর ট্রেন ছাড়ল। হাত নেড়ে স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে প্রদোষ ফিরে চলল। করিডর পেরিয়ে 'সি' কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসল রীমা। মন ভাবি চঞ্চল হয়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না। থেকে থেকেই প্রদোষের কথা মনে পড়ছে। ভারি অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। ওর মত স্বামী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু যে জালে জড়িয়ে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পেতে হলে প্রদোষের সাহায্য নেওয়া চলে না। তাহলে প্রদোষ ওকে ঘৃণা করবে—চিরকালের মত হারিয়ে যাবে। তাই একাই এগিয়েছে পথ পরিষ্কার করতে।

এখন সাতটা পনেরো।

তুফান হাওড়ার আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল।

ধীরে-সুস্থে ট্রেন থেকে নামল রীমা। অ্যাটাচি হাতে নিয়ে দশ পাও বোধহয় এগিয়ে যায়নি—উদয়কে আসতে দেখল! সিগারেটের টুকরোটা একধারে ফেলে দিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল উদয়। তার সারা মুখে যেন একটা বেপরোয়া হাসি লেগে রয়েছে।

আমি জানতাম তুমি আসবে।

ভ্রূ কুঁচকে রীমা বলল, আমি আসতে বাধ্য হয়েছি তাও তোমার অজানা নয়।

—এতো রাগের কথা। জীবন দুদিন বইতো নয়, যতদূর সম্ভব হেসেখেলে

কাটিয়ে দেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

—তোমার মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। আনন্দের ফোয়ারা ছোটাতে গিয়ে আমায় কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছো। তা যদি একবার ভেবে দেখতে।

—দেখো ডার্লিং—

রীমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, ঐ ধরনের সম্বোধন আমার ভাল লাগে না।

উদয় এবার ভারি গলায় বলল, তোমার কি ভাল লাগে আর কি লাগে না, তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি যা চাইবো তাই হবে। আপত্তি করলে, আমি তোমায় কোথায় পৌঁছে দিতে পারি ভালই জান।

—প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

—এস—

উদয়ের হাতেও একটা ছোট সুটকেস ছিল। ওরা ক্রমে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে এসে পড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল লাইনে। ট্যাক্সি পেতে মিনিট কুড়িক সময় লাগল। বসল দুজনে ভেতরে।

ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থলেব নির্দেশ দিয়ে, চাপা গলায় রীমাকে প্রশ্ন করল উদয়, দু'দিনের মেয়াদে এসেছো তো?

—হ্যাঁ—

আর কোন কথা হল না।

"ইস্ট এন্ড' হোটেলের সামনে ট্যাক্সি এসে থামল এক সময়। ওরা ঢুকলো ভেতরে। সামনেই রিসেপসন কাউন্টার। ঘর পাওয়া গেল। ফর্মে উদয় নিজের নাম প্রশান্ত ঘটক এবং স্ত্রী মিতা ঘটক হিসেবেই উল্লেখ রাখল। ওরা আসছে পাটনা থেকে।

১২০ নম্বর ঘরে বেয়ারা ওদের পৌঁছে দিল।

বেশ সাজানো গোছান ঘর। দুজনের পক্ষে চমৎকার। উদয়ের মন ক্রমেই রসসিক্ত হয়ে উঠছে। পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বেয়ারার দিকে এগিয়ে ধরল।

বলল, গোটা চারেক ডিম ফ্রাই করে নিয়ে এস। ঐ সঙ্গে এক প্লেট কাজুবাদামও আনবে। সল্টেড হয় যেন।

বেয়ারা চলে যাবার পর উদয় দরজার ল্যাচ তুলে দিল।

রীমা বলল, এখন তুমি আমাকে ছোঁবে না।

উদয় অবাক।

—কেন?

—এখন নয়।

—তুমি কি মনে করছো, তোমাকে পুজো ক'বার জন্য এখানে এনেছি?

রীমা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তোমার মত উন্মাদের কাছ থেকে ঐ ধরনের কিছু আশা আমি করি না।

উদয় হাসল।

—তুমি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছো। কি চাইছো আর কি চাইছো না তার কোন দাম নেই। আমি যা চাইব তাই হবে।

—বললাম না, এখন নয়।

—এখনই—

এবার রীমা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—হাতের মুঠোর মধ্যে থাকলেও, এই মুহূর্তে তোমার বারটা বাজিয়ে দিতে পারি। চেঁচিয়ে লোক জড় করব। নিজের ভবিষ্যত না ভেবেই ম্যানেজারকে বলব, এই লোকটা জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। পুলিশ আসবে। আমাকে উদ্ধার করে আশ্রমে পাঠাবে—তোমাকে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে জেলে।

উদয় থতিয়ে গেল।

—এরকম করবে কেন?

—করতে চাই না তো। এখন বাড়াবাড়ি করলেই করবো। সারাটা রাত পড়ে আছে। অনেক সময় পাবে। ডিম আর কাজুবাদাম আনতে দিয়েছো, মদ খাবার জন্যে তো? তাই এখন খাও।

উদয় এবার জোরে এসে উঠল।

—তোমার স্বভাবের এই বাঁধুনির তুলনা হয় না। তাইতো তোমাকে ভুলতে পারিনি। অনেক ছুটোছুটি করে এতদিন পরে তোমাকে খুঁজে বার করেছি।

—তোমার আশা এখনও মিটছে না। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছো বলতো? এখনও নিজেকে সংযত কর। নইলে নরকেও জায়গা হবে না।

—শুনেছি, নরকের নীচেও নাকি একটা জায়গা আছে। তাকে রৌরব নরক বলে। আমি ঐ জায়গাটা দেখতে চাই।

—তোমার মত লোক বেঁচে থাকে কেন বুঝি না।

—তোমাদের সৌন্দর্যের মূল্য আমার মত লোকই দিয়ে থাকে। তাইতো আমার বেঁচে থাকা দরকার। কি যেন নাম লোকটার? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, প্রদোষ সান্যাল। তোমাকে ভালবাসে?

—প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আমিও। কেন আমার জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছ। তোমার সঙ্গে তো অনেক মেয়ের সম্পর্ক। আমাকে বাদ দাও না।

—তা হয় না। তুমি হলে টপ অফ দি লিস্ট। তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস না—বাধা দিচ্ছি না। আমার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখ। কোন অসুবিধা হবে না। দেখবে শেষ পর্যন্ত কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

রীমা কিছু বলতে যাবার আগেই দরজায় করাঘাত হল। উদয় উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই, বেয়ারা ডিম আর কাজুবাদামের প্লেট রেখে গেল। উদয় সুটকেস থেকে ব্যাগপাইপারের বোতল বার করল। বোতলের সিল ভেঙে গেলাসে দেড় পেগের মত ঢেলে নিয়ে রীমার দিকে তাকাল। গেলাসে জল মেশাল তারপর।

—চাখবে একটু?

—আমি মদ খাই না।

—বিয়ার খাও। বিয়ার মদ নয়। এক বোতল আছে সুটকেসে।

একটু থেমে রীমা বলল, খেয়ে দেখতে পারি। তবে গেলাসে নয়—ক্যান'এ। দেখ, যদি জোগাড় করতে পারো।

—হোটেলে বিয়ার ক্যান তো থাকা উচিত। দেখি—

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে উদয় এগিয়ে গেল। সুইচবোর্ডে কলিংবেল অকেজো থাকায় ঘরের বাইরে চলে গলে। এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল রীমা। বলতে গেলে এই সুযোগ ও তৈরি করেছে। দ্রুত-হাতে ব্লাউজের মধ্যে থেকে বাদামী রং-এর ছোট একটা প্যাকেট বার করল। তারপর হুইস্কিতে ভরা গেলাসে প্যাকেটের মধ্যেকার সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে দিল।

মিনিট কয়েক পরেই একটা বিয়ার ক্যান হাতে নিয়ে উদয ঘরে ফিরে এল। সুটকেস থেকে বিয়ারের বোতল বার করে, ওপনার দিয়ে মুখ খুলল। তারপর সফেন বিয়ার ক্যান এগিয়ে ধবল রীমার দিকে। কায়দা মত পাত্র ঠেকিয়ে নিল।

উদয় বলল, আমি তোমার সুমতি কামনা করে আরম্ভ করছি।

কথা শেষ করেই এক নিঃশ্বাসে সিকি গেলাস শেষ করে ফেলল। পাকা নেশা। রীমা কিছু বলল না। ক্যান ঠোঁটে ঠেকাতেই মুখ বিকৃত করল। কি বিশ্রী—কি তেতো।

—কি হল?

—এক চুমুকেই বুঝতে পেরেছি কি বিশ্রী খেতে।

রীমা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিয়ারের ক্যান হাতেই রয়েছে। মন্থর পায়ে এগিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে উদয় ফিকে হাসল, আবার মন দিল হুইস্কির সেবায়।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে বাথরুম থেকে বেরুল রীমা। উদয় তখন সোফায় হেলে বসে আছে। চোখ বন্ধ। ঝিমিয়ে পড়েছে। ঝুলন্ত ডান হাতে ধরা সিগারেটটা পুড়ে চলেছে। রীমার বুঝতে অসুবিধা হল না, "রেব্ল" তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এখুনি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভাল হত।

কিন্তু কোন মতেই তা সম্ভব নয়। সাড়ে নটা বেজে গেছে। এই অসময় একা হোটেল থেকে বেরুতে গেলেই সন্দেহ দেখা দেবে। সুতরাং ভোর হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। লোকটা মরবে না। পঙ্গু হয়ে গেল। অনেক অন্যায় করেছে—নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে এই উপায়কে অবলম্বন করতেই হল। কোন মূল্যেই প্রদোষকে হারাতে চায় না রীমা।

দরজায় করাঘাত হল।

কে এল? ঝনঝনিয়ে উঠল সারা শরীর। ঝটিতে তাকাল উদয়ের দিকে। ওর শরীর আরো হেলে পড়েছে। মুখে যেন কালো রং মেড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার করাঘাত হল। কোনরকমে সোফা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রীমা। দরজা খুলে পাল্লার বাইরে মুখ বাড়াল। বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।

—কিছু বলবে?

—খাবার কথা জানতে এসেছিলাম।

—খাবার আমাদের সঙ্গেই ছিল। আর কিছু দরকার হবে না।

বেয়ারা চলে গেল।

রীমা দরজা বন্ধ করে খাটে এসে বসল। মনের মধ্যেকার চাঞ্চল্য দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। উদয়ের দিকে যাতে চোখ না পড়ে সেটাই এখন তার প্রধান কাম্য। এই সঙ্গে ভেবে পাচ্ছে না, দীর্ঘবাত এই পরিবেশে কিভাবে কাটাবে? অথচ মাস দেড়েক আগে হঠাৎ যদি উদয় দুষ্ট গ্রহের মত ওর সামনে গিয়ে উপস্থিত না হত, তবে আজকের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না।

সেদিন ছিল বুধবার।

প্রদোষ নটার সময় দোকানে বেরিয়ে যায়। সাড়ে এগাবটাব সময় ক্যাসারোল-এ খাবার রেখে চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। প্রদোষ ফেরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আজও খাবার পাঠিয়ে দেওয়ার পর, নিজে খাওয়া দাওয়া সেরে লন'এ বসেছিল রীমা। খবরের কাগজ পড়া তখনও শেষ হয়নি, রুচী এসে পড়ল।

রুচী ডাঃ সুকান্ত সেনের স্ত্রী। সুকান্ত প্রদোষের বন্ধু। কাজেই রুচীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে রীমার। দুজনের বাড়িতে যাতায়াত লেগেই আছে। দেড়টা আন্দাজ রুচী এল। খুশি হল রীমা। দুজনে গল্প করতে করতে তিনটে বাজিয়ে দিল। চা খাওয়ার সময় হয়ে এল। রুচী কিন্তু চা খেতে রাজী হল না। ঐ পর্ব সে ডাক্তাবসাহেবের সঙ্গে সারবে।

রুচী চলে যাবার পর, লন পেবিয়ে বাড়ির দিকে যাবার মুখেই রীমা লক্ষ্য করল, স্মার্ট দর্শন একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ ওর দিকেই এগিয়ে আসছেন গেট পেরিয়ে। কাছাকাছি আসতেই আগন্তুককে চিনতে পারল রীমা। আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথার উপর। এই লোকটা এতদিন পরে এখানে কেন? এখন এমন অবস্থা সরেও যাওয়া যায় না।

আগন্তুক মুখোমুখি এসে বলল, কেমন আছো?

—কেন এলে এখানে?

—এ কি ধবনেব আপ্যায়ন? তোমার বাড়িতে এসেছি, বসাও—চা টা খাওয়াও। তা নয়—

—অনুরোধ করছি উদয়দা, তুমি এখান থেকে যাও।

উদয়ের মুখে বিচিত্র হাসি দেখা দিল।

—তা কি করে হবে? কত খোঁজাখুঁজির পর এত বছর পরে তোমার সন্ধান পেয়েছি। এখন যাব কি? কথাবার্তা হোক। তারপর—

রীমা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, না আর কোন কথা নয়।

—তুমি বললে আর আমি শুনবো? মাথা নীচু করে এখান থেকে চলে যাব? রীমারানী মনে হচ্ছে আমার স্বভাবের কথা তুমি ভুলে গেছ।

—কি বলতে চাও, বল? আমার কাজ আছে।

উদয় বলল, মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে আসবো, এই কথাই তোমাকে আজ বলতে এলাম।

এবার রীমা অনুনয়ে ভেঙে পড়ল।

—কেন তুমি আমার জীবন নষ্ট কবে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগছো? আমি হাতজোড় করে অনুনয় করছি উদয়দা, আর এখানে এসো না। বিয়ে করে ফেল। এই ছন্নছাড়া জীবন থেকে তুমিও মুক্তি নাও।

—বিয়ে! বাজার থেকে দুধ কিনতেই আমার ভাল লাগে। গোয়ালের গরু বাঁধা আমার পোষাবে না! কে বলল তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? আমরা চুপি চুপি মেলামেশা করবো। তুমি তোমার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস না—আমার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

সেই শুরু—

প্রায়ই আসতে লাগল উদয়। ওকে বাধা দেওয়া যাচ্ছে না। ওব কাছে আছে অনেকগুলো চিঠি আর এক সঙ্গে তোলা ছবি। প্রথম জীবনের ভুল পদক্ষেপ এখন রীমাকে আশঙ্কা আর অস্বস্তির অতলান্তে নিয়ে যাচ্ছে। রীমা এখন মরিয়া হয়ে চিন্তা করছে, কিভাবে এখন ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা যায়। কোন মূল্যেই সে প্রদোষকে হারাতে চায় না।

কতদিন বলেছিল, ঐ চিঠিগুলো আর নেগেটিভ আমাকে বিক্রি করে দাও না?

—কত দাম দেবে?

—কত চাও তুমি?

উদয়ের নির্বিকার উত্তর দশ লাখ।

—ঠাট্টার কথা নয়। রিজনেবল হবাব চেষ্টা কর। আমি তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারি।

—বরং ঐ টাকাটা তুমি আমার কাছ থেকে নাও না। টাকার কথা আনছো কেন? তুমি ভালই জান আমার টাকার অভাব নেই। আমি তো শুধু তোমার মিষ্টি সঙ্গ উপভোগ করতে চাই।

কাজেই রীমাকে মনস্থির করে ফেলতে হল।

ডাক্তারের বৌ-রুচী। তার মুখেই শুনেছিল তাদের দুর্দান্ত ডোভাবম্যান কুকুরটাকে কোন মতেই বশে আনা যাচ্ছিল না। শেষে কুকুরটাকে একটা বিশেষ ধরনের ওষুধ খাইয়ে দেওয়ায় স্বভাব নরম হয়ে এল। আবার এই ওষুধ মানুষ খেলে শরীর পড়ে যাবে—বাক্‌রোধ হয়ে যেতে পারে।

ফোন করে রুচীকে রীমা ডেকে পাঠাল।

আধ ঘণ্টাখানেক গল্প গুজব হবাব পর রীমা বলল, তোমার কুকুরটা এখন কেমন আছে?

—বেশ শান্ত হয়ে গেছে। আর কামড়াতে আসে না।

—ওষুধের কেরামতি আছে বলতে হবে।

আমাব কর্তা ডাক্তার বলেই, ওষুধটা খুঁজে বার করতে পেরেছেন।

—কি যেন নাম?

—'রেব্লু'

—আমার ভাই কিছু রেব্লু দরকার পড়বে।

বিস্মিত গলায় রুচী বলল, দরকার পড়বে মানে! তোমার কুকুর কই?

—আমার এক আত্মীয়ের কুকুর। ভারি দুর্দান্ত। ওঁদের ওষুধের কথাটা বলেছি।

—কোন্ জাতের কুকুর?

রীমা ইতস্তত করল।

—জাত?...মানে হ্যাঁ...মনে পড়েছে, পমেরিয়ান।

আকাশ থেকে পড়ল রুচী।

—বল কি। পমেরিয়ান তো সোফায় বসা কুকুর। ভারি শান্ত মেজাজের হয়। তুমি বলছো—

—এক একটা ঐ রকম পাগল হয়ে যায়। ওষুধটা কবে দিচ্ছ বল?

উনি চেম্বার থেকে ফিরলে চেয়ে রাখবো। কাল দুপুবে তুমি আমার ওখানে এস না। তখন দিয়ে দেব।

রেব্লুর একটা ছোট প্যাকেট যথা সময় রীমার হাতে এসে পড়ল। রুচী মনে করিয়ে দিল মানুষের পেটে কোন ক্রমেই এই ওষুধ যেন না যায়। ফল ভারি খাবাপ হবে। রীমা এখন ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে ফল শুধু খারাপ হয়নি চমৎকারভাবে তার মনের মতই হয়েছে।

অস্বস্তিতে ভরা রাত রীমা কোনরকমে কাটাল। তখন পাঁচটা কুড়ি। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল, আকাশ তেমন পরিষ্কার হয়নি। অন্ধকারভাব কেটে যেতে আরো কিছু সময় লাগবে। উদয় সেই একই ভাবে পড়ে আছে সোফায়। চোখ বন্ধ—মুখে একটা কালচে ভাব নেমেছে।

রীমা ওদিকে আর না তাকিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ভয় ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। প্রাতকৃত্য সেরে বাথরুম থেকে যখন বেরুল, ছটা বেজে গেছে তখন। ঘব থেকে করিডরে বেরিয়ে এল। চাবি লাগিয়ে দিল দরজায়। এরপর যতদূর সম্ভব নিজেকে সহজ করে নিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল।

হোটেল তখন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠেনি। দুজন সুইপার ধোয়ামোছা করছে। রীমা সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নামল। কাউন্টার খালি। কাউন্টারের এক ধারে চাবিটা রেখে কাচের পাল্লা দেওয়া বড় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার ওপারে যেতে পারলে আর কোন ভয় নেই!

ঠিক এই সময়—

—ম্যাডাম—

রীমা চমকে উঠল।

মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল ওদের ফ্লোরের বেয়ারাকে। সিঁড়ি পেরিয়ে নেমে

আসছিল সে। তীব্র ভয় রীমাকে সাপটে ধরল। এই উটকো ঝামেলা কি এই সময় দেখা দিতে হয়? বেয়ারা কাছে এসে পড়ল।

—ম্যাডাম, এত সকালে বেরুচ্ছেন—

—বেলতলায় যাব একবার। মাসীমা থাকেন।

—চা খেয়ে গেলেন না! সাহেবকে চা দেব?

—উনি এখন ঘুমচ্ছেন। আটটার সময় চা নিয়ে যেও। আমিও তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।

বেয়ারা কাচের পাল্লা সরিয়ে রীমাকে বাইরে যেতে সাহায্য করল। তারপর হোটেলের বাইরে অপেক্ষমান ট্যাক্সির মধ্যে থেকে একটা ঠিক করে দিল। ট্যাক্সিতে বসার পর রীমা একটা দশ টাকার নোট বেয়ারার দিকে এগিয়ে ধরল। টিপস পেয়ে গদগদ বেয়ারা ড্রাইভারকে জানিয়ে দিল, ম্যাডামকে বেলতলার দিকে নিয়ে যেতে।

রীমার ভয় ভাবটা কেটে গেল।

গোলে হরি বলে এই পর্বটা শেষ হল। এখন ভালভাবে বাড়ি পৌঁছাতে পারলে বাঁচা যায়। একটা ব্যাপারে অবশ্য মন খুঁত খুঁত করছে। অ্যাটাচিটা হোটেলেই ফেলে এসেছে। ওর মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, যা দিয়ে ওকে সনাক্ত করা যায় এই চিন্তা ভাবনা করতে লাগল। উদয় সম্পর্কে ও নিশ্চিত। কারণ জ্ঞান হবার পর সে আর কথা বলতে পারবে না। হাত পা নিশ্চিত ভাবে পড়ে গেছে। শেষে রীমা এই সমাধানে পৌঁছল, অ্যাটাচিতে এমন কিছু নেই যাতে ওকে চিহ্নিত করা যায়। এবার গন্তব্যস্থলের পরিবর্তন আনা দরকার।

—শুনছেন—

ড্রাইভার মুখ না ফিরিয়েই বলল, বলুন?

—গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিন। আমি হাওড়া যাব।

যাত্রীদের খামখেয়ালীপনায় অভ্যস্ত ড্রাইভার।

তবু বলল, আপনার তো ম্যাডাম বেলতলা যাবার কথা?

—একটা কাজ মনে পড়ে গেছে। আমাকে স্টেশনে নিয়ে চলুন।

ট্যাক্সি যখন হাওড়া স্টেশন পৌঁছাল তখন সাতটা দশ। ভাড়া হয়েছে ছাব্বিশ টাকা।

রীমা একটা একশ টাকার নোট এগিয়ে ধরল। ড্রাইভারের কাছে চেঞ্জ নেই। সে নোটটা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেল। এই সময় কোন লোকাল ট্রেন এসেছিল। যাত্রীরা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ—

—এই রীমা বৌদি—

রীমা মুখ ফিরিয়ে দেখল, ওদের প্রতিবেশী সুজাতা হাসি মুখে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে এক প্রৌঢ়া মহিলা এবং একজন তরুণ।

—সুজাতা, এত সকালে কলকাতা এলে?

—মালার বিয়ে। অনেক কেনাকাটা করতে হবে। তাই সকাল সকালই চলে এলাম।

তুমি কোথায়?

—মা'র কাছে এসেছিলাম। এখন ফিরে যাচ্ছি।

ড্রাইভার নোট হাতে করে ফিরে এসেছিল।

রীমা আবার বলল, তোমার কাছে একশ টাকার চেঞ্জ হবে?

সুজাতার সঙ্গী তরুণ নোটটা নিয়ে ভাঙিয়ে দিল। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আরো কয়েক মিনিট কথাবার্তা হল দু'পক্ষের মধ্যে তারপর রীমা টিকিট কাউন্টারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

আটটা বেজে গেছে।

'হোটেল ইস্টএন্ড'-এর ফার্স্ট ফ্লোরের বেয়ারা ১২০ নম্বর ঘরের দরজায় করাঘাত করল। ওর হাতে এক পেয়ালা চা। ম্যাডাম এই সময়েই সাহেবকে চা দিতে বলে গিয়েছিলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার বার কয়েক করাঘাত করল, সাহেব দরজা খুললেন না। ব্যাপার কি?

বেয়ারা কিছুটা চিন্তিত ভাবেই নিচে নেমে এল। কাউন্টারে ম্যানেজার তখন ছিলেন। বেয়ারার মুখে ব্যাপারটা শুনে বললেন, ঘরে কেউ না থাকলে, সাড়া দেবে কে?

—সাহেব আছে, ম্যাডাম বেরিয়েছেন সকালে।

—ঘরে কেউ নেই। এই দেখ, চাবি রয়েছে। ওঁরা দুজনে বেরুবার আগে কাউন্টারে চাবি রেখে গেছেন।

বেয়ারা প্রত্যয়ের সুরে বলল, ম্যাডাম একা গেছেন স্যার। আমি তাঁকে ট্যাক্সিতে চড়িয়েছি। উনি আমাকে বলে গেলেন, আটটার সময় সাহেবকে চা দিতে। অথচ এত ডাকাডাকির পরও সাহেবের সাড়া পাচ্ছি না।

ম্যানেজারের ভ্রূ কুঁচকে উঠল!

—চাবিটা তাহলে কাউন্টারে এল কি ভাবে? এমন তো হয়নি মিঃ ঘটক পরে বেরিয়ে গেছেন। কেউ লক্ষ্য করেনি।

—আমি তো' স্যার কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। ঘরে গিয়ে একবার দেখলে হয় না।

ম্যানেজার বিবেচনা করে দেখলেন, প্রস্তাবটা খারাপ নয়। যদিও ঘটকের দু'দিনের ঘর ভাড়া আগাম জমা আছে। না বলে কয়ে যদি ওঁরা চলে গিয়ে থাকেন তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবু একবার অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। ম্যানেজার বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে ফার্স্ট ফ্লোরে গেলেন। চাবি সঙ্গেই ছিল।

দরজা খোলা হল।

এর পরের ঘটনা উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কার আবরণে মুড়ে গেল। খবর পেয়েই হোটেলের ডাক্তার ছুটে এলেন। শরীর পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা অবশ্য

ছিল না। তবু উনি পরীক্ষা করলেন এবং গম্ভীর ভাবে জানিয়ে দিলেন, ভদ্রলোক কম করেও আট ঘণ্টা আগে মারা গেছেন।

অর্থাৎ সে সময় মৃত বোর্ডারের স্ত্রী এখানে ছিলেন। এবং সকালে একটা অজুহাত দেখিয়ে হোটেল থেকে সরে পড়েছেন। সুতরাং ম্যানেজার আর কাল বিলম্ব না করে পুলিশে খবর দিলেন। হোটেলের দুর্নাম রটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে আর তো কোন উপায় নেই।

স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অভয় সোম আধ ঘন্টার মধ্যে সদলবলে চলে এলেন ঘটনাস্থলে। নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে ভারি সতর্ক এবং তৎপর এটাই নিজের চালচলনে সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

কাউন্টারের সামনে এসেই অভয় সোম হুঙ্কার ছাড়লেন, পুলিশকে অকারণে হয়রান করার অর্থ বোঝেন?

ম্যানেজার বললেন, একজন বোর্ডার অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেছেন স্যার। থানায় খবর তো পাঠাতেই হবে।

—অস্বাভাবিক! কথাটা নতুন শুনলাম। একজন তাহলে সত্যি খুন হয়েছে? হোটেল মালিক কোথায়? আপনি—?

—আমি ম্যানেজার।

—একজন এখানে খুন হয়ে গেল, অথচ মালিক গায়েব? চমৎকার।

—মালিক কলকাতায় থাকেন না।

হুঁ! সব ব্যাপারেই দেখি কিছু না কিছু জট থাকবে। আগে ঘটনাটা বলুন, তারপর যা করার করছি।

ম্যানেজার এসে সমস্ত কিছু বললেন।

অভয় সোম মন দিয়ে সব শোনার পর বললেন, আপনি বলতে চাইছেন, ঐ মহিলা—স্ত্রী বা বান্ধবী যেই হোন, কাজটা তাঁরই?

—আমার তাই মনে হয়। তবে বান্ধবী নয়, ভদ্রলোকের উনি স্ত্রী বলেই মনে হল। মাথায় সিঁদুর ছিল।

অভয় সোম মৃদু হাসলেন।

—পরের স্ত্রীকে নিজের বলে চালানো তো আজকাল ফ্যাশন হয়ে গেছে। আর সিঁদুরের কথা বলবেন না—ভারি সস্তা জিনিস। চলুন, ঘটনাস্থলে এবার যাওয়া যাক।

একশ কুড়ি নম্বর ঘর লক করে রাখা হয়েছিল। তালা খোলার পর অভয় সোম সদলবলে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। হোটেলের কর্মচারীরা বাইরেই রয়ে গেল। উদয়ের মৃতদেহ একইভাবে পড়ে আছে সোফায়। রাইগার মার্টিস শরীরে সেটইন করে গেছে অনেক আগেই। সোম খুঁটিয়ে দেখলেন চারিধার। বডির নানাদিক থেকে কয়েকটা ছবি তোলা হল। আনুষঙ্গিক করণীয়গুলি শেষ হবার পর বডি চালান করে দেওয়া হল পোস্টমর্টমের উদ্দেশ্যে। অবশ্য তার আগে মৃতব্যক্তির পকেট হাতড়ে দেখে নেওয়া হয়েছিল প্রয়োজনে লাগে এমন কিছু পাওয়া যায়

কিনা। বড় আকারের একটা মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। একশ, পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোট মিলিয়ে মোট দু'হাজার সত্তর টাকা ছিল। আর ছিল মৃতব্যক্তির পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটোগ্রাফ।

বিরক্তির সুরে অভয় সোম বললেন, আমাদের কাজে লাগে এমন একটা চিরকুট পর্যন্ত নেই এতে।

তারপর সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এতগুলো টাকা মহিলা ছেড়ে গেলেন কেন? এ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা সেন?

সেন বলল, টাকার লোভ এখানে কাজ করেনি স্যার। আমার মনে হয়, খুনের উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

—তুমি ঠিকই বলছো। বডিতে কোন উন্ড নেই লক্ষ্য করলে তো। মদের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গেলাস, বোতল সবই ল্যাবে পাঠাতে হবে। সেন, তুমি বাথরুমটা একবার দেখ। আমি সুটকেস আর অ্যাটাচিকেসটা ততক্ষণ ঘেঁটে-ঘুটে দেখি।

চাবি দিয়ে বন্ধ করা না থাকায় সুটকেস খুলতে অসুবিধা হল না। পরিধেয় জামাকাপড় ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই নেই। দর্জির লেবেলগুলো দেখলেন সোম। সবই কলকাতার বিভিন্ন আউটফিটারের কাছে তৈরি করানো হয়েছে। ভিক্টিম পাটনার লোক, অথচ জামা-কাপড় সবই কলকাতার তৈরি! এমন যে হতে পারে না তা নয় আবার এমন কেন হবে, নিশ্চিত ভাবে এও একটা বড় প্রশ্ন।

অ্যাটাচিকেস সহজেই খোলা গেল। এতেও চাবি লাগান ছিল না। তালা খুলতেই অবাক হয়ে গেলেন সোম। গোটা পাঁচেক দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া ভেতরে আর কিছুই নেই। কাগজগুলি সবই চলতি মাসের। অবশ্য ধারাবাহিকতা নেই।

নিশ্চিত ভাবে এই অ্যাটাচি ঐ মহিলার। কিন্তু শাড়ি-ব্লাউজের পরিবর্তে দৈনিক সংবাদপত্র ভরা কেন? ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করলেন অভয় সোম—সমাধানের কোন সূত্র মাথায় এল না। সহকারী সেন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, ওখানে দাঁত মাজার সরঞ্জাম তোয়ালে আর একটা বিয়ার ক্যান ছাড়া কিছুই নেই। তোয়ালে ভিজে অবস্থায় রয়েছে।

—বাথরুমে বিয়ার ক্যান—সেন, ব্যাপারটা বেশ বে-খাপ্পা!

সেন বলল, আমার মনে হয় কাজটা মহিলার। দুটো বোতল রয়েছে। ভদ্রলোক হুইস্কি খাচ্ছিলেন আর মহিলা বিয়ার—।

—তা না হয় হল। কিন্তু বাথরুমে গেল কেন ক্যানটা?

—মহিলা হয়তো অভ্যস্ত নন। বাথরুমের প্যানে বাকীটা ফেলে দিয়ে পাত্র ওখানেই রেখে এসেছেন।

—হতে পারে। বিয়ার ক্যানে তাহলে মহিলার হাতের ছাপ থাকা সম্ভব। তুমি এদিকটা দেখ, আমি গিয়ে বেয়ারাটাকে জেরা করি।

অভয় সোম ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

করিডরে ম্যানেজার এবং আট-দশজন লোক আরো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সকলের

মুখেই উৎকণ্ঠার ছায়া। ম্যানেজারকে অবশ্য বেশি কাহিল দেখাচ্ছে। সোম একবার চারিধারে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে ম্যানেজারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

—এই তলার বেয়ারা কোথায়?

—এখানেই আছে। পাঁচু এদিকে এস।

বেয়ারা এগিয়ে এল।

—আপনারা এখান থেকে যান। আমি এখন এর সঙ্গে কথা বলব।

সকলে চলে যাবার পর সোম বললেন, তোমার নাম কি?

—পাঁচু পাত্র।

—কতদিন এখানে কাজ করছো?

—বছর ছয়েক হয়ে গেল স্যার।

—যে ভদ্রলোক মারা গেছেন, তাঁকে আগে কখনও দেখেছিলে?

—না।

—মহিলাকে—

আজ্ঞে না।

—এবার ব্যাপারটা আমায় বলতো?

কাঁপা গলায় পাঁচু বলল, আমি তো কিছু জানি না স্যার।

—সকালে যখন মহিলা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন তো তুমি ও'র সঙ্গেই ছিলে?

আমি স্যার তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। দেখলাম, উনি তখন হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

—তুমি তখন কি করলে?

—আমি ওঁকে ডাকলাম। উনি বললেন, বেলতলায় মাসীর বাড়ি যাচ্ছেন। সাহেবকে যেন আটটার সময় চা দেওয়া হয়। আমি তখন ট্যাক্সি ঠিক করে দিলাম।

বিরক্তির সুরে সোম বললেন, তুমি হলে যত নষ্টের গোড়া। মহিলা খুন করে বেরিয়ে গেল, আর তুমি তাকে সাহায্য করলে। তোমার মত লোককে ধরে চাবকাতে হয়।

কাঁপা গলায় পাঁচু বলল, আমি তো স্যার...মানে...

—চুপ করো। ট্যাক্সির ড্রাইভার চেনা লোক?

—হ্যাঁ স্যার। লোকটার নাম মোহিত কর্মকার।

—মোহিতকে এখন পাওয়া যাবে?

—দেখছি স্যার।

মোহিতকে কিন্তু তখন পাওয়া গেল না। যাত্রী নিয়ে সে এখন কোন্ পথে চলেছে অনুমান করা কঠিন। এরপর অভয় সোম ম্যানেজারকে জেরা করলেন। নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। থানায় ফেরার আগে একশ কুড়ি নম্বর ঘর সিল করলেন। একজন কনস্টেবলকে মোতায়েন করলেন হোটেলেই। ট্যাক্সি ড্রাইভার এলেই তাকে নিয়ে থানায় আসবে সে।

বিকেল পাঁচটার সময় মোহিত কর্মকারকে পাওয়া গেল। কর্মকার তেমন নার্ভাস হয়নি। আগেও তাকে কয়েকবার পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হয়েছে। এবার আবার ব্যাপার তেমন সঙ্গীন নয়। সকালের ঘটনাটা সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই বলে গেল। সোম গম্ভীর মুখে শুনলেন।

—তখন কটা বাজে?

মোহিত বলল, সাড়ে সাতটার বেশি হবে না বড়বাবু।

—তোমার প্যাসেঞ্জার যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিল, তাঁরা কোথা থেকে আসছিলেন বুঝতে পেরেছিলে?

—না বড়বাবু। শুধু শুনেছিলাম, ওঁরা বিয়ের বাজার করতে এসেছেন।

—মনে করে দেখ, আর কোন কথা তোমার মনে আছে কিনা যা আমাদের কাজে লাগে।

—আর তো কিছু মনে পড়ছে না।

ড্রাইভারকে বিদায় করে অভয় সোম সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, দুটো পয়েন্ট আমাদের হাতে এসেছে। এক, তখন প্রায় সকাল সাড়ে সাতটা। দুই, বিয়ের বাজার। সেন, তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ, ঐ সময় কোন্ ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ইন করেছিল। তারপর বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ নেওয়া যাবে।

আমি ভিক্টিমের জামা কাপড়ের ব্যাপারটা দেখছি।

সেন হাওড়া রওনা হয়ে গেল।

স্টেশনে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, ঐদিন পাঁচটা আটান্নর ব্যান্ডেল লোকাল দশ মিনিট লেট অর্থাৎ সাতটা পাঁচের পরিবর্তে সাতটা পনেরোয় দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসেছিল। যাঁরা বিয়ের বাজার করতে এসেছিলেন, তাঁরা ঐ ট্রেনেই এসেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ওঁদের আরো দশ মিনিট লেগেছিল ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে আসতে। সময়টা মিলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হল, ওঁরা কি ব্যান্ডেল থেকে এসেছিলেন না, মাঝের কোন স্টেশন থেকে? ব্যান্ডেল আর হাওড়ার মধ্যে পনেরোটা স্টেশন আছে। এ একেবারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে ছুঁচ খুঁজে বার করবার মত। এবার দেখতে হয় মহিলার কোন ট্রেন অ্যাভেল করার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেল, কাছাকাছির মধ্যে হাওড়া থেকে তখন তিনখানা ট্রেন ছেড়েছে—সাতটা পঁতাল্লিশ মিনিটে শেওড়াফুলি লোকাল, সাতটা পঞ্চান্নয় বর্ধমান লোকাল আর আটটা তিন-এ ব্যান্ডেল লোকাল।

নিশ্চিত ভাবে এই তিনটে ট্রেনের কোন একটা মহিলা ধরেছেন। কিন্তু গেছেন কোথায়? সমস্ত শুনে অভয় সোম মত প্রকাশ করলেন, শেওড়াফুলি আর ব্যান্ডেলকেই প্রথমে টারগেট করতে হবে। যদি সুবিধা না হয়, তারপর দেখা যাবে। সেন, তুমি কাল সকালেই রওয়ানা হয়ে পড়।

ইতিমধ্যে পাটনায় খবর পাঠান হয়েছে। হোটেলের রেজিস্টারে ভিক্টিম যে ঠিকানা লিখেছিল, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানান হয়েছে ওখানকার

পুলিশকে। অবশ্য অভয় সোম নিশ্চিত ঐ ঠিকানা জেনুইন নয়। নাম বা পদবী কোনটাই সঠিক নয়। তবু খোঁজ-খবর নিতেই হবে।

পরের দিন ভোরের ট্রেনে সেন শেওড়াফুলি পৌঁছাল।

ওখানকার থানা ইনচার্জ সমস্ত শুনে বললেন, কোন্ তারিখে কত বিয়ে হচ্ছে তার সঠিক হিসাব তো পাওযা মুশকিল। তবে কিছু লোক নিয়ম মেনে চলেন। বিয়েতে মাইক লাগালে অনুমতি নেন আমাদের কাছ থেকে। অনুমতির লিস্টটা নিয়ে আমরা খোঁজ-খবর করতে পারি।

দেখা গেল, এই মাসে তিনটে বিয়ের তারিখ আছে। মোট এগারোজন ব্যক্তি মাইক ব্যবহার করার অনুমতি নিয়েছেন। তাঁদের ঠিকানাও রয়েছে। সেন স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় ঐ এগারোজনের সঙ্গেই দেখা করল। একই প্রশ্ন করা হল সকলকে। পরিবারের তিনজন ১৬ই জানুয়ারি বিয়ের বাজার কবতে ভোরের ট্রেনে কলকাতা গিয়েছিলেন কিনা? সকলেই জানালেন, ঐ তারিখে তাদের বাড়ি থেকে বিয়ের বাজার করতে কেউ কলকাতা যায় নি।

নিরাশ হয়ে সেন এবার ব্যান্ডেলে পৌঁছাল। তখন বেলা সাড়ে তিনটে। মাইক ব্যবহার করার অনুমতি পাওয়া লিস্টটা দেখল। একুশজন অনুমতি নিয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন অবাঙালী। সুতরাং আঠারো জনের বাড়িতে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। ভাগ্যক্রমে তৃতীয় বাড়িতেই আলোর সন্ধান পাওয়া গেল।

ভদ্রলোকের নাম অনন্ত তালুকদার। ওকালতি করেন। ওঁর ছোট মেয়ের বিয়ে। ১৬ই জানুয়ারি ওঁর স্ত্রী, মেজমেয়ে আর ভাগনে ভোরের ট্রেনে বিয়ের বাজার করতে কলকাতা রওয়ানা হয়েছিলেন। সেন মেজমেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। গৃহকর্তা তাকে ডেকে আনলেন। কিছুটা বিব্রত ভাব নিয়ে তরুণী এসে দাঁড়াল।

সেন প্রশ্ন করল, আপনারা ১৬ই জানুয়ারি বিয়ের বাজার করতে কলকাতা গিয়েছিলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বেরুবার পর কোন পরিচিতা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সুজাতা ইতস্তত করে বলল, পরিচিতা মহিলা...মানে...

—আমরা জানি আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কে?

—রীমা বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—ভদ্রমহিলা কোথায় থাকেন?

এবার গৃহকর্তা বললেন, প্রদোষ সান্যাল বড় ব্যবসাদার। রীমা ওর স্ত্রী। তিনটে বাড়ির পরেই ওরা থাকে। ব্যাপারটা কি বলুন তো ইন্সপেক্টার? রীমা তো ভারি ভাল মেয়ে।

—এখনই সব কথা বলা যাচ্ছে না। তদন্তের আওতায় রয়েছে ব্যাপারটা। অনুগ্রহ করে বাড়িটা দেখিয়ে দিন। আরেকটা কথা এসম্পর্কে কাউকে কিছু বলবেন না।

এরপর কলকাতায় যোগাযোগ করা হল। অভয় সোম জানালেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যান্ডেল আসছেন। ঘন্টাতিনেক পরেই এলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন হোটেলের

বেয়ারা পাঁচু পাত্রকে। সনাক্তকরণের ব্যাপারে প্রয়োজন পড়বে।

রীমার কিছুই জানা নেই।

সে স্বাভাবিক ভাবেই দিন কাটিয়ে চলেছে।

গুরুতর কাণ্ডটা ঘটিয়ে দেবার পর সে বেশ স্বস্তি বোধ করছে। উদয় চৌধুরী আর কোন দিন বিরক্ত করতে আসবে না। তার সুখময় জীবন এবার নিস্তরঙ্গ খাতেই বয়ে যাবে। এখন রীমা আরো গাঢ়ভাবে প্রদোষের প্রতি মনযোগী হয়েছে।

নেপথ্যে নাটকের যবনিকা হঠাৎই সরে গেল। তখন বেলা চারটে। পুলিশ আসবার আগেই সুজাতা এসে উপস্থিত হল। ভারি ত্রস্ত ভাব তার। রীমা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। সুজাতার মুখের ভাব দেখে কিছুটা অবাকই হতে হল তাকে।

রীমা প্রশ্ন করল, তোমার মুখের অবস্থা এমন কেন? কি হয়েছে?

সুজাতা বলল, বাড়ি থেকে লুকিয়ে এসেছি। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বৌদি। তুমি খুব বিপদে পড়েছো।

—আমি! কি বলছো?

—কিছুক্ষণ আগে আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল।

—কেন?

—সেদিন হাওড়া স্টেশনে তোমার সঙ্গে যে আমাদের দেখা হয়েছিল না, তাই নিয়েই প্রশ্ন করছিল। তোমার ঠিকানা জেনে গেছে।

শরীর ঝনঝনিয়ে উঠল রীমার।

পুলিশ এত তাড়াতাড়ি সন্ধান পেয়ে গেছে!!!

কোনরকমে বলল, খবরটা দিয়ে আমার অনেক উপকার করলে সুজাতা। এখন তুমি বাড়ি যাও।

—কি হয়েছে বৌদি?

—সব জানতে পারবে। আর কোন কথা নয়। প্লীজ—

সুজাতা চলে যাবার পরই দ্রুত পায়ে ড্রইংরুমে এল রীমা। ফোন স্ট্যান্ড থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়েল করল। দুবার বাজার পরই যোগাযোগ হল। ওধারে রিসিভার তুলেছে প্রদোষ

—হ্যালো—

—একটা ব্যাপার ঘটেছে। এখনই বাড়ি চলে এস।

—কি হয়েছে?

—সময় নষ্ট না করে তুমি এস।

রীমা রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ভয়, আশঙ্কা আর কান্না তখন রীমাকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু উপায় নেই। অন্যের মুখ থেকে কিছু শোনার চেয়ে, সে নিজেই সমস্ত কথা বলবে প্রদোষকে। ভবিষ্যত বলে যখন কিছু রইলই না তখন কিসের লজ্জা—কিসের আশঙ্কা। অবশ্য জানা কথা প্রদোষ তার কাণ্ডকারখানায় স্তব্ধ হয়ে যাবে। তারপর ঘৃণায় ফিরিয়ে নেবে নিজের মুখ।

মিনিট দশেক পরেই প্রদোষ উপস্থিত হল বাড়িতে। স্কুটারে এসেছে। ওর মুখের অবস্থা ভাল নয়। কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেছে এই আশঙ্কায় ওর মন আকুল। রীমাকে ঠিকঠাক দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হল।

—ব্যাপার কি? তোমার কিছু হয়নি। তবে—

—আমি উৎকণ্ঠায় আছি। তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছে।

—পাঁচ বছরের কিছু বেশি হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমার ফুলশয্যার দিনের কথা মনে আছে?

প্রদোষ আকাশ থেকে পড়ল।

—ফুলশয্যা। এখন আমার অনেক কাজ ছিল। এরকম ছেলেমানুষী তো কখনো করো না। আজ হঠাৎ—

ছেলেমানুষী আমি করিনি। ভারি সিরিয়াস পরিস্থিতি। আমি কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। ফুলশয্যার দিনই আমি আমার কুমারী জীবনের কিছু বলতে চেয়েছিলাম। তুমি শুনতে চাওনি। তুমি বলেছিলে, অতীত—অতীত, আমরা বর্তমান আর ভবিষ্যতকে মেনে চলবো।

—বলেছিলাম। কিন্তু এতদিন পরে একথা কেন?

সেদিন তোমার কথা না শুনলেই ভাল হত। যা হবার হয়ে যেত সেদিনই। আমি ভারি বোকামি করেছি।

—আবোলতাবোল বকে যাচ্ছ। পরিস্কার করে কিছু বলবে কি?

—আমি তোমায় ভীষণ ভালবাসি। তবু আমি তোমার মুখে কালি লাগিয়েছি। আমি তোমার যোগ্য নই। পুলিশ আসছে।

—পুলিশ!

প্রদোষ অবাক হয়ে যায়।

—পুলিশ কেন আসবে?

—তুমি আমার কাছ থেকে সমস্ত শুনে নাও। আমি কত নীচ জেনে নাও। তারপর যা স্থির করবে তাই হবে।

রীমা এবার প্রথম থেকে একে একে সমস্ত কথা বলে গেল। বলতে বলতে গলা ধরে এল। ভিজে উঠল চোখ। গম্ভীর মুদ্রায় একইভাবে বসে সমস্ত শুনে গেল প্রদোষ। বলা শেষ করেই রীমা সোফার হাতলে মাথা রাখল। কান্নার বেগ আর চেপে রাখতে পারল না।

প্রদোষ বলল, তুমি আগে বললে না কেন? লোকটাকে আমি চাবকে তাড়াতাম। আমার এখন দুঃখটা কোথায় জানো—তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পারনি।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে রীমা বলল, আমি সাহস করতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল, তুমি শুনলে—

—মুখ ফিরিয়ে নেব? তুমি আমার মনকে এত ঠুনকো ভাবলে কিভাবে? কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসে আছো বলতো?

—আমায় ক্ষমা করো। আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি, আমি তোমার

মনের গভীরতা মাপতে পারিনি।

প্রদোষ ওকে নিজের কাছে টেনে নিল।

—এখন আর কথা নয়। সময়ের দাম এখন অনেক। চল, যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—চুঁচড়া।

—ওখানে কেন?

—পুলিশের হাতে পড়ার আগে একটা ডিফেন্স নেবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। বিকাশ দত্তর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

প্রদোষ স্কুটার বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে গেল। তারপর রীমাকে পিছনের সিটে বসিয়ে এগলি সেগলি করে প্রধান পথে গিয়ে পড়ল। পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে কত আর সময় লাগবে। রীমা ভাবতেও পারেনি, এই বিশ্রী ব্যাপারটা এত সহজে সমাধানের কূলে পৌঁছবে। প্রদোষের প্রতি ওর আকর্ষণ সহস্রগুণ বেড়ে গেল।

অভয় সোম সাড়ে চারটের সময় ব্যান্ডেল পৌঁছালেন। সঙ্গে দুজন সহকর্মী। এখানকার ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল। বেয়ারা পাঁচু পাত্রও সঙ্গে আছে। দুটো জিপ রওয়ানা হল। প্রদোষের বাড়ি পৌঁছাবার পর কিন্তু অত্যন্ত নিরাশ হতে হল পুলিশ পক্ষকে। মহিলা বাড়ি নেই। বাড়ির চাকরের মুখ থেকে জানা গেল, সস্ত্রীক কর্তা বহুক্ষণ আগেই স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ওঁরা কোথায় গেছেন সে জানে না।

মহা বিরক্ত হয়ে অভয় সোম বললেন, খবর লিক আউট হয়েছে। পুলিশকে কেউ সাহায্য করতে চায় না। আসল ব্যাপারটা তুমি আন্দাজ করতে পারছো, সেন?

—কি বলুন তো স্যার?

—ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, মহিলার স্বামীও ইনভ্লভ। দুজনে তাই একই সঙ্গে পালিয়েছে।

ব্যান্ডেল থানার গৌতম রায় বললেন, স্কুটারে যখন গেছে, মনে হয় খুব বেশি দূর যাবার প্রোগ্রাম নেই। ওদের আত্মীয়-স্বজন এখানে কে কে আছে, সে সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার।

—কিভাবে খোঁজ নেওয়া যায় বলুন তো?

—মহিলার সন্ধান যে পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে, ওখানে গেলে হয়তো কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

যাওয়া হল।

কিন্তু কোন সুবিধা হল না। ওরা সান্যালদের কোন আত্মীয়-স্বজন বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সন্ধান দিতে পারলেন না। তবে ওরা কারবারের সন্ধান দিলেন এবং প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাও জানালেন।

পুলিশ ইষ্টার্ন ইলেকট্রনিক্স পৌঁছাল। কাজের কাজ কিছুই হল না। দোকানের কর্মচারীরা জানাল, কর্তা দুপুরে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন কাউকে বলে জাননি। ম্যাডামকে নিয়ে কোথায় যেতে পারেন এ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

অভয় সোম সদলবলে, নিরাশার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে থানায় ফিরে এলেন। অবশ্য দোকান এবং বাড়ির উপর নজর রাখবার জন্য লোক মোতায়েন করা হয়েছে। এধারের এই অবস্থা। ওধারে, মৃতব্যক্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। আউট ফিটারদের কাছে যাওয়া হয়েছিল। জামা-প্যান্ট দেখে তারা স্বীকার করেছে এখানেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু মৃতব্যক্তির ঠিকানা বলতে পারেনি বা তাকে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়নি।

অভয় সোম নিরাশ হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। তবে মহিলার ঠিকানাটা পেয়েছেন, এটাই এখন বড় পুঁজি। আজ নয় কাল বাড়ি ফিরতেই হবে। বাড়ি আর চালু ব্যবসা ফেলে অনন্তকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভব নয়। মিসিং পারশান স্কোয়ার্ডে ভিক্টিমের ছবি পাঠানো হয়েছিল। ওখান থেকে কলকাতার প্রতিটি থানায় খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত এই ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট কেউ কোথাও করেনি।

শেষে অভয় সোম স্থির করলেন, মৃতব্যক্তির ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। আত্মীয়-স্বজন কারুর না কারুব চোখে নিশ্চয় পড়বে। তখন আর কোন অসুবিধা হবে না।

তিনদিন পরে।

ব্যান্ডেল থানা ইনচার্জ গৌতম রায় নিজের ফাইল দেখছিলেন। কলকাতাব কেশটা এখনও ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। যে সান্যাল দম্পতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে—তাঁরা এখনও পর্যন্ত না বাড়ি ফিরেছেন, না তাদের দোকানে দেখা গেছে। এখন একটাই পথ আছে আদালত থেকে আদেশ নিয়ে সম্পত্তি ক্রোক করা। অবশ্য এসব নিয়ে গৌতম রায়ের কোন মাথাব্যথা নেই। দায়িত্ব অবশ্যই হেয়ার স্ট্রীট থানার।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করলেন দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। কোন অভিযোগ নিয়ে নিশ্চয় এঁরা এসেছেন। রায় বসতে বললেন তিনজনকে। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

একজন বললেন, আমি বিকাশ দত্ত। জেলা আদালতে প্র্যাকটিশ করি। এঁরা আমার মক্কেল, রীমা সান্যাল এবং প্রদোষ সান্যাল। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

—বলুন?

সঙ্গে সঙ্গে গৌতম রায়ের মনে পড়ে গেল, রীমা সান্যাল—এঁকেই তো খোঁজা হচ্ছে। আত্মসমর্পণ করতে এসেছেন নিশ্চয়। উনি অবশ্য ব্যস্ততা দেখালেন না। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উকিল ভদ্রলোকের দিকে।

বিকাশ দত্ত বললেন, আমার মক্কেলদের বাড়ি এবং দোকানে পাহারা বসানো হয়েছে। পাহারা তুলে নিতে হবে। এই যে পিটিশান—

পিটিশান নেবার চেষ্টা না করেই রায় বললেন, মিসেস সান্যালকে আমরা একটা মার্ডার কেশ'এর ব্যাপারে খুঁজছি। উনি থানায় এসে ভালই করলেন। অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল। এবার পাহারা উঠিয়ে নেওয়া হবে।

আপনি কি মিসেস সান্যালকে অ্যারেষ্ট করতে চান?

—ক্যালকাটা পুলিশের কাছ থেকে সেই রকমই নির্দেশ আছে। আমি এখনই ফোন করে ওঁদের জানিয়ে দিচ্ছি।

বিকাশ দত্ত বললেন, ফোন করুন ক্ষতি নেই। তবে নির্দেশ না কি বলছিলেন, ওটা হজম করে ফেলুন। আমার পিটিশন পড়ে দেখলে ভাল করতেন। এঁদের দুজনের অ্যান্টিম-পেটারি বেল নেওয়া হয়েছে। এই যে, কোর্ট অর্ডারের জেরক্স কপি।

গৌতম রায় পিটিশন পড়লেন এবং কোর্ট অর্ডার দেখার পর বললেন, আপনার মক্কেলদের নিয়ে যেতে পারেন। পাহারা সরিয়ে নেওয়া হবে। তবে ক্যালকাটা পুলিশকে এই খবর পাঠাতেই হচ্ছে। ওঁরা এঁদের জেরা অবশ্যই করবেন। বুঝতেই পাচ্ছেন, ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়াবেই।

—ভবিষ্যতে যা হবার হবে। কোর্টে ডিফেন্স দেবার জন্য আমরা তৈরি। আমরা এখন তাহলে চলি। ধন্যবাদ ইন্সপেক্টার।

বিকাশ দত্ত মক্কেলদের নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের গাড়িতেই রীমা আর প্রদোষকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন দত্ত। বিদায় নেবার সময় ওদের জানিয়ে দিলেন, কয়েক ঘন্টা পরেই পুলিশ আসবে জিগ্যেসবাদ করতে। যা স্থির করা আছে তার বাইরে একটা কথাও যেন না বলা হয়।

বেলা তিনটের সময় অভয় সোম সদলবলে এলেন। বিরক্তিতে মন ভরে রয়েছে। আইনের মারপ্যাঁচে যে পাখি অন্য ডালে গিয়ে বসবে তিনি ভাবতেই পারেননি। সময়, সময় আদালতে এমন ব্যাপার ঘটে যাতে সমস্ত ভন্ডুল হয়ে যায়। প্রদোষ সকলকে ড্রইংরুমে বসালো।

—সোম বললেন, আমরা কেন এসেছি বুঝতেই পাচ্ছেন। অ্যান্টিসিপেটারি বেল নিয়ে নিলেই সব চুকেবুকে গেল তা কিন্তু নয়। আদালতে মামলা উঠবেই।

—আপনারা যখন পিছনে লেগেছেন তখন আদালতে যে যেতে হবে তা আমরা ভালই জানি।

—পিছনে লেগেছি মানে—? আপনি ভালই জানেন, ব্যাপারটা সাজানো নয়। যাহোক, আপনার স্ত্রীকে ডাকুন। তাঁর সঙ্গেই আগে কথা বলবো।

খবর পেতেই রীমা এসে বসল।

সোম জেরা আরম্ভ করলেন।

—আমরা জানতে পেরেছি, ১৫ই জানুয়ারি এক ভদ্রলোককে সঙ্গী করে কলকাতার 'ইষ্টএন্ড' হোটেলে উঠেছিলেন। এ সম্পর্কে পুরো ব্যাপারটাই আমরা

জানতে চাই?

রীমাকে এবার উকিলের পরামর্শ মত মিথ্যা কথাটাই বলতে হবে। আড়ষ্টতা ওকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য মূক করে রাখল। তারপর নিজেকে সামলে নিল। এখন ঘাবড়ালে চলবে না। এখন বাঁচার তাগিদে মিথ্যাকে স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই প্রকাশ করতে হবে।

—আমি ১৯শে জানুয়ারি কলকাতা যায়নি।

—আপনি 'ইষ্টএন্ড' হোটেলে ওঠেননি?

—হোটেলটা কোথায়? নাম শুনেছি।

কিছুটা অস্থিরতার সঙ্গে সোম বললেন, আপনার মত অভিজাত আর শিক্ষিতা মহিলা এইভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেবেন ভাবিনি। মিসেস সান্যাল, আপনি নিজের ভাল চাইলে সত্যি কথা বলুন?

—আমি যা বলার বলেছি।

—আপনার মিথ্যা এবার ফাঁস হয়ে যাবে। পাঁচু এদিকে এস।

বেয়ারা পাঁচু পাত্র এবার এগিয়ে এল।

—এই মহিলাকে আগে কোথাও তুমি দেখেছো?

বেয়ারা বলল, দেখেছি স্যার। ইনি আমাদের হোটেলের ১২০ নম্বর ঘরে ছিলেন। আমাকে দশ টাকা টিপস দিয়েছিলেন।

—এবার বলুন?

রীমার পরিবর্তে এবার প্রদোষ বলল, যে কোন লোককে সাক্ষী সাজিয়ে আনলেই ঘটনা বাস্তব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এখনও আপনি বলেননি, আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি?

—আমরা মার্ডার কেস-এর তদন্তে এসেছি মিঃ সান্যাল। আপনার স্ত্রী ১৫ই জানুয়ারি 'ইস্টএন্ড' হোটেলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে উঠেছিলেন। ঐ ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। আপনার স্ত্রীকে আমরা সন্দেহ করি।

উদয় চৌধুরী খুন হয়েছে শুনে রীমা স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন তো হবার কথা নয়। রুচী কি তবে ভুল কোন ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল? ব্যাপারটা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল। ঘাম দেখা দিল রীমার সারা শরীরে।

—সেই ভদ্রলোক কে?

—এখনও জানা যায়নি। পাটনার একটা ঠিকানা ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সেটা ঠিক নয়। বেল পিটিশনে নামটা শুধু পেয়েছি, উদয় চৌধুরী।

রীমা বলল, আমায় আর কোন প্রশ্ন করবেন না। আমার আইনজ্ঞর অনুপস্থিতিতে আমি আর কিছু বলবো না।

অভয় সোমের ভ্রূ কয়েক সেকেন্ড কুঁচকে রইল।

প্রদোষ বলল, বেল পিটিশনে উল্লেখ ছিল, দুর্ঘটনাগ্রস্ত উদয় চৌধুরীর ব্যাপারে পুলিশ আমাদের জড়াতে চায়। উদয় চৌধুরীর ঠিকানাও ছিল তাতে। তাহলে কি ভাবে বলছেন, লোকটা কে জানেন না? শুনুন ইন্সপেক্টার, এরপর যা বলার

আমরা আদালতে বলবো।

—কাজটা ভাল করছেন না।

—আপনার এই কথা কি ধমক বলে মনে করবো?

অভয় সোম উঠে দাঁড়ালেন।

—বেল আপনাদের তাড়াহুড়োয় দেওয়া হয়েছে। ওটা যাতে ক্যানসেল হয় তার ব্যবস্থা আমরা করবো। যাহোক, এখন আমরা যাচ্ছি। তবে নিশ্চিত জানবেন পরে আবার দেখা হবে।

পুলিশের দলবল বিদায় নেবার পর আকুল দৃষ্টিতে প্রদোষের দিকে তাকাল রীমা। প্রদোষের মনের মধ্যে তখন চিন্তা পাকসাট খেয়ে চলেছে। বিকাশ দত্তর সঙ্গে আরেক দফা আলোচনা করা দবকার। পুলিশ কি সত্যি বেল খারিজ করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারে?

—এখন কি হবে?

প্রদোষ বলল, তাই ভাবছি। লোকটা মরে গিয়ে ঝামেলা আরো বাড়িয়ে দিল।

—মরে যাবে কে জানতো।

—তুমি ভারি ছেলেমানুষী করেছো। একটা ওষুধ কাউকে খাইয়ে দিলেই, শরীর পড়ে যাবে আর বাক্‌রোধ হয়ে যাবে—ভালভাবে খোঁজ খবর না নিয়েই তুমি বিশ্বাস করলে? ভগবান জানেন, তোমাব বান্ধবী তোমাকে কি ওষুধ দিয়েছিল।

রীমার চোখ ফেটে জল এসে গেল।

—আমায় ক্ষমা করো। ভীষণ দোষ করে ফেলেছি।

প্রদোষ এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখল।

—তুমি ভুল বুঝছো। আমি তোমাকে অ্যালিগেট করছি না। সেই তুমি আমাকে সব কথা বললে, আগে যদি বলতে এত ঝামেলা হত না।

—আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছিলাম। সব শোনার পর তুমি যদি আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দাও।

—আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসের অভাব। আসল কথা হল, তুমি আমায় বুঝতে পারনি।

রীমা প্রদোষের বুকে মুখ রাখল।

—এটাই আমার সবচেয়ে বড় অন্যায়। এখন কি করতে বলছো?

দুজনে সোফায় গিয়ে বসল।

প্রদোষ বলল, যা কিছু করতে হবে একই সঙ্গে। কলকাতার কোন বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে চেনাজানা থাকলে ভাল হত। বিকাশবাবুর সঙ্গে আরো একবার আলোচনা করা দরকার। উনি নিশ্চয় কোন প্ল্যান বার করবেন।

এই সময় অভাবনীয় ভাবে বিকাশ দত্ত এসে উপস্থিত হলেন।

বসতে, বসতে বললেন, পুলিশ থাকাকালীন আমি ইচ্ছে করেই আসিনি। ওদের সঙ্গে কি কথা হল?

রীমা আর প্রদোষ পারাপারি করে বলল সব।

—পুলিশ অবশ্যই চেষ্টা করবে বেল ক্যানসেল করাবার। তবে ব্যাপারটা কার্যকার করতে কিছু সময় লাগবে।

প্রদোষ প্রশ্ন করল, ক্যালকাটা পুলিশের হোমড়া-চোমড়া কারুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?

—ক্যালকাটা পুলিশের একজন মেডিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাইতো একটা কাজ করিয়ে নিতে পারলাম। আমি গতকালই জানতে পেরেছিলাম লোকটা মারা গেছে। কাজেই পোষ্টমর্টম রিপোর্টের কপি সংগ্রহ করতে পেরেছি।

রীমা আর প্রদোষ দুজনেই এই কথা শুনে হতাশ হল। ওরা ভেবেছিল, ওদের সুবিধা হয় এমন কিছু জানা গেছে। পোষ্টমর্টম রিপোর্ট কোন্ কাজে লাগবে? বিকাশ দত্ত ওদের মনোভাব বুঝতে পারলেন।

মৃদু হেসে বললেন, বুদ্ধি করে রিপোর্টের কপি আনিয়েছিলাম বলেই একটা বিচিত্র ব্যাপার জানা গেল। মিসেস সান্যাল, আপনি হুইস্কির সঙ্গে মারাত্মক কি একটা মিশিয়ে দিয়েছিলেন যেন?

রীমা বলল, 'রেব্লু'। আসলে ওষুধটা কুকুরদের খাওয়ানো হয়।

—আপনারা শুনলে অবাক হবেন, রিপোর্ট বলছে, মৃতব্যক্তির পেটে তাজা অবস্থায় অ্যালকহল আর ঘুমের ওযুধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

সবিস্ময়ে প্রদোষ বলল, বলেন কি? 'রেব্লু' কোথায় গেল?

—অনেক ভেবেও এর কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। এতে একটা জিনিষ অবশ্য প্রমাণ হল, মিসেস সান্যালের ওষুধ খেয়ে লোকটা মরেনি। আবার এটাও প্রশ্ন, যে মাত্রায় পেটে ঘুমের ওযুধ পাওয়া গেছে তাতে লোকে ঘুমিয়ে পড়তে পারে—মরে না।

—কিন্তু লোকটা তো মরেছে?

—অবাক করে দেওয়ার মত কাণ্ড তো এখানেই। আমার ঐ মেডিকাল অফিসার বন্ধুও এর সঠিক উত্তর খুঁজে পাননি। তবে—

—বলুন?

—এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করবার দায় পুলিশের। তারা এ নিয়ে কতটা মাথা ঘামাবে জানি না। আমাদের অন্যদিকটা দেখতে হবে। অর্থাৎ বাঁচার রাস্তার সন্ধান করতে হবে। আদালতে কেস উঠলে জোর লড়াইয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা করবো। তবে তার আগে যদি কিছু করা যায়।

—সে রকম কোন সুযোগ আছে কি?

বিকাশ দত্ত বললেন, আমার বন্ধু মেডিক্যাল অফিসার একটা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রাইভেট-এনকয়ারির ব্যবস্থা করা। যাঁর কথা উনি বলেছেন, তিনি এই লাইনের অথারিটি বিশেষ। পুলিশের উপর মহলেও তাঁর ভারি প্রতিপত্তি।

প্রদোষ বলল, সাহায্য তাহলে নিতেই হয়। ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?

—তাঁর ঠিকানা—

—ঠিকানা পেতে অসুবিধা হবে না। কাল সকালে যাওয়া যেতে পারে।

রীমা এতক্ষণ পরে কথা বলল।

—কাল সকালে কেন? এখন তো মাত্র বেলা সাড়ে চারটে। আজ যাওয়া যায় না?

—কেন যাওয়া যাবে না। দত্ত বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, সময় নষ্ট করে লাভ কি? অসুবিধারও কিছু নেই। গাড়ি আছে সঙ্গে ওঠা যাক।

সন্ধ্যা তখন হয় হয়।

দুশো একচল্লিশের কে, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের পোর্টিকোতে তখন ওল্ডসমোবাইল দাঁড়িয়েছিল। বাসব লালবাজার যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শৈবাল মেডিক্যাল কনফারেন্সের দরুণ কলকাতার বাইরে থাকায় সময় আর কাটতে চায় না। হাতে কোন তদন্তও নেই। তাই এক ঘেয়েমি কাটাবার জন্য হোমিসাইডের বড়কর্তা সামন্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসবে স্থির করেছে।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে সবে ড্রইংরুম থেকে বেরিয়েছে, দেখল, গেট পেরিয়ে একটা ফিয়েট ঢুকছে। বাসবের বুঝতে অসুবিধা হল না, এখন আর লালবাজারে যাওয়া যাবে না। হয়তো কোন মক্কেল। মক্কেল হলে ভালই হয়, মরচে পড়া শরীর তাজা হবে।

ফিয়েট থেকে দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা নামলেন। ওঁরা এলেন পার্লারে। বলাবাহুল্য গৃহকর্তাকে চিনে নিতে অসুবিধা হল না। বাসব ওঁদের নিয়ে ভেতরে বসাল। পরিচয় পর্ব শেষ হল এরপর। ঝামেলা মাথায় নিয়ে, সাহায্যের আশায় ওঁরা এসেছেন জানালেন।

বাসব প্রশ্ন করল, কেসটা কি?

বিকাশ দত্ত বললেন, খুনের। পুলিশ মিসেস সান্যালের পিছনে লেগেছে। এন্টিসিপেটারি বেল অবশ্য নেওয়া হয়েছে। তবে—

—বুঝলাম। মিসেস সান্যাল, আপনি ঘটনাটা আমায় বলুন। অপ্রয়োজনীয় বলে আমার কাছে কিছু নেই। খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু বলুন?

রীমা একে একে সমস্ত কিছু বলে গেল।

নিভে যাওয়া পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, উদয় চৌধুরী তো ব্যান্ডেলেই আসছিল। হঠাৎ এই হোটেলের প্রোগ্রাম—

—আমার ইচ্ছেতেই হয়েছিল। অমার মনে হয়েছিল, পরিকল্পনার রূপ দিতে গেলে হোটেলই ঠিক জায়গা। চৌধুরীকে বলেছিলাম, ব্যান্ডেলে বার বার এলে ধরা পড়ে যাবার ভয়। তার চেয়ে মাসে একদুবার হোটেলে ব্যবস্থা রাখলে ভাল হয়।

—বড় বেশি রিস্ক নিয়েছিলেন। পরিনামও খুব খারাপ হয়েছে। মিঃ দত্ত, এই মামলায় আমি কিভাবে তদন্ত চালাবো? এঁর দেওয়া 'রেন্নু' খেয়ে চৌধুরী মারা গেছে। ধারে কাছে আর কেউ নেই।

বিকাশ দত্ত বললেন, একটা সূত্র আমাদের হাতে রয়েছে মিঃ ব্যানার্জী। তাই আপনার কাছে এলাম। অবশ্য খুবই জটিল সূত্র। পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অ্যালকহল আর ঘুমের ওষুধ চৌধুরীর পেটে পাওয়া গেছে। 'রেব্লু'-র নাম গন্ধ নেই।

বাসব নড়েচড়ে বসল।

—রিপোর্ট আপনি দেখেছেন?

—একটা কপি সংগ্রহ করেছি। এই যে—

রিপোর্টের কপি দত্ত এগিয়ে ধরলেন। বাসব গভীর মনযোগের সঙ্গে রিপোর্ট দেখল। দত্ত ঠিকই বলেছেন, অ্যালকহল আর ঘুমের ওষুধ ছাড়া পেটে আর কিছু পাওয়া যায় নি। ঘুমের ওষুধের যে মাত্রা তাতে কেউ মারা যেতে পারে না। মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, হঠাৎ হৃদয়গতি বন্ধ হয়ে যাওয়া। হার্ট অ্যাটাক বা শ্বাসরোধ নয়। এই ভাবে হৃদয়গতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। মৃত্যু সন্দেহের দায়রায় পড়তে পারে।

রিপোর্টের মূল কথা হল এই।

পড়া শেষ করে বাসব বলল, পরিস্থিত গত ব্যাপারটা মিসেস সান্যালের বিরুদ্ধে রয়েছে। নইলে ওঁর দেওয়া কিছু খেয়ে উদয় চৌধুরী মারা গেছে তা প্রমাণ করা যাবে না। তাই আইনের খচ্চাখচ্চি দীর্ঘদিন আদালতে গড়াবে।

প্রদোষ বলল, তাহলে বলছেন, আদালতই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

—আমি অন্য একটা কথা বলছি। দুটো কারণ সামনে থাকায় আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিচ্ছে, কেশটা খুনের। কারণ দুটো হল, রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'মৃত্যু সন্দেহের দায়রায় পড়তে পারে'। দ্বিতীয়তঃ 'রেব্লু' ভিক্টিমের পেট থেকে উবে গেল কিভাবে?

—তাই যদি হয় তবে—

—কেসটা আমি নিলাম। ঠিকানা রেখে জান। কাল সকালের কোন ট্রেনে ব্যান্ডেলে আসছেন। তখন কাজের কথা হবে।

একটু ইতঃস্তত করে প্রদোষ বলল, আপনার ফি কত জানা নেই। এখন দু'হাজার টাকা দিচ্ছি। পরে যা বলবেন—

—ঠিক আছে।

আরো দুচার কথা বলার পর এবং মৃত উদয় চৌধুরীর ঠিকানা দিয়ে মক্কেলরা চলে যাবার পর বাসব দেখল, আর গল্প-গুজোব করতে নয়, কাজের তাগিদেই লালবাজার যেতে হবে। কিন্তু সামন্ত কি এখনো অফিসে আছেন? চান্স একটা নিতে হয়।

আধ ঘন্টার মধ্যেই বাসব লালবাজার পৌঁছাল। ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল। বেরুবার মুখেই ছিলেন সামন্ত। মহাসোরগোল তুলে অভ্যর্থনা জানালেন। চা'এর অর্ডার দিতে বিলম্ব করলেন না। জানালেন, আজ দুপুরে বিশেষ কাজ ছিল না। তখন এলে এক ঘেয়েমির হাত থেকে বেঁচে যেতেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আমি কিন্তু এক ঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠার জন্যই এখন এখানে এসেছি।

—অর্থাৎ—

—একটা কেস হাতে এসেছে মিঃ সামন্ত।

—মার্ডার কেস? কোন্ অঞ্চলের ঘটনা?

—মধ্য অঞ্চলের। 'ইষ্টএন্ড' হোটেলে একজন মারা গেছে। ঘটনাটা একরকম আবার পোষ্টমর্টম রিপোর্ট বলছে অন্য কথা।

—কেসটা এখনও তাহলে থানাতেই আছে। থানার বাবুরা হালে পানি না পেলে আমাদের সামাল দিতে হয়। ঘটনাটা কি?

—আমি আপনাকে বিস্তারিতভাবে সমস্ত কথা বলছি। তবে—

—নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যা শুনবো তা অফ দি রেকর্ড ধরে নিতে পারেন।

—ধন্যবাদ।

বাসব ঘটনাটা ধারাবাহিকভাবে বলে গেল। 'রেন্নু' সম্পর্কিত পরিকল্পনার কথাও বাদ দিল না। সামন্ত মন দিয়ে শুনলেন। চা এসে পড়েছিল। বলা ও শোনার মধ্যে দুটো কাপই শেষ হল।

—আপনি বলতে চাইছেন—সামন্ত বললেন, উদয় চৌধুরীকে কেউ এমন কিছু খাইয়েছিল যার অ্যাকশন এক আধ দিন বা কয়েক ঘন্টা পরে হবার সম্ভাবনা?

—ঠিকই বলছেন। এখন বৃটিশ ফার্ম্মাকোপিয়া ঘেঁটে দেখতে হবে, এমন কোন কোন ভেষজ আছে যা রক্তের সঙ্গে মিশে সময় নিয়ে কাজ করে, অথচ পরে তার সন্ধান পাওয়া যায় না।

—'রেন্নু' ঐ-ধরনের কিছু নয় তো?

—হতে পারে। তখন অবশ্য আমার মক্কেলকে বাঁচানো যাবে না। তবু এই সম্পর্কেই অনুসন্ধান আমাকে আগে করতে হবে। আপাততঃ কিছু সহযোগিতা চাই।

—বলুন?

—আমার যতদূর ধারণা, মৃত উদয় চৌধুরীর পরিচয় পুলিশ এখনও পাইনি। আমার মক্কেল স্বাভাবিক কারণেই ভিক্টম সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। চৌধুরীর ঠিকানা আমার কাছে রয়েছে। আপনি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানিয়ে দেবেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তাদের জানা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

—সহযোগিতার কথা বলছিলেন—

—বেসরকারী তদন্তের অনুমতি আমার মক্কেল অবশ্যই নেবেন। মিসেস সান্যালের 'বেল' ক্যানসেলের ব্যাপারে এখনই যেন তৎপরতা না দেখান হয়। হপ্তা খানেকের মত ব্যাপারটা রুখে রাখা যায় কিনা দেখুন।

—ব্যবস্থা দেখছি। আর কিছু বলুন?

—আপাততঃ এই পর্যন্ত।

বাসব টেবিলের উপর রাখা শ্লিপ পেপারে উদয় চৌধুরীর ঠিকানা লিখে এগিয়ে

ধরল সামন্তর দিকে। আরো ঘন্টা খানেক কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। তারপর বাসব নিচে নেমে এল। স্বাভাবিক কারণেই সে এখন চিন্তিত। এই মামলার 'বেস' কি হওয়া উচিত এখনও বুঝে উঠতে পারেনি।

বেলা সাড়ে দশটার সময় বাসব ব্যান্ডেলে পৌঁছাল।

ট্রেনের ঝামেলায় যায় নি। ওল্ডসমোবাইল'এ চেপে চলে এল। আকাশে বেশ মেঘ। সকালে বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে। প্রদোষ তখন দোকানে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ওকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ড্রইংরুমে এনে বসাল। স্বাভাবিক কারণেই রীমাকে এখন মৃয়মান দেখাচ্ছে।

বাসব বলল, মোটামুটি ব্যবস্থা করেছি। পুলিশ আপাততঃ আপনাদের বিরক্ত করবে না। মিসেস সান্যাল, আপনার সেই বান্ধবী, যার কাছ থেকে 'রেল্লু' নিয়েছিলেন—কি যেন নাম?

রীমা বলল, রুচী। ওর স্বামী ডাক্তার। ওষুধটা সংগ্রহ করতে তাই সুবিধা হয়েছিল।

—এই যে ঝামেলায় পড়েছেন, ব্যাপারটা আপনার বান্ধবী জানেন?

—বাড়িতে পুলিশ এসে পড়াব পর চাপা থাকেনি কিছু। রুচী ছুটে এসেছিল। বাদছাদ দিয়ে তাকে ঘটনাটা বলতেই হল।

—আমি ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। অসুবিধা না হলে আমাকে নিয়ে চলুন ওঁর চেম্বারে। কয়েকটা কথা জেনে নিতে হবে।

প্রদোষ বলল, অসুবিধার কিছু নেই। ভদ্রলোক ভারি অমায়িক। তবে বলছিলাম, জলযোগ করে গেলে হত না?

—জলযোগ বাদ দিন। বরং চা বা কফির ব্যবস্থা হোক।

মিনিট পনেরো পরে কফি পর্ব শেষ করে প্রদোষ ডাঃ রায়'এর চেম্বারে বাসবকে নিয়ে চলল। বাড়িতেই চেম্বার। পরিচয় হবার পর খুশি হলেন মনে হল। কম্পাউন্ডারকে ডেকে বলে দিলেন কিছুক্ষণ ওঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। বেলা চড়ে যাবার দরুণ রুগীও বেশি ছিল না।

বাসব বলল, আপনার প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখীত। দায়িত্বের তাগিদ না থাকলে আসতাম না। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন সান্যাল দম্পতি একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন?

ডাক্তার একবার প্রদোষের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, পুলিশ এসেছিল শুনেছি। তবে আসল ব্যাপারটা কি আমার জানা নেই। আমার স্ত্রী হয়তো কিছু বেশি জানেন। তবে মুখ খুলছেন না।

—আমার ধারণায় পুলিশ একটা মামলায় এঁদের জড়াবার চেষ্টা করছে। পরে সবই জানতে পারবেন। এখন আমি গোটা কয়েক কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

—কি ব্যাপারে বলুন তো?

—আপনার একটা উগ্রমেজাজের ডোভারম্যান আছে। একটা ওষুধ খাইয়ে তাকে শান্ত করেছেন?

—'রেব্লু' কিন্তু—

—ঐ ওষুধ যদি মানুষ খায় তাহলে কি সে মারা যাবে?

—না। হজমের গোলমাল হতে পারে।

বাসব পকেট থেকে নেশার সরঞ্জাম বার করতে করতে বলল, আপনার স্ত্রী মিসেস সান্যালকে বলেছিলেন, 'রেব্লু' খেলে মানুষের শরীর পড়ে যায়—বাক্‌রোধ হয়ে যায়। একথা কেন বলেছিলেন বলুন তো?

মুখে হাসি টেনে ডাঃ সেন বললেন, 'রেব্লু' সম্পর্কে এত কথা কেন জানতে চাইছেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমার স্ত্রীকে ঐ কথা আমিই বলেছিলাম।

—কেন?

—ওঁর এক ভাইপো আছে। অসম্ভব দূরন্ত। কুকুরটাকে শান্ত হয়ে যেতে দেখে, উনি আমায় বললেন ওর ভাইপোকেও এক ডোজ খাওয়াবেন। বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ সমস্ত বলে ওঁকে ভয় দেখাতে হয়েছিল।

—আপনি পরে তো আপনার স্ত্রীকে 'রেব্লু' দিয়েছিলেন?

—না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, মিসেস সান্যাল আপনার স্ত্রীর কাছ থেকেই 'রেব্লু' পেয়েছিলেন।

—ওটা ঘুমের ওষুধ। ট্যাবলেট গুঁড়ো করে দিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীকেও আসল ব্যাপারটা জানতে দিইনি।

প্রদোষ অবাক হয়ে গেল।

বাসবের অবস্থাও তাই।

—অসুবিধা না থাকলে খুলে যদি বলেন ব্যাপারটা?

ডাক্তার এবার সতর্কতার সঙ্গে বললেন, কেন এত কথা জানতে চাইছেন এখনও বুঝতে পাচ্ছি না। অসুবিধা কিছু নেই। স্ত্রী বললেন একদিন, একডোজ 'রেব্লু' চাই। মিসেস সান্যাল একটা পমেডিয়ানকে খাওয়াবেন। কুকুরটা ভীষণ ঝামেলা করছে। আমার কেমন সন্দেহ হল। উনি হয়তো এই কায়দায় আমার কাছ থেকে 'রেব্লু' আদায় করবার চেষ্টা করছেন। সন্দেহের কারণ হল, পমেডিয়ান ঝামেলাবাজ কুকুর নয়। তখন আমি ওঁকে না ঘাঁটিয়ে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলাম।

—আপনার ট্রু কনফেশন খুশি হলাম। আমার আর কিছু জানবার নেই।

—ঐ ঘুমের ওষুধ কি কোন গোলমাল বাঁধিয়েছে? ভারি অস্থিরতা বোধ করছি। খুলে যদি বলেন ব্যাপারটা।

—আপনার দেওয়া ঘুমের ওষুধ কোন গোলমাল বাধায়নি। বরং তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এখন একটু ধৈর্য ধরতে হবে। প্রদোষবাবু কয়েকদিন পরে আপনাকে সব কথা বলবেন। অনেক ধন্যবাদ।

বাসব ওখান থেকে বিদায় নিয়ে আবার প্রদোষের বাড়ি ফিরে এল। ওর

মনের মধ্যে এখন বেশ কয়েকটা প্রশ্ন ওঠানামা করছে। উত্তরগুলো কিভাবে পাবে এটাও একটা বড় প্রশ্ন।

রীমা বলল, বেলা অনেক গড়িয়েছে। আপনি আপত্তি করলে শুনবো না। দুপুরের খাওয়াটা এখানেই সারতে হবে।

মৃদু হেসে বাসব বলল, বেশ তো। এদিকে, আপনার বান্ধবীর স্বামী কি বললেন জানেন? আপনাকে 'রেল্লু' দেওয়া হয়নি। ওটা ছিল ঘুমের ওষুধ।

বিস্ময়ের সুরে রীমা বলল, রুচীর কি দরকার ছিল মিথ্যা কথা বলার? ঘুমের ওষুধ জানলে আমি আদবেই কলকাতা যেতাম না। ভাবতাম যা হবার হবে।

—দুর্ভাগ্য ওখানেই। তবে আপনার বান্ধবী মিথ্যার আশ্রয় নেননি। আসল কথাটা তাঁরও জানা ছিল না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত—ঐদিন, ঐসময় উদয় চৌধুরী কোথাও না কোথাও মারা পড়তই। ওকথা এখন থাক। আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই। উত্তরগুলো কিন্তু ঠিক ঠিক হওয়া চাই।

—বলুন? জানা থাকলে সঠিক উত্তরই দেব।

প্রদোষ বলল, আমি দোকান থেকে ঘুরে আসছি মিঃ ব্যানার্জী। আমার সামনে রীমা হয়তো সহজ হতে অস্বস্তিবোধ করবে।

—ঠিক আছে।

প্রদোষ চলে যাবার পর বাসব পাইপ ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এরকম রিজিনেব্‌ল হাসবেন্ড পাওয়া যে কোন' স্ত্রীর পক্ষে ভাগ্যের কথা। আপনি কি বলেন?

রীমা মাথা নীচু করে বলল, আমি একথা ভালভাবেই জানি। তবু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওকে যদি আগে সমস্ত কথা বলে দিতাম, তাহলে এই দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হত না।

—ব্যাড ষ্টারের প্রভাব। এবার তাহলে প্রশ্ন উত্তরের পালা আরম্ভ হোক। আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

—চেতলায়। বনমালী সরকার স্ট্রীটে।

—উদয় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কিভাবে?

—ওঁরাও ঐ-পাড়াতেই থাকতেন। বেশ পয়সাওয়ালা। উদয় চৌধুরীকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনতাম। জানতাম লোকটা ভাল নয়। মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করে।

—এসব জানার পরও আপনার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল?

—দায়ে পড়ে বা চাপে পড়ে আমাকে লোকটার কাছাকাছি হতে হয়েছিল।

—কি রকম?

—আমার দাদা চৌধুরীর কাছ থেকে দুহাজার টাকা ধার নিয়েছিল। সময় মত শোধ করতে না পারায় অস্থির করে তুলেছিল তাগাদা দিয়ে দিয়ে। তখন আমি বি. এ. পড়ি। একদিন রাস্তায় আমাকে ধরে বলল, তোমার দাদাকে আমি জেলে পাঠাবো। তবে তুমি যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও, আমি সব ভুলে যেতে

পারি।

—প্রস্তাবটা কি ছিল?

—ওকে বিয়ে করতে হবে। আমি বললাম, আপনি তো মদ খান, দশটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে চৌধুরী জানাল, সব ছেড়ে দেবে। পারিবারিক ব্যবসা দেখবে। আমি অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মেয়ে ছিলাম। অভাব অভিযোগ ছিলই। ভাবলাম, আমার স্বার্থত্যাগে যদি পরিবারের স্বস্তি ফিরে আসে মন্দ কি। তারপর চৌধুরী আমাকে সিনেমা, থিয়েটার আর রেষ্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়া আরম্ভ করল। এইভাবে কাটল ছমাস। তারপরই একটা ব্যাপার নিয়ে পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। চৌধুরী নিজের মামাতো বোনকে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছে।

—তারপর কি হল?

—আরো শুনলাম, সে তার বৌদির সঙ্গে নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে ছিল। আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন। বোধ বুদ্ধি কম থাকার দরুণ নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলাম। আমারও খুব বদনাম হচ্ছিল। বাবা আমাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এর বছর খানেক পরে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

—আপনার মামার বাড়ি কোথায়?

—সোনারপুরে। ওখান থেকেই আমার বিয়ে হয়েছিল।

—চৌধুরীর সঙ্গে আবার কবে দেখা হল?

—বিয়ের পাঁচ বছর পরে। কিভাবে ওখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল জানি না। বার বার এখানে আসতে লাগল। আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম ভবিষ্যত বলে আর আমার কিছু থাকবে না। প্রদোষের মত স্বামীকে আমি হারাবো। ইতিমধ্যে 'রেনু' সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। মন শক্ত করে পরিকল্পনা স্থির করলাম। চৌধুরীকে একদিন বললাম, এখানে এস না। ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। মাসে বার দুয়েক হোটেলে দেখা হবে—সেই ব্যবস্থা করো। সে রাজী হয়ে গেল। এর পরের ঘটনা আপনি জানেন।

—আপনার পরিকল্পনায় অপরিণামদর্শীতার ছাপ ছিল। এখন ভুগছেনও তাই। যাহোক, উদয় চৌধুরী খুন হয়েছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই আমরা এগুচ্ছি। আপনার ধারণায় তাকে কে খুন করতে পারে?

—লোকটার অনেক শত্রু। অনেক জায়গায় অনেক বিশ্রী কাণ্ড করেছে। যে কেউ তাকে খুন করতে পারে।

—বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল?

—আমি যত দূর জানি, একেবারেই ভাল নয়। আপনাকে তো আগেই বললাম. নিজের বৌদির সঙ্গে কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিল।

—আজ এই পর্যন্ত। প্রয়োজন পড়লে এ সম্পর্কে পরে আবার কথা হবে। রীমা বলল, প্রায় একটা বাজে। আপনি বরং খেয়ে নিন।

—সান্যাল আসুন। ভাল কথা, বিকাশবাবু বেসরকারী তদন্তের অনুমতির ব্যবস্থা করছেন তো?

—হ্যাঁ! আজই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রদোষ এই সময় এসে পড়ল।

পরের দিন দুপুরবেলা নির্দ্দিষ্ট থানায় গিয়ে পৌঁছাল বাসব। ইতিমধ্যে সামন্ত বেসরকারী তদন্তের কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। এবং প্রয়োজন বোধে সব রকম সহযোগীতা যে দিতে হবে সে নির্দেশও দেওয়া ছিল।

অভয় সোম থানাতেই ছিলেন।

বাসব কার্ড এগিয়ে ধরল। সোম ভ্রূ কুঁচকে আগন্তুকের দিকে তাকালেন। তারপর বসতে বললেন। বাইরের লোকের এই ধরনের দাপাদাপি তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। তবে আপত্তি করার উপায় নেই। শুনেছেন, কর্তাদের ভারি গুডবুকে আছেন এই ব্যক্তি। নড়েচড়ে বসলেন।

—বলুন?

বাসব বলল, আমি আপনার মনের অবস্থা অনুমান করতে পারছি। আমার চৌহদ্দিতে কোন বাইরের লোক মাথা গলালে আমারও ভাল লাগত না। স্টেটমেন্টের কপিগুলো একবার দেখতে চাই।

সোম বললে, আমার ধারণা হয়েছিল আপনি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট প্রথমে দেখতে চাইবেন।

—প্রয়োজন হবে না।

—মার্ডার কেস-এর তদন্ত পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখার পরই আরম্ভ কবা হয়। নইলে কি ভাবে—

—আমি জানি। রিপোর্ট আমি দেখেছি। বলতে গেলে ঐ রিপোর্টই আমাকে এই তদন্ত ভার নিতে উৎসাহিত করেছে।

—কি রকম?

—তার আগে একটা প্রশ্ন? রীমা সান্যালকে সন্দেহ করার কারণ?

—মহিলা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, উনি উদয় চৌধুরীর সঙ্গেই ছিলেন। এবং ভোরবেলা হোটেল থেকে সরে পড়েছেন।

—আপনার কথা মেনে নিলাম। এতে কি প্রমাণ হচ্ছে, মিসেস সান্যাল উদয় চৌধুরীকে খুন করেছেন?

—উনি সেদিন চৌধুরীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। নির্দোষ যদি হবেন তবে পালালেন ,কেন?

—ভয় পেয়ে। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। আপনি কি চৌধুরীর শরীরে কোন আঘাত দেখেছিলেন? দেখেন নি। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে? পাওয়া যায় নি। মদ বা ঘুমের ওষুধ খেয়ে যে মৃত্যু হয়নি বিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে। তাহলে আমার মক্কেলের ভূমিকা কোথায়?

একটু ইতঃস্তত করে সোম বললেন, রিপোর্টে কিন্তু বলা হয়েছে মৃত্যু সন্দেহজনক।

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, তাইতো আমি মাঠে নেমেছি। আমাকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে মৃত্যু কি ভাবে হয়েছে। আমরা সাদা চোখে যা দেখছি, এছাড়াও পুরো ব্যাপারটার আরো একটা দিক আছে কিনা।

—আপনি বলতে চাইছেন, ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে অন্য কেউ উদয় চৌধুরীকে মেরে ফেলেছে?

—আমি তাই বলতে চাইছি।

এবার অবজ্ঞার হাসি দেখা দিল অভয় সোমের মুখে।

—সেই ব্যক্তি কিভাবে মারল চৌধুরীকে?

—নিশ্চিতভাবে কিছু খাইয়ে।

—অর্থাৎ কোন বিষ। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে তার কি কোন উল্লেখ থাকতো না।

—উল্লেখ নেই আমি জানি। আপনি জানেন কিনা জানি না, এমন কিছু ভেষজ আছে যা নিজের কাজ সেরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে শবীব থেকে উবে যায়। আপনি হোটেলের ঘরে মদের বোতল পেয়েছিলেন?

—হুইস্কির একটা আর বিয়ারের বোতল ছিল।

—হুইস্কিব বোতল অর্ধেক খালি হয়েছিল?

—না। মনে হয দেড় কি দু পেগ খরচা হয়েছিল।

—অথচ রিপোর্ট অনুসারে চৌধুরীর পেটে অ্যালকোহলের মাত্রা অনেক বেশি। এতে কি প্রমাণ হচ্ছে না, হোটেলে আসবার আগে চৌধুরী এক প্রস্থ নেশা করে এসেছিল। অঘটন যা ঘটবার তখনই ঘটেছে। মারা পড়েছে শুধু হোটেলে এসে।

অভয় সোম গুম হয়ে গেলেন।

বাসব আবার বলল, যেতে দিন ওসব কথা। আপনি আপনার কথা ধরেই এগুতে থাকুন। আমিও চেষ্টা করে দেখছি কতদূর কি কবতে পারি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, আর কথা নয়। স্টেটমেন্টেব কপির উপর চোখ বুলিয়েই চলে যাবো।

অভয় সোম ধাঁধায় পড়ে গেলেন। গোয়েন্দা ভদ্রলোক যা বলছেন তার সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। অ্যালকোহল আর ঘুমের ওষুধে মৃত্যু হয়নি—হঠাৎ যে হার্টফেল হয়েছে একথাও পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উনি গা ঘামাবেন না, রীমা সান্যালের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেবেন।

চিন্তার বিষয়। গা না ঘামিয়ে বোধহয় উপায় নেই। এই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দৌলতে ব্যাপারটা লালবাজার পর্যন্ত গড়িয়েছে। রীমা সান্যাল ওজনদার মুরুব্বি জোগাড় করতে পেরেছে মানতেই হবে। উনি ডানধারের দেরাজ খুলে বাদামী রং-এর একটা ফাইল বার করলেন। ফাইলটা এগিয়ে দিলেন বাসবের দিকে। এজাহারের মোটামুটি সারাংশ নিম্নরূপ—

উমানাথ চৌধুরী—নিহত উদয় চৌধুরীর জনক টিম্বারের ফলাও কারবার।

ধনী ব্যক্তি। ছেলের চালচলন এবং কার্যকলাপে খুশি ছিলেন না। তাকে সোজা পথে আনবার অনেক চেষ্টা করেছেন—সফল হননি। রীমা সান্যালকে ভালই চেনেন।

এক সময় ঐ মেয়েটি সম্পর্কে উদয় ইন্টারেস্টেড ছিল। এরপর আবাব কবে যোগাযোগ হয়েছিল তিনি বলতে পারেন না। ওর বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। যদি শুধরে যায়। রাজী হয়নি। অগত্যা ছোটছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

১৫ই জানুয়ারি বেলা তিনটের সময় শেষবার তাঁর সঙ্গে উদয়ের দেখা হয়। তখন সে ব্যস্তভাবে বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল। সে রাত্রে সে ফেরেনি। এজন্য গৃহকর্তা চিন্তিত হননি। কারণ এরকম কতবার হয়েছে, সে না বলে কয়ে বাড়ি থেকে পাঁচ-সাতদিন অনুপস্থিত থেকেছে। স্বভাবের দোষে তার অনেক শত্রু ছিল। কে তাকে মেরেছে নিশ্চিতভাবে তিনি বলতে পারেন না। রীমা এই কাজ করে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। মেয়েটিকে উদয় অসম্ভব বিরক্ত কবছিল। ওর মৃত্যু সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই। বাকী দুই ছেলে, পুত্রবধূ, মেয়ে এবং জামাই সব দিক দিয়ে খুবই স্বাভাবিক।

সোমনাথ চৌধুরী—উদয়ের কাকা যৌবনের সূচনায় প্লুরিসি হয়েছিল, তাই বিয়ে করেননি। দাদাব সঙ্গেই থাকেন। তারও টিম্বারের ব্যবসা। উচ্ছৃঙ্খল ভাইপোকে তিনি স্নেহের চোখে দেখতেন। তাকে ঠিক পথে আনার বহু চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন।

১৫ই জানুযারি তিনি বেলা এগারোটার সময় কাজে বেরুচ্ছিলেন। সেই সময উদয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উদয দু'হাজার টাকা চাওয়ায় তিনি দিয়েছিলেন। টাকাটা নিয়ে সে কি করবে বলেনি। আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। উদয়ের অনেক শত্রু ছিল এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। তার স্বভাবের দোষেই এত শত্রুর সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই খুনের ব্যাপারে রীমার বড়ভাই-এর হাত থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবিবাহিতা রীমাকে উদয় যথেষ্ট উত্যক্ত করেছে। এখন শুনছি বিয়ের পরও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেছিল। ওর মৃত্যুতে পরিবারে স্বস্তির ভাব এলেও উনি চান হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

উদিত চৌধুরী—উদয় চৌধুরীর বড়ভাই। পৈতৃক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সিরিয়াস ধরনের মানুষ। বয়স বিয়াল্লিশ। পিঠোপিঠি হওয়ার দরুণ উদয়কে তিনি পছন্দ করতেন। ক্রমে ক্রমে তার স্বভাব এমন বিশ্রী মোড় নিল যে বাধ্য হয়েই বেশ কিছুদিন থেকে দূরত্ব বজায় রেখেই চলছিলেন। নিজের স্বভাবের দোষেই উদয় নিজের অনেক শত্রু সৃষ্টি করেছিল। রীমা তাদেরই মধ্যে একজন। সে যদি ওকে মেরে ফেলে থাকে তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদিও ব্যক্তিগতভাবে উনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, দুর্দান্ত উদয়কে রীমা শেষ করার সাহস কিভাবে সংগ্রহ করল। উদয়ের কোন বন্ধু-বান্ধবকে তিনি চেনেন না। ওর কোথায় কোথায় আড্ডা ছিল সে সম্পর্কে ওঁর কোন জ্ঞান নেই।

১৫ই জানুয়ারি সকাল আটটার সময় দোতলার পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসে উদয়কে দাড়ি কামাতে দেখেছিলেন। কোন কথাবার্তা হয়নি। তারপর ওকে দেখেন কাজে বেরুবার সময়। তখন উদয় কাকা সোমনাথের সঙ্গে কথা বলছিল। কি নিয়ে কথা হচ্ছিল, আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এবং স্বীকার করে নিলেন, উদয়ের মৃত্যুতে পারিবারিক স্বস্তি ফিরে আসবে।

উজ্জ্বল চৌধুরী—উদয় চৌধুরীর ছোটভাই। পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নন। 'ওয়েভলি কাম' গ্রুপে ভাল চাকরি করেন। বয়স বত্রিশ মেজদা অর্থাৎ উদয় চৌধুরীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা ঘোর অপছন্দ ছিল। এ নিয়ে বহুবার দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছে। একবার তো পরিস্থিতি মারামারির পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

মেজদা যে এতদিন বেঁচে ছিলেন এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। স্বভাবের দোষে তাঁর অসংখ্য শত্রু ছিল। রীমা সান্যাল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মেজদা তার জীবন দুর্বিসহ করে তোলার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। সে হত্যার ব্যাপারে জড়িত থাকতেই পারে। তবে কাজটা তার একার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। নিশ্চিতভাবে একজন সহযোগী আছে।

১৫ই জানুয়ারি উজ্জ্বল চৌধুরী অফিসের কাজে দুর্গাপুর গিয়েছিলেন। কাজেই সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরুতে হয়েছিল। তখন তিনি দোতলার বারান্দায় মেজদাকে দাড়ি কামাতে দেখেছেন। কোন কথা হয়নি। এরপর দুজনের আর দেখা হয়নি। বয়স একটু চড়ে গেছে—বিয়ে আগেই করা উচিত ছিল। দিদির ননদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দিনের। হচ্ছে হবে করে এতদিন হয়নি। সামনের বৈশাখে বিয়ের ব্যাপারটা মিটে যাবে স্থির হয়ে রয়েছে।

এজাহারের বিস্তার বড় নয়।

বাসবের পড়া শেষ করতে বিশেষ সময় লাগল না। পুলিশ পক্ষের দায়সারা কান্ডাকারখানায় অবাক-না হয়ে পারা যায় না। দোষ রীমা সান্যালের এ সম্পর্কে মাইন্ডমেকআপ হয়ে যাওয়ায় আর কোন দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয়নি। বাসব ফাইল টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

—ধন্যবাদ। চলি—

অভয় সোম বললেন, কিরকম বুঝলেন?

—প্রশ্ন করলেন তাই উত্তর দিচ্ছি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভালভাবে জেরা করা হয়নি। দায়সারা ব্যাপার। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মিসেস সান্যালের দাদার কথা অন্ততঃ দুজন উল্লেখ করেছেন। অথচ তাকে আপনারা জেরা করেননি! এরপর আরো আছে।

—আরো বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

বাসব বলল, বোঝাবার দায়িত্ব আমার নয়। তবু বলছি, একটু অনুসন্ধান করলেই বুঝতে অসুবিধা হত না, ওধারে কত গলদ রয়েছে। আমি অল্প আয়াসেই জানতে পেরেছি, উদয় চৌধুরী তার বৌদির সঙ্গে অশালীন কান্ডকারখানায় জড়িত

ছিল। আরো জানতে পেরেছি, ছোটভাই-এর ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে সে একবার সবে পড়েছিল।

মনের মধ্যে হোঁচট খেলেন অভয় সোম।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আপনি যা বললেন, তা যদি সত্যি হয় তবে পরিস্থিতি গোলমেলে নিশ্চয়। মনে হয়, এ সমস্ত কথা আপনি জানতে পেরেছেন রীমা সান্যালের কাছ থেকে। উনি আমাদের সঙ্গে একেবারেই সহযোগিতা করেন নি।

—ঐ রকম পরিস্থিতিতে পড়লে কেউই পুলিশের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে না। জেনে নেওয়ার আরো উপায় ছিল। মিসেস সান্যালের দাদাকে নাড়াচাড়া করলে ঐ সমস্ত তথ্য সহজেই বেরিয়ে আসতো। আরেকটা কথা—

—বলুন?

—মিসেস সান্যালের নামে চার্জশিট এখনই কোর্টে দাখিল না করলেই ভাল করবেন। উপরতলায় এ সম্পর্কে আমার কথা হয়েছে।

বিরক্তসূচক ভঙ্গীতে সোম কাঁধ ঝাঁকালেন।

বাসব ওখান থেকে সোজা বাড়ি চলে এল। স্টেটমেন্টের কপির জন্য অনুরোধ জানাবার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করল না। এত সাধারণভাবে জেরা করা হয়েছে যে তার তুলনা মেলা ভার। ওকে এখন সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আসল ব্যাপারটা কি জেনে নেবার ওটাই হল সরল পথ।

ওল্ডস মোবাইলকে গ্যারাজে ঢুকিয়ে, ড্রইংরুমে প্রবেশ করার পরই অবাক হয়ে গেল। হোমিসাইডের বড়কর্তা পুরন্দর সামন্ত সোফায় একটু হেলে বসে শৈবালের সঙ্গে গল্প করছেন। ওকে দেখে মৃদু হাসলেন।

বাসব বলল, কতক্ষণ এসেছেন?

—আধ ঘন্টাটাক হবে।

তারপর শৈবালকে দেখিয়ে সামন্ত বললেন, ইনি ছিলেন, নইলে আমি তো ফিরে যেতাম। কোথায় গিয়েছিলেন?

—থানায়। এখন মনে হচ্ছে না গেলেও চলতো। স্টেটমেন্ট পড়ে বুঝলাম নিয়মরক্ষা করা হয়েছে শুধু।

—আজকালকার কাজ-কারবারই ঐরকম। তদন্ত যেন কোন পাখীর নাম যা আমরা ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি। যাহোক, আমি এখন কেন এসেছি বলুন তো?

—মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণ আছে।

সামন্ত বললেন, ঠিকই ধরেছেন। আপনার মক্কেলকে বোধহয় বাঁচাতে পারলাম না। পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠেছে।

বিস্মিত গলায় বাসব প্রশ্ন করল, কি হয়েছে বলুন তো?

—উদয় চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে এক আবেদন পাঠানো হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে। আবেদনের মূল বক্তব্য হল, সমস্ত রকম সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতবাবে পুলিশ রীমা সান্যালকে কাস্টডিতে নেয়নি। অবিলম্বে মহিলাকে গ্রেপ্তার

করার আদেশ দেওয়া হোক।

—বলেন কি?

—ব্যাপারটা তাই। হোম সেক্রেটারি ব্যাপারটা আমাদের কমিশনারকে জানিয়েছেন। এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেবার কথা বলেছেন।

—মহিলা অ্যারেস্ট হয়ে গেছেন নাকি?

—এখনও নয়। ওঁর অ্যান্টিসিপেটারি বেল থাকার দরুণ একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তবে দুর্ঘটনাটা কলকাতার। জুরিসডিকশনের কথা মনে রেখে আইনজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আপনি বন্ধুলোক। ভাবলাম আগাম কথাটা জানিয়ে রাখি।

ধন্যবাদ। আপনি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলেন। এখন আমার প্রধান কাজ হল প্রদোষ সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করা। ডাক্তার, বাহাদুরকে নাড়া দিয়ে এস না—চা-টার ব্যবস্থা করুক। মিঃ সামন্ত আমাকে মিনিট কয়েক সময় দিন। দেখি, সান্যালকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা।

সামন্ত বললেন, আমি বরং এখন উঠি। আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে। আপনি পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগুন।

ওদিকে—

কিছুটা আগামই প্রদোষ দোকান থেকে ফিরে এসেছে। চা-পর্ব শেষ করে দুজনে বসেছে উত্তরদিকের গ্রিল ঘেরা বারান্দায়। রীমাকে শুকনো দেখাচ্ছে। এখনও নিজেকে সে স্বাভাবিক করে তুলতে পারেনি। একটা ভয়—একটা আশঙ্কা বিরামহীনভাবে মনকে খুঁচিয়ে চলেছে।

প্রদোষ বলল, এত মনমরা হয়ে থাকার কোন মানে হয় না। তদন্ত বাসববাবুর হাতে রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি যে কোন ভাবেই হোক আমাদের বাঁচাবেন।

—আমি যে বুঝি না তা নয়। কিন্তু কি করব বল? ভয় ভাব মন থেকে একেবারেই সরাতে পাচ্ছি না।

—আমাকে নতুন করে ভালবাসতে আরম্ভ কর না। ভয়টয় কোথায় চলে যাবে। আমরা পুরোনো দিনকে আবার নতুন করে পাবো।

রীমা হেসে ফেলল।

—আমি তোমাকে কত গভীরভাবে চাই তার আন্দাজ এখনও তোমার হয়নি। প্রদোষ, তুমি কখনও আমার কাছে পুরনো হবে না।

কিছু বলতে যাবার আগেই প্রদোষকে থামতে হল। ঠোঁটের এক পাশে সিগারেট ঝুলিয়ে রজত এসে উপস্থিত হল। রীমার বড়ভাই। একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে কাজ করে। প্রদোষ শ্যালককে সহর্ষে অভ্যর্থনা জানাল। বসাল নিজের পাশে।

—কবে তুমি ফিরলে দাদা?

রীমার প্রশ্নের উত্তরে রজত বলল, আজই সকালে।

কেস-এ জড়িয়ে পড়েছো। উদয় মরেছে, ভালই হয়েছে

যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুমি এর মধ্যে কিভাবে

উদয় চৌধুরী মারা যাবার দুদিন আগে রজত অফিসের কাজে বম্বে গিয়েছিল। ওকে মাঝে মাঝেই বম্বে, দিল্লী বা কানপুর যেতে হয়।

প্রদোষ বলল, তোমার বোনের বোকামি। উদয় চৌধুরী ওকে বিরক্ত করছে, একথা আমাকে আগে জানালে এত ঝামেলা পোহাতে হত না।

—মা আমাকে গুছিয়ে ব্যাপারটা বলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আসলে কি হয়েছিল বলতো?

এই সময় টেলিফোনের ঝঙ্কার শোনা গেল।

—আসছি—

কথা শেষ করেই প্রদোষ পাশের ঘরে চলে গেল।

ফিরে এল মিনিট কয়েক পরেই। বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে।

রীমা দ্রুত গলায় বলল, কার ফোন ছিল?

—বাসববাবুর।

—তোমাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। কি বললেন উনি?

প্রদোষ ম্রিয়মাণ গলায় বলল, 'বেল' বোধহয় ক্যানসেল হয়ে যাবে। পুলিশপক্ষ থেকে আমাদের অ্যারেস্ট করার তোড়জোড় চলেছে।

ভয় রীমাকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে ধবল।

বলল কোনরকমে, কি হবে?

—আইনঘটিত মার-প্যাঁচের এখন দরকার। উনি বিকাশবাবুর সঙ্গে অবিলম্বে কথা বলতে বললেন।

রজত বলল, 'বেল'ক্যানসেল হওয়ার মানেই হল তোমাদের জেলে যাওয়া। ব্যাপারটা বিশ্রী মোড় নিয়েছে। বাসববাবু কে— ?

—বেসরকারী গোয়েন্দা। আমাদের কেস-এর তদন্ত ভার ওর উপরই রয়েছে। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

আরো দুচার কথার পর, রজতকে বাড়িতে রেখেই ওরা দুজন বেবিয়ে পড়ল। স্কুটারের সহযোগিতায় চুঁচুড়া পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। বিকাশ দত্ত বাড়িতে না থাকলেও পাড়াতেই ছিলেন। খবর পেয়েই চলে এলেন। বিপদ কোন ধাব দিয়ে আসছে শুনলেন সে কথা।

চুপ করে রইলেন অল্পক্ষণ।

বললেন তারপর, জুরিসডিকশনের একটা ব্যাপার আছে আমি জানতাম। তবু ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট থেকে 'বেল' নিয়েছিলাম। আপনাবা অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। তখনকার মত পুলিশকে আটকানো দরকাব ছিল।

রীমা বলল, 'বেল' আমরা পেয়ে গেছি। ক্যানসেল হবে কেন?

—ঐ যে জুরিসডিকশনের কথা বললাম। হুগলী জেলার মধ্যে ঘটনাটা ঘটলে কোন আসুবিধা ছিল না। ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট অনুসারেই ব্যাপারটা গড়ায়। উদয় চৌধুরী খুন হয়েছে কলকাতায়।

দ্রুত গলায় প্রদোষ বলল, কলকাতা থেকে 'বেল' নিলেই হত।

বিকাশ দত্ত বললেন, কলকাতা থেকে 'অ্যান্টিসিপেটারি বেল' পাওয়া সহজ হত না। বললাম না, তখনকার মত পুলিশকে রুখে দেওয়ার জন্যে জেলা আদালতের সাহায্য নিয়ে ছিলাম।

—ক্যালকাটা পুলিশ এখন কি করবে আপনি আন্দাজ করতে পারছেন?

—ওরা সি. আর. পি. সি'র ৪৪৬এ/বি ধারার সাহায্য নেবে। অর্থাৎ ঘটনাটা কলকাতার কাজেই চুঁচুড়া কোর্টে নেওয়া অ্যান্টিসিপেটারি বেল এক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। এই আবেদন আলিপুর কোর্ট মেনে নেবে।

কোনরকমে রীমা বলল, আর কোন উপায় আছে কি?

—নিশ্চিত কোন উপায় নেই। আমাদের একটা চান্স নিতে হবে। এবার 'অ্যান্টিসিপেটারি' নয়, জেনারেল 'বেল'-এর জন্য আবেদন করব আমরা।

প্রদোষ বলল, মার্ডার কেস—'বেল' কি পাওয়া যাবে?

বিকাশ দত্ত চশমা নাকের উপর ঠিকভাবে বসিয়ে নিয়ে বললেন, ৩০২ ধারা—নন বেলেবল সেকসন। তবু আপনারা নার্ভাস হবেন না। ঠিকমত যুক্তি উপস্থিত করতে পারলে, আদালতের মত আমাদের পক্ষেই যাবে। পুলিশের আপনাদের কাছে আসতে এখনও দিন দুয়েক সময় লাগবে। অবশ্য আমরা সময় নষ্ট করব না। কালই আপনারা দুজন আলিপুর কোর্ট-এ সারেন্ডার করবেন। আমি বসন্ত ঘোষালের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

—তিনি কে—

—ক্রিমিনাল সাইডের দুঁদে অভিবক্তা। নয়কে ছয় করার ক্ষমতা রাখেন। বুঝতেই পাচ্ছেন, খরচ ভাল মতই পড়বে।

—খরচের জন্য চিন্তা নেই। আপনি কথা বলুন।

—একটা কথা এখনই জানিয়ে রাখি, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আবেদন করতে হবে। ওখানে 'বেল' ক্যানসেল হবে—এটাই অলিখিত প্রথা। পেপারস রেডি থাকবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপার কোর্টে আবেদন করব।

—যদি আপার কোর্ট 'বেল' খারিজ করে দেয়?

—এখনই এত নিরাশ হবেন না। বসন্ত ঘোষালকে অ্যাপিয়ার করা হচ্ছে। ওঁর যুক্তি জাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারকদের প্রভাবিত করে। এখন আমাদের কাজ হল ঘোষালের সঙ্গে দেখা করা। মিসেস সান্যালকে বাড়ি পৌঁছে দিন। তারপর আমরা কলকাতা যাবো।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যথারিতি 'বেল' খারিজ করে দিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা ছিলই। বেলা আড়াইটের সময় বসন্ত ঘোষাল আপার কোর্টে রীমা আর প্রদোষকে উপস্থিত করলেন। ওরা দুজনেই ভারি অস্বস্তির মধ্যে রয়েছে। বাষট্টি বছর বয়স্ক অভিজ্ঞ অধিবক্তা বসন্ত ঘোষাল নিজের মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য নির্দিষ্ট সময় উঠে দাঁড়ালেন।

চওড়া হাড়ের দীর্ঘকায় পুরুষ। বহু জটিল ও বিতর্কিত মামলায় সাফল্য লাভের

নজীর সৃষ্টিকারী এই ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। পকেট থেকে রুমাল বার করে, মুখের উপর বুলিয়ে নেবার পর উনি বিচারকের দিকে তাকালেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন।

বসন্ত ঘোষাল ঃ ইয়োর অনার, আমার মক্কেল শ্রীমতী রীমা সান্যাল এবং শ্রী প্রদোষ সান্যাল ইতিমধ্যেই চুঁচুড়া কোর্ট থেকে অ্যান্টিসিপেটারি 'বেল' পেয়েছেন। তবু আমি এই আদালতে ওঁদের 'বেল'-এর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। কারণ জুরিসডিকশনের ধোঁয়া তুলে স্থানীয় পুলিশ আমার মক্কেলদের আতান্তারে ফেলার চেষ্টায় আছে এইরকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ইওর অনার, পিটিশন এবং পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট আদালতে প্রস্তুত করা হয়েছে। 'ইস্টএন্ড' হোটেলের ১২০ নম্বর ঘরে জনৈক উদয় চৌধুরীর সন্দেহজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এর জন্য দায়ী রীমা সান্যাল। তিনি উদয় চৌধুরীকে পানীয়র সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করেছেন। এবং এ ব্যাপারে নেপথ্য সহযোগী হলেন তাঁরই স্বামী প্রদোষ সান্যাল। পুলিশের এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। তদন্তের ব্যাপারে ওঁরা গা ঘামিয়ে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা আজকাল বোধ করেন না। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে মৃত্যু সন্দেহজনক বলা হলেও, ভিক্টিমের শরীরে অ্যালকোহল এবং ঘুমের ওষুধ ছাড়া কোন বিষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ঘুমের ওষুধের মাত্রা এত কম যে তাতে মৃত্যু হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, এ কথাও রিপোর্টে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে শ্রীমতী সান্যাল উদয় চৌধুরীর সন্দেহজনক মৃত্যুর জন্য সরাসরি দায়ী হতে পারেন না। ঐ একই কারণে প্রদোষ সান্যালকে শ্রীমতীর সহযোগি হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না। ইওর অনার, মহামান্য আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা, এই পরিস্থিতিতে সান্যাল দম্পতির 'বেল' মঞ্জুর করা হোক।

বক্তব্য শেষ করে বসন্ত ঘোষাল আসন গ্রহণ করলেন।

এবার উঠে দাঁড়ালেন সরকারী পক্ষের ব্যবহারজীবী অনিমেষ গুপ্ত।

অনিমেষ গুপ্ত ঃ ইওর অনার, এই 'বেল'-এর আবেদন সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এই মামলার শেষ কথা নয়। আদালতে পুলিশকে অবজ্ঞা করার একটা ফ্যাশান ইদানিং দেখা যাচ্ছে। এই আত্মতুষ্টির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইওর অনার, এখানে পরিস্থিতি গত দিকটা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। অভিযুক্তা রীমা সান্যাল ১৫ই জানুয়ারি 'ইস্টএন্ড' হোটেলে উদয় চৌধুরীর স্ত্রীর পরিচয়ে ১২০ নম্বর ঘরে ছিলেন। এবং পরের দিন ভোরবেলা একটা অজুহাত খাড়া করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেন। পুলিশের তৎপরতার দরুণই রীমা সান্যালের সন্ধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় ব্যান্ডেলে। এবং হোটেলের ম্যানেজার ও বেয়ারা পাত্র মহিলাকে সনাক্ত করেছে। এরপরও কি বাদী পক্ষের মাননীয় বন্ধু বলবেন, তাঁর মক্কেল এই সন্দেজনক মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানেন না? ঘটনাস্থলের ধারে কাছেই ছিলেন না? ইওর অনার, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকার অপচেষ্টা কোন আদালত কখনও সমর্থন করে না। অতএব

আমার প্রার্থনা 'বেল'-এর আবেদন নাকচ করা হোক।

অনিমেষ গুপ্ত আসন গ্রহণ করার আগেই বসন্ত ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন।

বসন্ত ঘোষাল ঃ ইওর অনার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সরকারী পক্ষেব মান্যবর অধিবক্তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে যে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তা তুলনারহিত। হোটেলের ম্যানেজার ও বেযারা শ্রীমতী সান্যালকে সনাক্ত করেছে এটাই যদি ওপক্ষের শেষ কথা হয়, তবে আমি এই আদালতে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, কিছু সময় পেলে ব্যান্ডেলের এমন দশজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উপস্থিত করতে পারি—যাঁদের মধ্যে একজন এম. এল. এ.-ও থাকবেন, যাঁরা বলবেন, শ্রীমতী সান্যাল ১৫ই জানুয়ারি আদপেই কলকাতা যান নি। সেদিন উনি ছিলেন তাঁদেরই সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে। কাজেই পলকা সুতোর মত সূত্রকে নির্ভর করে কারুর চরিত্র হনন করা চলে না। ইওর অনার, ভাবাবেগ নয়, স্থূল বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া নয়—এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কবতে হবে পরিস্থিতি গত বিষয়টি। এবার আমি সংখ্যা দিয়ে বিষটটিকে প্রাঞ্জল করতে চাই।

এক ঃ মৃত উদয় চৌধুরীর আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে এফ. আই. আর. করেন নি। সে ক্ষেত্রে রীমা সান্যাল তাঁদের পরিচিতা।

দুই ঃ এই কেস-এ তদন্তের প্রয়োজনে পুলিশের পক্ষ থেকে যে ফার্স্ট ইনফবমেশন ডায়েরিভুক্ত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহাস্পদ হিসাবে মৃত উদয় চৌধুরীব স্ত্রী মিতা ঘটকের নাম উল্লেখ কবা হয়েছে।

তিন ঃ পরে সাপ্লিমেন্টাবি সংযোজন করে মিতা ঘটকের নামের পরিবর্তে রীমা সান্যালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

চার ঃ রীমা সান্যাল এক প্রতিষ্ঠিত এবং ধনাঢ্য পরিবারের বধূ। তিনি নিজের সম্মান ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করাব জন্য পরের স্ত্রীর পরিচয দিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠবেন, এ এক কষ্ট কল্পনা।

পাঁচ ঃ পুলিশ 'ইস্টএন্ড' হোটেলের ১২০ নম্বর ঘরের কোন আসবাব, গেলাস, বিয়ার ক্যান বা মদের বোতলের উপর থেকে এমন কোন ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি যা রীমা সান্যালের হাতের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে।

ছয় ঃ হোটেলের ম্যানেজার বা বেয়ারার সাক্ষ্য সরকারী পক্ষ যত গুরুত্বপূর্ণ মনে করুন—আমি আদালতকে অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে জানাতে চাইছি ১৯শে জানুয়ারী রীমা সান্যাল যে ব্যান্ডেলের এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এ সম্পর্কে প্রয়োজন বোধে আদালতে যাঁরা সাক্ষ্য দেবেন তাঁদের শিক্ষাদিক্ষা পদমর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রশ্নাতীত।

সাত ঃ এই মামলার সঙ্গে আমার মক্কেলদের কোনই সম্পর্ক নেই। তবু আমি মহামান্য আদালতকে জানিয়ে রাখা নিজের দায়িত্ব মনে করছি যে, পুলিশপক্ষ প্রকৃত ঘটনাকে কিভাবে বিকৃত করেছে। যেমন—(ক) পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে বলা হয়নি, উদয় চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। (খ) মৃতব্যক্তির শরীবে অ্যালকোহল ও ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেছে যা মৃত্যুর কারণ নয়। (গ) রিপোর্টে

বলা হয়েছে, মৃত্যু সন্দেহজনক। এ এক ভেগটার্ম। কাজেই পুলিশ নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর কারণ বলতে পারেনি। (ঘ) এই সমস্যার সমাধানের জন্য পুলিশপক্ষ থেকে মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে দ্বিতীয়বার পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করা হয়নি।

আট ঃ উপযুক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সহজেই বুঝতে পারা যায় দ্বিতীয় অভিযুক্ত প্রদোষ সান্যাল এই মামলার এক গৌণ চরিত্র।

ইওর অনার, আমি বিশ্বাস করি মহামান্য আদালতকে প্রকৃত ঘটনা বোঝাতে পেরেছি। কাজেই অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে আমি পুনরায় নিজের অনুরোধ উপস্থিত করছি—ইওর অনার, রীমা সান্যাল ও প্রদোষ সান্যালের 'বেল' মঞ্জুর করা হোক।

নিজের দীর্ঘ বয়ান শেষ করে বসন্ত ঘোষাল আসন গ্রহণ করলেন। ওঁকে তেমন ক্লান্ত বা হতাশ দেখাচ্ছে না। বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিচ্ছে মক্কেলদের স্বার্থে যে যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন তার ফল সঙ্গতিপূর্ণই হবে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে অনিমেষ গুপ্ত এই সময় উঠে দাঁড়ালেন। বিপক্ষের যুক্তির জাল ছিঁড়ে ফেলার মত কোন তথ্য হাতে নেই। তবে বিরোধিতা করে টেনে যাওয়াই হল রেওয়াজ।

অনিমেষ গুপ্ত ঃ ইওর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে যুক্তিজাল রচনা করে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি ভালই জানেন, এই পরিস্থিতিতে এই আদালতে সাক্ষী প্রস্তুত করার কোন সুযোগ নেই—কাজেই তিনি জনা দশেক গণ্যমান্য সাক্ষীর উল্লেখ রেখে নিজের মক্কেলদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। ফিঙ্গার প্রিন্টের প্রশ্নে আমি এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ যা কিছু পুলিশপক্ষ সেসন্স কোর্টে যথা সময় উপস্থিত করবেন। মেডিক্যাল বোর্ড কথাটা গাল ভরা হলেও ইচ্ছে করলেই বোর্ড বসানো মুখের কথা নয়। এর জন্য সময় এবং উচ্চ অধিকারীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। মৃত্যু সন্দেহজনক, এটা হল বর্তমান ক্ষেত্রে শেষ কথা। এই আদালতের বিচার্য বিষয় হল ওটাই। যুক্তি এবং যুক্তির নামে ফুলঝুরি ছড়ানো এক কথা নয়। মহামান্য আদালত এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলাই বাহুল্য। ইওর অনার, বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদ্বয়ের 'বেল' পিটিশন খারিজ করা হবে এই আমার একান্ত অনুরোধ।

অনিমেষ গুপ্ত চেয়ার অধিকার করার পর, বিচারপতি এক ঝলক অভিযুক্ত দুজনকে দেখে নিয়ে কাগজপত্রে মন দিলেন। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের উপরই তাঁর মনযোগ বেশি দেখা গেল। তারপর চোখ থেকে ভারি ফ্রেমের চশমা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের উপর। সহজেই বোঝা গেল এবার তিনি নিজের মতামত দেবেন।

দুপক্ষই উৎসুক।

বিচারপতি ঃ উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, সরকারীপক্ষ বিরোধিতা করে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা তেমন জোরাল নয়। কাজেই রীমা সান্যাল ও প্রদোষ সান্যালের 'বেল' মঞ্জুর করা হল। দশ হাজার টাকা বা উপযুক্ত জামিন এবং জামিনদারের ব্যবস্থা 'বেল' প্রাপকদের

অবশ্যই করতে হবে।

রীমার মনে হল, বেশ কয়েক মনের বোঝা ওর শরীরের উপর থেকে নেমে গেল যেন। প্রদোষের মুখে হাসি। দুজনে ডক থেকে নেমে এল। বসন্ত ঘোষালের সহকারী শোভেন দত্ত ওদের নিয়ে গেলেন করণীয় কাজগুলো শেষ করতে। দুজন 'বেলার' এর ব্যবস্থা এঁরাই করে দেবেন।

সকাল তখন সাড়ে সাতটা।

বনমালী সরকার লেনের সামনে বাসব এসে পৌঁছাল। গতকাল সান্যাল দম্পতির 'বেল' হয়ে গেছে তা ওর জানা। প্রদোষ ফোন করে ঐ সংবাদ জানিয়েছিল। একটু আশঙ্কা ছিল তা দূর হয়ে যাওয়ায় বাসব খোলা মন নিয়ে সকালেই কাজে নেমে পড়েছে।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই বাড়িটা পাওয়া গেল। দরজার উপর লেখা রয়েছে ২৭/এ। বাসব কড়া নাড়ল। কোন সাড়া নেই। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল একজন। বছর চল্লিশ বয়সের আঁটসাট গড়নের এক ব্যক্তি। মুখে উৎসুকের ভাব।

বাসব বলল, রজত মৈত্র আছেন?

—আমারই নাম। আপনাকে চিনলাম না?

বাসব নিজের পরিচয় দিল।

রজত ব্যস্ততার সঙ্গে দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। ওকে নিয়ে গেল ভেতরে। বেতের চেয়ার দিয়ে সাজানো একটা ঘর। বেশ ছিমছামই বলা চলে। প্রাচুর্যের ঝলক না থাকলেও, দীনতাও নেই।

দুজনে ওখানে বসল।

রজত বলল, আপনি আমার কাছে আসবেন ভাবতে পারিনি। অবশ্য জানি প্রদোষ আপনাকে তদন্তের ব্যাপারে নিযুক্ত করেছে। এরকম ঘোরাল ব্যাপারে ওরা যে জড়িয়ে পড়বে কল্পনা করা যায়নি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার বোন হিসাবে ভুল করে ফেলেছিলেন। নইলে ঘটনার গতি অন্যখাতে চলে যেত। যাক, ওকথা। আপনার সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে আলাপ করতে এলাম। বুঝতেই পাচ্ছেন, তদন্তটা খুনের। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

—আমি অবশ্য ঐ বিষয়ে কিছুই জানি না। এমন কি আন্দাজও করতে পারিনি, উদয়কে কে মেরেছে।

বাসব বলল, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমি আপনার কাছে এলাম আনুষঙ্গিক কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য। যেমন আমি জানতে চাই বর্তমানে আপনি কি করেন? প্রথমেই বলে রাখা ভাল, একটা খুনের তদন্তে অনেক সাধারণ কথা জেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে।

রজত বলল, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

—প্রথমে সকলকেই সন্দেহ করতে হয়। আপনি কি করেন বললেন না তো?

—আমি জুট কর্পোরেশনে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন?

—সংসারিক দায় সামলাতে সামলাতেই বয়স বেড়ে গেল। বিয়ে আর করে উঠতে পারলাম না।

—উদয় চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কি রকম সম্পর্ক ছিল?

—ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু নয়। এক পাড়ায় বাস—ভাল রকম চেনাজানা ছিল। মুখোমুখি হলে কথাবার্তা হত।

—অন্তরঙ্গতা ছিল না বলছেন, তবু, চৌধুরী আপনাকে দুহাজার টাকা ধার দিয়েছিল?

অবাক দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল রজত।

—দু'হাজার টাকার কথা আপনাকে কে বলল?

—কে বলল সেটা বড় কথা নয়। কথাটা হচ্ছে, আপনি কিভাবে চৌধুরীর কাছ থেকে ধার পেয়েছিলেন?

—বুঝতে পারছি, রীমা আপনাকে বলেছে। এই ধরনের পারিবারিক কথা তার উচিত হয়নি আপনাকে বলা।

—আপনি কি এখনও বুঝতে পাচ্ছেন না, টাকা ধার না নিলে, আপনার বোন আজকের এই বিপদে জড়িয়ে পড়তেন না। উদয় চৌধুরী তাঁকে ভয় পাইয়ে হাত করতে পারতো না। পুরানো অজুহাত সামনে রেখে বারংবার ব্যান্ডেলে পৌঁছাবার সম্বাবনা ছিল না।

একটু চুপ করে থেকে রজত বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। তখন কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা এইভাবে গড়াবে।

—আসলে হয়েছিলটা কি?

—আমি কম্পানির অ্যাকাউন্টস সেকসানে কাজ করি। হিসাবের গোলমাল বা আর কোন কারণে দু'হাজার টাকা শর্ট হয়ে গেল। টাকাটা ফিরিয়ে দিতে না পারলে চাকরি যাবে। আমি পাগলের মত টাকার ধান্দায় ঘুরতে লাগলাম। এই সময় ধর্মতলার মোড়ে উদয়ের সঙ্গে দেখা। সে বলল, খবর পেয়েছি, ন্যাশনাল ব্রুয়ারিজের অনন্ত সোমের কাছে স্কচ হুইস্কির একটা বড় লট রয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। অনন্ত সোম তো তোমার বিশেষ বন্ধু। অনেক চরা দামে বিক্রী করছে। কুড়ি বোতল পেতে চাই।

—এরপর রেট কম করিয়ে দেবার কথা বলল। আপনি রাজি হলেন।

—হ্যাঁ। তবে একটা শর্ত রাখলাম। চেষ্টা করে দেখছি। যদি পারি, আমাকে দু'হাজার টাকা ধার দিতে হবে।

—উদয় চৌধুরী রাজি হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। আমি অনন্তর কাছে গেলাম। সে তখন বারশ টাকা করে বোতল বিক্রী করছে। অনেক বলা কওয়ার পর হাজার টাকায় রাজি হল। উদয় কুড়িটা

বোতল কিনল। আমাকে দিল দুহাজার।

—তারপর আপনি টাকাটা শোধ করতে পাচ্ছিলেন না?

—না। যেখানে সেখানে আমাকে অপমান করতো। লোকটা খুবই খারাপ ছিল। নিজের বাড়ির মহিলাদেরও রেহাই দিত না। বড়ভাইয়ের স্ত্রীকেও উদয় রেহাই দেয়নি।

—তালি নিশ্চয়ই এক হাতে বাজেনি?

রজত ভ্রূ কুঁচকে বলল, বলতে পারবো না। তবে বড়ভাই উদিত এখনও পর্যন্ত তো স্ত্রীর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেই চলে।

—বিচিত্র ব্যাপার। শুনলাম কোন এক বোনকে নিয়ে—

—জানেন দেখছি। মাসতুতো বোনকে নিয়ে একবার পালিয়েছিল।

—আচ্ছা, এই সমস্ত কেচ্ছা বাইরের লোক জানতে পারে কি ভাবে?

—ঝি-চাকরের মুখ থেকেই এই সমস্ত কথা ছড়ায়। এবার একটু চা-এর ব্যবস্থা করি। পাঁচ মিনিট সময় দিন।

বাসব হাত নেড়ে বলল, আমি চা-এর বিশেষ ভক্ত নই। ছেড়ে দিন। এবার প্রশ্নের উত্তর একটু ভেবে চিন্তে দেবার চেষ্টা করুন।

—বলুন?

—যে লোক মাত্রা ছাড়ানো সমস্ত ব্যাপার করে যাচ্ছে, তাকে বাড়ির লোক দিনের পর দিন বরদাস্ত করে গেছে কিভাবে? গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি কেন?

—আমি যতদূর জানি, এর জন্য দায়ী উদয়ের বাপ আর কাকা। ওর প্রতি দুজনের অসম্ভব ভালবাসা ছিল। এত কাণ্ডর পরও তাই বার বার পার পেয়ে গেছে। ইদানিংকার একটা ব্যাপার বোধহয় আপনি জানেন না?

—কোন্ ব্যাপার?

—উদয়ের দিদির ননদের সঙ্গে ছোটভাই উজ্জ্বলের বেশ কিছু দিন থেকে প্রেমের খেলা চলছিল। বিয়ে অবশ্য ঠিক হয়ে গেছে। সামনের বৈশাখে শুভ কাজটা হবার কথা আছে। ঐ মেয়েটাকে অসম্ভব বিরক্ত করছিল উদয়। শেষে ভগ্নীপতির কাছ থেকে চড় খেতে হয়েছিল। এমনকি বিয়েটাও ভেঙে যাচ্ছিল।

—এরকম মহিলা বিলাস বড় একটা দেখা যায় না। আপনি কি জানেন, ওদের বাড়ির কেউ কেউ পুলিশের কাছে আপনার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

রজত অবাক।

—আমি উদয়কে খুন করেছি এই কথাই বলেছে।

—ডায়রেক্ট বলেনি। সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

—পুলিশ তো তাহলে আমার কাছে এল বলে। আপনি বিশ্বাস করুন, এ সমস্ত ব্যাপারে আমি নেই।

—ভয় পাবেন না। আমি আছি তো। ও কথা এখন থাক। উদয় চৌধুরী

খুন হয়েছে ১৯শে জানুয়ারী। ঐ দিনের আপনার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানতে চাই।

—আর দশটা দিনের মত সেদিনটাও ছিল।

—বিশেষ কোন ব্যাপার ঘটেনি?

একটু ভেবে নিয়ে রজত বলল, তেমন কিছু তো মনে পড়ছে না।

—উদয় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—একবার হয়েছিল।

—তখন কটা?

—বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে হবে।

—দেখা হয়েছিল পাড়াতে?

—না। রিপন স্ট্রীটের 'রেনবো' বার-এর সামনে।

বাসব দ্বিতীয়বার পাইপ ধরাল।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ঐ-সময় আপনি রিপন স্ট্রীটে কি করছিলেন? আপনার তো অফিসে থাকার কথা।

—অফিসেই তো গিয়েছিলাম। আমাদের এক সহকর্মীর মৃত্যুতে অফিস বন্ধ হয়ে গেল। রিপন স্ট্রীটে আমার এক মামাতো দাদা থকেন—ব্লাড ইউরিয়ায ভুগছেন। ভাবলাম সময় যখন পাওয়া গেল, ওঁকে দেখে আসি।

—তারপর কি হল?

—আমি মোড়ের মাথায় ট্রাম থেকে নেমে, ফুটপাথ ধরে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি 'রেনবো' বার থেকে উদয় বেরিয়ে আসছে। বেসামাল অবস্থায় না থাকলেও, বুঝতে পারা যাচ্ছিল ভালই মাল টেনেছে।

—আপনার সঙ্গে কথা হল?

—না।

—মুখোমুখি হলেন, অথচ কথা হল না?

—মুখোমুখি হলাম কোথায়? বার থেকে বেরিয়েই গাড়িতে চেপে বসল। তারপর গাড়ি হাওয়া।

—গাড়িতে আর কেউ ছিল?

—আরেকজন ছিল চালকের আসনে। আমি পিছন দিকে থাকায় চিনতে পারিনি।

—গাড়িটা নিশ্চয় চৌধুরীর? কোন্ মেক-এর?

রজত ভ্রু কুঁচকে বলল, ফিয়েট। গাড়িটা ওদের নয়। চৌধুরীদের তিনটে গাড়ি আছে. একটা স্ট্যান্ডার্ড আর দুটো মারুতি।

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল। ঐ তিনখানা গাড়ি কে কে ব্যবহার করে?

—স্ট্যান্ডার্ড কর্তা ব্যবহার করেন। মারুতি দুটো উদয়ের কাকা আর দাদা ব্যবহার করেন বলেই জানি।

—যে ফিয়েটের কথা বলছেন, তার রং কি? নম্বরটা দেখেছিলেন।

—'চকলেট রং'-এর ফিয়েট। নম্বর অবশ্য লক্ষ্য করিনি। তবে ঐ গাড়িটাকে

আগেও কয়েকবার ওদের বাড়ির সামনে দেখেছি।

—কোন আত্মীয়-স্বজনের হতে পারে। আরেকটা প্রশ্ন, উদয় চৌধুরীর ভগ্নীপতি কলকাতাতেই থাকেন তো? কি করেন?

—লোকেন বাগচীর কথা বলছেন? ভবানীপুরে থাকেন। কি করেন জানি না। তবে কোন বড় চাকরিতে আছেন। সাহেবী মেজাজের লোক।

বাসব উঠে দাঁড়াল। ধন্যবাদ। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। এখন আমি চলি। পরে হয়তো আবার আপনার কাছে আসতে হতে পারে।

বাসব রজত মৈত্রর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লালবাজারের পথ ধরল। এই সময় সামন্ত অফিসে এসেছেন কিনা সন্দেহ। তবু একবার চান্স নেওয়া দরকার। কিছুদূর এগুবার পর রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। পৌনে দশটা। কিছু সময় কাটিয়ে লালবাজারে গেলেই বোধহয় ভাল হয়। এক গেলাস কমপ্লান খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। সুতরাং এই ফাঁকে জলযোগ সেরে ফেলা যেতে পারে।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে গাড়ির মুখ ঘোরাল বাসব। 'হটপ্লেট'-এর সামনে এসে গাড়ি থামাল। কিমা-হলুদা আর নুরানী সহযোগে দক্ষিণ হাতের কাজ সেরে ওখান থেকে যখন বেরুল—এগারটা বেজে গেছে। লালবাজারে পৌঁছাবার পর সামন্তকে পাওয়া গেল। উনি মিনিট দশেক হল অফিসে এসেছেন।

বাসবকে দেখেই মৃদু হাসলেন সামন্ত।

—কি মশাই, কতদূর এগুলেন?

—গতি খুব মন্থর।

—অর্থাৎ—

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, অগোছাল ভাবে তো এগুতে পারি না, তাই একটু সময় লেগে যাচ্ছে। শুনেছেন বোধহয়, আলিপুর কোর্ট থেকে আমার মক্কেলরা 'বেল' পেয়ে গেছে।

—শুনেছি। এ ব্যাপারে বসন্ত ঘোষালের তুলনা নেই। আপনার মক্কেলরা ওঁকে অ্যাপয়েন্ট করে ভারি বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

—আমিও কিছুটা চিন্তিত ছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যেতে পারব। এখন যেজন্য এলাম, তাই এবার বলি।

—স্বার্থের একটা মোড়ক পকেটে না থাকলে আপনার দেখা মেলা ভার। বলুন? দেখি, কোন সহযোগিতা দিতে পারি কিনা।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

—প্রদোষ সান্যালের সম্বন্ধী রজত মৈত্র-র সঙ্গে কথা বলে এখন আসছি। তার কিছু কথা আমাদের কাজে লাগতে পারে। মৃত উদয় চৌধুরীর পেটে এত বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল কেন পাওয়া গিয়েছিল আমি বুঝতে পেরেছি।

—কি রকম?

—১৯শে জানুয়ারী পড়তি দুপুরে রেনবো বার-এ প্রচুর হুইস্কি টেনেছিল উদয়

চৌধুরী। সে ওখানে গিয়েছিল চকলেট রং-এর একটা ফিয়েট চেপে। এখন জানা দবকার ঐ ফিয়েটখানা কার।

—চৌধুরী নিজেই গাড়ি চালিয়েছিল?

—না। চালক অন্য কেউ। তাকে চিনতে পারা যায় নি। উদয় চৌধুরীদের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর চকলেট রং-এর ফিয়েট আছে কিনা জানা দরকার।

সামন্ত ভ্রু কুঁচকে কি ভাবলেন।

তারপর পকেট থেকে ছোট একটা ডায়রি বার করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। নির্দিষ্ট পাতায় পৌঁছাবার পর ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। ওধারে রিং হতে লাগল।

সামন্ত রিসিভার কানে চেপে বেখে বললেন, উদিত চৌধুরীকে ফোন কবছি। দেখি, উনি গাড়িটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কিনা। —হ্যালো ..উদিতবাবু আছেন—

ও প্রান্ত থেকে—

—উদিত চৌধুরী কথা বলছি...আপনি—

—লালবাজার থেকে কথা বলছি. .পুরন্দর সামন্ত...একটা ইনফরমেশনেব প্রয়োজন ছিল।...

—বলুন ..

—আপনাদের চকলেট রং-এব ফিয়েট কার আছে...

—ফিয়েট কার আমাদের আছে...চকলেট রং-এর নয়...

—হ্যালো. আপনাদের কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের ঐ রং-এর কাব আছে...

—কেন জানতে চাইছেন বুঝতে পাচ্ছি না...

—পরে আপনাকে বলবো সব কথা...এখন আপনি আমাব আগ্রহ মেটাবাব চেষ্টা করুন ..

—আমার ভগ্নীপতি লোকেন বাগচীর একটা ফিয়েট আছে...গাড়িটার বং গাঢ় বাদামী...

—ধন্যবাদ...ওঁর ঠিকানাটা বলুন কাইন্ডলি...

—বাড়ির না অফিসের...

—দু'জায়গার পেলে ভালই হয়...

উদিত চৌধুরী দু'জায়গার ঠিকানা বলল। সামন্ত লিখে নিলেন। তারপর আরেক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। বাসবকে বললেন সব কথা।

বাসব বলল, সময় নষ্ট না করে এখনই আমি বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ভদ্রলোক এতক্ষণে নিশ্চয় অফিসে এসে পড়েছেন! আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের কোন একজনকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিন। নইলে বাগচী হয়তো আমাকে পাত্তাই দেবেন না।

মৃদু হেসে সামন্ত বললেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা সব সময

থেকেই যায়।

অন্য লোকের কি দরকার? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

মিনিট দশেক পরে দুজনে লালবাজার থেকে বেরিয়ে চার্চ লেন-এ এসে উপস্থিত হল। 'রেমিংটন'-এর পাশের বাড়িটাই ওদের গন্তব্যস্থল। পুরো দুটো তলা নিয়ে 'গডফ্রে মানার্স'-এর অফিস। বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানেই লোকেন বাগচী সিনিয়ার এক্সিকিউটিভ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল বাগচী সাহেব এসেছেন। আছেন নিজের চেম্বারে। সামন্ত স্লিপ পাঠালেন। বেয়ারা ঘুরে এসে ওদের নিয়ে গেল চেম্বারে। মাঝারি স্বাস্থ্যের লোকেন বাগচীর মুখ চোখ দেখলে মনে হয়, কড়া মেজাজের লোক। পরনে স্টিল কালারের সুট। গলায় রয়েল আর্টিলারি টাই। লোকে বলে, অভিজাত্যের বেলপেল।

উনি ভারি গলায় বললেন, বসুন।

দুজনে বসার পর আবার বললেন, কোন বে-আইনী কাজ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। কম্পানি ঘটিত যদি কিছু হয়...

উনি কথা শেষ করলেন না।

সামন্ত বললেন, আপনার শ্বশুরবাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই সম্পর্কেই আমরা এসেছি। খুনের মামলা। চারিদিক বাজিয়ে দেখতে হয়।

কথা শেষ করে উনি বাসবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং এ কথা বলতে ভুললেন না, এই তদন্তে রীমা সান্যাল দোষ মুক্ত হবার জন্য বাসবকে নিযুক্ত করেছেন।

বাগচী গম্ভীর গলায় বললেন, শ্বশুরবাড়ির ব্যাপারে আমি ফেড আপ। কি দেখে যে আমার ওখানে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল গড নোজ। উদয় মারা গেছে— এ একটা সুসংবাদ। আমার মতে হত্যাকারীকে সোনার মেডেল দেওয়া উচিত।

বাসব বলল, উদয়ের মৃত্যু আপনি কেন চাইছিলেন?

—কেন চাইব না বলুন? লোকটা জঘন্য প্রকৃতির ছিল। ওরকম একজনের বেঁচে থাকার অর্থই হল দশজনের ক্ষতি হওয়া।

—আপনি নিজের শ্বশুরবাড়িতে উদয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কখনও কথা-বার্তা বলেছিলেন?

বাগচী ভ্রু কুঁচকে বললেন, অন্তত বিশবার বলেছি। আমি কি সাধে ওদের উপর চটে আছি। অন্য কোন পরিবার হলে, কবে ঐ চরিত্রের ছেলেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিত। কেচ্ছার পর কেচ্ছা করে যাচ্ছে, তবু ছেলেকে বাবা-বাছা করে ওঁরা মাথায় তুলে রেখে ছিলেন।

সামন্ত বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার ঐ ধরনেব ছেলে থাকলে আমি তাকে নিশ্চিত ভাবে পুলিশের হাতে তুলে দিতাম। এই কাজটা ওঁরা কেন করছিলেন না আপনি অনুমান করতে পারেন?

—অপত্য স্নেহ। এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার কেউ বোধহয় কখনো দেখেনি। বাসব

বলল আপনি স্বীকার করছেন উদয় চৌধুরী ভারি খারাপ চরিত্রের লোক ছিল। এমন কি ঐ পরিবারের প্রতিও আপনি খুশি নন। অথচ আমরা খবর পেয়েছি উদয় চৌধুরীর ছোটভাই-এর সঙ্গে আপনার ছোটবোনেব বিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে।

এই ব্যাপারটা কি ভাবে সম্ভব হল?

লোকেন বাগচীর মুখে বিরক্তির ছায়া পড়ল।

বললেন কিছুটা দ্রুত গলায়, খুনের তদন্তে এসে আপনারা তো পারিবারিক ব্যাপারে খোঁচা মারতে আরম্ভ করলেন?

—আপনি উত্তর দিতে না চাইলে জোর করব না। আপনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি। একটা জটিল খুনের তদন্ত করতে গেলে অনেক বিষয়ে জেনে নেবার প্রয়োজনীয়তা থাকে। আমাদের ধারণা ছিল, আপনি অন্তত এই সার কথাটা বুঝবেন।

সামন্ত বললেন, আপনার কাছ থেকে উত্তরগুলো পেলে আমরা আর এগুতাম না। এখন আপনার বোনকে আমাদের জেরা করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়িতে আমরা সদলবলে পৌঁছবো।

বাগচীর কপালে ভাঁজ পড়ল। উনি কিছুটা বিচলিত ভঙ্গীতে বললেন, এই ধরনের জুলুমের কোন মানে হয় না বাড়ির মেয়েদেব নিয়ে টানাটানি করবেন কেন?

—হত্যাকারী অ্যারেস্ট হোক, এটা আপনি চান কিনা?

—চাই। লোকটা কে আমার জানার আগ্রহ আছে। বললাম না, কাজটা সে করেছে পুরস্কার পাবার মত।

বাসব পাইপ ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মেয়েদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে আমাদেরও ভাল লাগে না। আপনার কাছ থেকেই উত্তরগুলো জেনে নেওয়া যাক, কি বলেন? আপনার বোনের গার্জেন তো আপনি?

মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন বাগচী?

ভেবে দেখলেন বোধহয় ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। কথাবার্তা যা বলার এখানে বলে নেওয়া যাক। আবার বাড়িতে কেন?

—হ্যাঁ। আমার মা-বাবা অনেকদিন হল মারা গেছেন।

—তাহলে ঐ বিয়েতে মত দিলেন কি ভাবে?

—আর বলবেন না মশাই। দিতে বাধ্য হয়েছি। প্রেমের ব্যাপার।

—আপনার বোনকে উদয় চৌধুরী অবিরাম বিরক্ত করছিল। কুৎসা রটে গিয়েছিল। এর পরও ওদের বাড়িতে বোনকে পাঠাতে আপনি কিভাবে সম্মত ছিলেন?

—এ নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে এমন কি উজ্জ্বল আর উদয়—দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হয়ে গিয়েছিল। আমার স্ত্রীর বক্তব্য ছিল, উজ্জ্বল ভাল ছেলে। সে বাড়ির আর সকলের মত নয়। বিয়েতে আপত্তি করলে ঠকতে হবে। আমি নাচার অবস্থায় আপত্তি তুলে নিয়েছিলাম।

বাসব প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

—আপনার চকলেট রং-এর একটা ফিয়েট আছে।

প্রশ্নের দিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে বাগচী হাঁপ ছাড়লেন।

—আছে। এইট্টি এইট মডেলের। কেন বলুন তো?

—১৫ই জানুয়ারি আপনি নিজে গাড়িতে চেপেই অফিসে এসেছিলেন?

—১৫ই জানুয়ারি আমি অফিসে আসিনি। তার পরের দিনও। আমার শরীর ভাল ছিল না।

—আপনার ড্রাইভার আছে?

—না। আমার এবং স্ত্রীর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।

—১৫ই জানুয়ারি আপনি কি নিজের গাড়ি কাউকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন?

—না। আমার স্ত্রী গাড়ি নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন।

—কখন গিয়েছিলেন?

—এগারটা আন্দাজ সময়।

—ফিরেছেন কখন?

—সন্ধ্যা সাতটার পর। কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ধরনের প্রশ্ন কেন করছেন বলবেন কাইন্ডলি?

—আমরাও এখনও জানি না আপনার উত্তর আমাদের কাজে লাগবে কিনা। তবু প্রশ্ন করতে হচ্ছে। সময় মত সবই জানতে পারবেন। আপনার সেদিন শরীর খারাপ ছিল, তবু আপনার স্ত্রী এতক্ষণ বাড়িতে অনুপস্থিত রইলেন?

—সাইটিকার ব্যথা। মাঝে মাঝে চাগায়। এক আধ দিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যায়। বাড়ির সকলের গা সওয়া হয়ে গেছে।

—১৫ই জানুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটের সময় আপনার ফিয়েট রিপন স্ট্রীটের 'রেনবো' বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

—বার-এর সামনে?

—আকাশ থেকে পড়লেন লোকেন বাগচী।

—আমার স্ত্রীতো ড্রিঙ্ক করেন না। তাছাড়া—

—কথাটা সত্যি। সাক্ষী আছে।

—আপনি বাজে কথা বলছেন না, তা আমি বুঝেছি। গাড়িটা ওখানে কেন ছিল আমি জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি।

—বলুন।

—আমার স্ত্রী সেদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। মনে হয়, গাড়িটা নিয়ে ঐ বাড়ির কেউ বেরিয়েছিল। আগেও এরকম কয়েকবার হয়েছিল।

কথা শেষ করেই বাগচী বেল বাজালেন। বেয়ারা এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনকাপ কফির আদেশ দিয়ে আবার বললেন, আপনাদের বোধহয় আর কোন প্রশ্ন নেই। কফি দিয়ে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

অর্থাৎ পেয়ালা শেষ করেই তোমরা সরে পড়।

বাসব বলল, আপনার বেশ কিছুটা সময় আমরা নষ্ট করেছি। অবশ্য অনন্যোপায় অবস্থায়। আরো কয়েক মিনিট আমাদের সহ্য করুন। রীমা সান্যালকে আপনি চেনেন?

—ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না। নাম শুনেছি।

—কি সূত্রে নাম শুনেছিলেন?

—উদয় ঐ মেয়েটির পিছনে লেগেছিল। এ নিয়ে তখন জল ঘোলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রায়ই আমার মিসেস আমাকে কিছু না কিছু বলতেন।

—আপনার কি মনে হয় রীমা সান্যাল উদয় চৌধুরীকে খুন করেছে?

—না। ঐ রকম দুর্দান্ত লোককে কোন মহিলার পক্ষে খুন করা সম্ভব নয়।

কফি এসে পড়ল।

তিনজনে পেয়ালা তুলে নিলেন।

বাসব বলল, কাকে সন্দেহ হয় আপনার?

—রীমা সান্যালের স্বামী একাজটা করে থাকতে পারে। ভদ্রলোককে দোষ দেওয়া যায় না। আমার স্ত্রীর পিছনে এই ভাবে কেউ লেগে থাকলে আমিও ক্ষেপে যেতাম।

—অনেক ধন্যবাদ। বহুক্ষণ বিরক্ত করেছি। এবার আমরা উঠবো। তবে—

—আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন—বাগচী বললেন, আমারও কর্তব্য ছিল আপনাদের সহযোগিতা করা। তবে একটা কথা, আমার বাড়ির লোকেদের এ ব্যাপারে জড়াবেন না।

—সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। তবে একটা সহযোগিতা আপনার কাছ থেকে আশা করবো।

—বলুন।

—১৫ই জানুয়ারি আপনার স্ত্রী যখন বাপের বাড়ি গেলেন তখন গাড়ির চাবি তাঁর কাছেই থাকার কথা। আপনি খোঁজ নেবেন, সেদিন গাড়ির চাবি তাঁর কাছ থেকে কে নিয়েছিল এবং পরে কে ফেরত দিয়েছিল।

—অফিস থেকে ফিরেই খোঁজ নেব।

এতক্ষণ পরে সামন্ত কথা বললেন।

—আমি রাত আটটা পর্যন্ত অফিসেই থাকবো। ফোন করে জানিয়ে দেবেন।

ফোন নম্বর দিয়ে বাসব ও সামন্ত বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে। তখন লাঞ্চ আওয়ার। অফিস কর্মীদের ঢল নেমেছে রাস্তায়। সকলেই কিছু না কিছু খেয়ে নিতে চায়।

গাড়িতে বসার পর সামন্ত বললেন, বাগচীকে কেমন বুঝলেন?

—ভদ্রলোক ভারি অসুখী।

—অর্থাৎ—

—শ্বশুরবাড়ির উপর চটা, বোনকে ও বাড়িতে বৌ করে পাঠাতে চান না। অথচ প্রবল ভাবে আপত্তি করতে পারছেন না। কারণ একটাই, স্ত্রীকে ভয় পান

অথবা সমীহ করে চলেন। এই ধরনের পুরুষ সাংসারিক জীবনে সুখী হতে পারে না।

—ওঁর সঙ্গে কথা বলে কিছু লাভ আমাদের হয়েছে। এক মহিলাকে কেন্দ্র করে উদয় আর উজ্জ্বলের মধ্যে বচসা হয়েছিল এটা জানা গেল। হয়তো এই ব্যাপারটা এই মামলার একটা ভাইটাল পয়েন্ট।

বাসব স্টিয়ারিং-এ একটা মোচড় দিয়ে বলল, চৌধুরী বাড়ির লোকেবা পুলিশকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তার থেকে জানা গেছে, বেলা এগারটার পর উদয়কে কেউ দেখেননি। কথাটা সত্যি নয়। একজন অন্তত বেলা সাড়ে তিনটের সময় লোকেন বাগচীর ফিয়েটে উদয়ের সঙ্গে ছিলেন। মিসেস বাগচী গাড়ির চাবি কাকে দিয়েছিলেন জানা গেলে সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যাবে।

—এতে দুটো প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সেই ব্যক্তি কেন মিথ্যা কথা বলেছিলেন? দ্বিতীয়, বাড়ির লোক হয়েও তিনি কেন বার-এর উদয়কে মদ খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন? এই দুটো ভাইটাল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে পরিস্থিতি অনেক সরল হয়ে পড়বে।

—দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

লালবাজার এসে পড়ল।

বাসব সামন্তকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলল হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের দিকে।

বিকেলের আয়ু তখনও শেষ হয়নি, শৈবাল এসে উপস্থিত হল।

মেডিক্যাল কনফারেন্স উপলক্ষ্যে এখন ওর কলকাতার বাইরে থাকার কথা, কিন্তু হঠাৎ শারীরিক অপটুতার দরুণ ওকে ফিরে আসতে হয়েছে। গতকাল অনেকের সামনে বাসবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—এই তদন্ত সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে তখন জানতে পারেনি।

বাসব একে একে সব কথা ওকে বলল।

সমস্ত শোনার পর শৈবাল সেই সাবেকি প্রশ্নটাই করল, কি রকম বুঝছো?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, সকলের সঙ্গে কথা এখনও বলা হয়নি। কাজেই বোঝাবুঝির স্টেজে পৌঁছতে পারিনি এখনও। কে খুন করেছে সেটা জানার আগে আমায় জানতে হবে খুন কিভাবে হয়েছে।

—কোন পয়জন ইউজ করা হয়েছে এতে তো কোন সন্দেহ নেই।

—না, নেই। কি পয়জন? এমন কি আছে যার সন্ধান মৃত্যুর পর পাকস্থলি বা শরীরের আর কোথাও পাওয়া যাবে না? সমস্যা এখানেই। বৃটিশ ফার্মোকপিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম। লেটেস্ট এডিশনই রয়েছে আমার কাছে। ওতে এমন কোন বিষের সন্ধান পেলাম না যা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে মিলিয়ে যেতে পারে বেমালুম।

শৈবাল বলল, সঙ্গে সঙ্গে কথাটায় আমার আপত্তি আছে।

—কেন?

—উদয় চৌধুরীর মৃত্যুর সময় সম্পর্কে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি বলা হয়েছে?

—রাত সাড়ে আটটা থেকে দশটার মধ্যে মারা গেছে।

—বডি পোস্টমর্টেম হয়েছে কটায়?

—পরের দিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় পুলিশ বডি নিয়ে গেছে। কাটা ছেঁড়ার কাজটা বেলা দুটোর আগে হয়েছে বলে মনে হয় না।

—তাহলে কি দাঁড়াল? মৃত্যু আর পোস্টমর্টেমের মধ্যেকার সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ষোল ঘন্টার। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বিষ উবে যায়নি। উবে যেতে সময় পেয়েছে ষোল ঘন্টা।

বাসব সতর্ক দৃষ্টিতে শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলতে চাইছো, এমন কিছু বিষ আছে যা বেশ কিছু সময় পেলে শরীর থেকে উবে যেতে পারবে?

—আমি ঐ কথাই বলতে চাইছি। আমার মনে হয় তুমি খুব খুঁটিয়ে বৃটিশ ফার্মোকপিয়ার পাতা ওল্টাওনি।

—হতে পারে। তোমার কিছু জানা আছে?

—এই মুহূর্তে আমার পটাশিয়াম অ্যাকোডাইডের কথা মনে পড়ছে। ঘন্টা আট/দশ সময় পেলে ঐ বস্তু নিজের কাজ সেরে শরীর থেকে উবে যাবে।

বাসব সেন্টার পিস চাপড়ে বলল, ব্রেভো ডাক্তার। ভারি উপকার করলে। পটাশিয়াম অ্যাকোডাইট হলেও হতে পারে। এ সম্পর্কে তুমি আর কিছু বলতে পারো? তোমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স কি বলছে?

—ইমিজিয়েট অ্যাকশন এতে হয় না। শ্লো পয়জন করে কাউকে সহজেই মারা যায়। তবে আর্সেনিক ধরনের বিষ নয়। দীর্ঘদিন ধরে খাওয়াতে হবে—তারপর সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগুবে, এমন কোন ব্যাপার এতে নেই। কয়েক ঘন্টাই যথেষ্ট।

—উদয় চৌধুরীকে নিয়ে দুপুরবেলা কেউ রিপন স্ট্রীটের বার-এ গিয়েছিল। পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সেই সময় সে নিজের অজান্তেই খেয়েছে।

—কাজেই রাত সাড়ে আটটা থেকে দশটার মধ্যে তার মারা যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

—যাক, এধারটা মোটামুটি বোঝা গেল। আচ্ছা, ডাক্তার—

—বল।

—পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড নিশ্চয় সহজ লভ্য নয়?

—নিশ্চয় নয়।

—কোন ডাক্তারের প্রেসকিপসনের সাহায্যে কেনা যায়?

—অধিকাংশ ডাক্তারের পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সম্পর্কে কোন জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। এটা একটা রেয়ার ভেষজ। তাছাড়া যারা জানে, কোন রোগ সারাবার জন্য তারা প্রেসকিপশন করবে? ঐ ভেষজের প্রথাগত কোন মূল্য নেই। রিসার্চের কাজে লাগে।

—কাজেই কোন মেডিক্যাল স্টোরে পাওয়া যায় না।

—না। রিসার্চ সেন্টারে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাখা হয়। সরকারী তত্ত্বাবধানে বিদেশ থেকে আনাতে হয়।

সাধারণ মানুষের পক্ষে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহ করা অসম্ভব।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, তুমি সাধারণ মানুষের কথা বলছো যারা অসাধারণ—তাদের পক্ষে কি সম্ভব নয়? চাপ, অর্থ, এই ধরনের অনেক কিছুকেই তো এসমস্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগান হয়। তুমি এক কাজ কর ডাক্তার—

—এমন কিছু বলবে না যাতে আমি হাঁসফাস করতে থাকি।

—আরে না না। একটা এনকোয়ারির ব্যাপার। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো কলকাতার কোন্ কোন্ রিসার্চ সেন্টারে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড রাখা হয়।

এই সময় বাহাদুর দু'কাপ চা দিয়ে গেল।

কাপ তুলে নিয়ে শৈবাল বলল, কাজটা করা যেতে পারবে। আমাদের রিসার্চ ব্যুরোর ডক্টর মজুমদার—ভারি ভাল লোক। ওঁর সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে।

—জানাজানির কাজটা তাহলে কালকেই সেরে ফেল।

আবার বাহাদুর দেখা দিল।

—দুজন দেখা করতে এসেছেন।

—নিয়ে এস।

কয়েক মিনিটের মধ্যে রীমা আর প্রদোষ দেখা দিল। ওদের এই সময় বাসব আশা করেনি। বসতে বলল। বাহাদুরকে ইঙ্গিত কবল আরো দু-কাপ দিয়ে যেতে।

প্রদোষ বলল, দুপুরেই কলকাতা এসেছিলাম। দোকানের জন্য কিছু মাল বুক করার ছিল। ইনি এতক্ষণ ছিলেন বাপের বাড়িতে।

রীমা বলল, ফিরে যাবার আগে ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বাসব বলল, ভালই করেছেন। আমি তো গিয়েছিলাম চেতলা। আপনার দাদার সঙ্গে কথা হয়েছে।

—দাদা বলছিল।

—ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমার উপকারই হয়েছে। কাল যাব উদয় চৌধুরীদের বাড়ি। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। মনে হয় সহযোগিতা না করার টেন্ডেসিই ওঁদের থাকবে। দেখা যাক।

বাহাদুর দু'কাপ চা দিয়ে গেল।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, এঁর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।

ডাঃ শৈবাল রায়। আমার একমাত্র বন্ধু, সহযোগি—

তিনজনের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল।

সময়োচিত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে চা এর কাপ শেষ হল।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে প্রদোষ বলল, গতকাল একটা ব্যাপার ঘটেছে—

বাসব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

—উদয় চৌধুরীর কাকা আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। আজে বাজে কথা

বলে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন আমাদের। শেষে আমি তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বাধ্য হয়েছি।

বাসব বিস্ময়ের সুরে বলল, সোমনাথ চৌধুরী আপনাদের ওখানে গিয়েছিলেন—অবাক কান্ড। তাঁর বক্তব্যটা কি ছিল? ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাই। ভেবে চিন্তে ঠিক যা ঘটেছিল আমাকে বিস্তারিত ভাবে বলুন।

প্রদোষ বলল। ঘটনা নিম্নরূপ—

তখন সাড়ে আটটা বাজার মুখে। সকালের ইংরেজি নিউজ সবে শেষ হয়েছে। টি ভি বন্ধ করে রীমা প্রদোষের দিকে তাকাল। ও দাড়ি কামাচ্ছিল। রীমা জানতে চাইল, আরেকবার চা খাবাব ইচ্ছা আছে কিনা? প্রদোষ কিছু বলতে যাবার আগেই বাইরে গাড়ি থামার শব্দ হল।

এখন আবার কে এল?

প্রদোষ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাইরের বারান্দায় এল। পঞ্চাশ উর্ধ্বের এক ব্যক্তি কিছুটা অস্থিরতা নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ওকে দেখেই বললেন রীমা আছে? ডেকে দিন। বলুন সোমনাথ চৌধুরী দেখা করতে চান। চৌধুরীবাড়িতে কারুর সঙ্গে প্রদোষের চেনা জানা নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কোন উত্তর দেবার আগেই রীমা ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল। বিরক্তিতে মন তেতো হয়ে উঠেছে। এ লোকটা আবার এখানে কেন?

রীমা এগিয়ে এসে বেশ বিরক্তিব সুরে বলল, আপনি আবার আমাকে কি বলতে এলেন। পুলিশের কাছে আমাদের নামে রিপোর্ট করে সর্বনাশেব শেষ ধাপে পৌঁছে দিয়েছেন। আবার কি চান?

মোলায়েম সুরে সোমনাথ চৌধুরী বললেন, তোমাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই চেষ্টাই এখন করছি।

—হঠাৎ এত দয়া?

—দয়া নয়, স্বার্থ বলতে পারো।

প্রদোষ বলল, এত ভূমিকা না করে যা বলতে এসেছেন তাই বলুন। আমাদের অন্য কাজ আছে।

—তাতো থাকবেই। বলেই ফেলি তাহলে। অস্বীকার করলেও আমি জানি সেদিন রীমা 'ইস্টএন্ড' হোটেলে উদয়ের সঙ্গে ছিল। উদয়কে কে মেরেছে তা নিয়ে আমাদের আর মাথা-ব্যথা নেই। আমরা এফিডেবিট করে স্বীকার করে নেবো আমরা পুলিশের চাপে-পড়ে রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছিলাম। রীমা সান্যাল সম্পূর্ণ নির্দোষ। ১৯শে জানুয়ারী সে উদয়ের সঙ্গে হোটেলে ছিল না।

ভ্রূ কুঁচকে প্রদোষ বলল, আপনারা এরকম করবেন কেন?

—ঐ যে বললাম, স্বার্থ আছে। আসল কথা হল, সেদিন উদয় একটা সুটকেস আর একটা ব্রিফকেস হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ও মারা যাবার পর শুধু সুটকেসটা পাওয়া গেছে।

—তাতে হয়েছেটা কি?

—আমরা ব্রিফকেসটা চাই। রীমা ওটা নিয়েই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। ওটা ফেরত পেলেই আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।

তীক্ষ্ণ গলায় রীমা বলল, কি সমস্ত আবোল-তাবোল বকছেন!

মোলায়েম গলায় সোমনাথ বললেন, ঐ ব্রিফকেস-এ কোন টাকাকড়ি ছিল না। ছিল কিছু দলিল দস্তাবেজ। অন্য কারুর কোন কাজে আসবে না। না পেলে আমাদের দারুণ অসুবিধা হবে। উদয় বাড়ির লোকদের জব্দ করার জন্য ওগুলো নিয়ে গিয়েছিল। ব্রিফকেসটা ফিরিয়ে দিলে তোমরা সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে। আজই আমি সমস্ত ব্যবস্থা করবো।

প্রদোষ বলল, আপনার নিশ্চয় আর কিছু বলার নেই। অনেক সময় আপনাকে দেওয়া হয়েছে—এবার আপনি যেতে পাবেন।

—আমার কথাটা—

—আত্মসম্মান জ্ঞান বলে আপনার কিছুই নেই। আর কোন কথা নয়। আমি আপনাকে এখান থেকে যেতে বলেছি।

সোমনাথ চৌধুরীর মুখ লাল হয়ে উঠল।

উনি উত্তেজিত ভঙ্গীতে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সংযত করলেন। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে গেলেন বারান্দা থেকে...প্রদোষ নিজের বক্তব্য শেষ করল। বাসব এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল।

এবার শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

বাসব উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো—মিঃ সামন্ত...আপনাকেই এসপেক্ট করছিলাম...

সামন্ত ঃ আধঘন্টাটাক আগে বাগচী আমায় ফোন করেছিলেন...কাজে লাগে এমন কিছু বলতে পারলেন না..

বাসব ঃ কি বললেন...

সামন্ত ঃ সেদিন গাড়ির চাবি ওঁর স্ত্রী কাউকে দেননি...বেলা চারটের পর নিজেই ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরে এসেছেন..

বাসব ঃ আপনার কি মনে হচ্ছে...কোন কারণে মহিলা ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছেন...চাবি উনি কাউকে দিয়েছিলেন...এখন স্বীকার করছেন না...

সামন্ত ঃ হতে পারে...আবার এমনও হতে পারে...গাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটা রজত মৈত্র আপনাকে বানিয়ে বলেছে...

বাসব ঃ এ সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না...গহন ভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার...

সামন্ত ঃ এখন করছেনটা কি... চলে আসুন...আমি ঘন্টা দেড়েক অফিসে থাকছি...

বাসব ঃ আমার মক্কেলরা এসেছেন...কথা বলছি...সোমনাথ চৌধুরী ওঁদের কাছে গিয়েছিলেন এক বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে...আপনাকে সব কথা বলব কাল..

সামন্ত ঃ ঐ কথাই রইল তাহলে...শুভ রাত্রি...

উনি লাইন কেটে দিলেন।

বাসব নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল, লালবাজার থেকে ফোন এসেছিল। মিসেস সান্যাল, আপনি নিশ্চিত সেদিন একটা সুটকেস ছাড়া উদয় চৌধুরীর কাছে আর কিছু ছিল না?

—আমি নিশ্চিত মিঃ ব্যানার্জী। আমি বরং একটা ব্রিফকেস নিয়ে গিয়েছিলাম। উপায়হীন অবস্থায় ওটা হোটেলে ফেলে আসতে হয়েছিল।

—ব্যান্ডেল পর্যন্ত যখন সোমনাথ ধাওয়া করেছেন, তখন ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। মনে হয়, ঐ ব্রিফকেস অন্য কোথাও রেখে উদয় আপনার সঙ্গে হাওড়া-স্টেশনে দেখা করতে গিয়েছিল। যাহোক, সোমনাথ প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। ভদ্রলোক আর ফিরে আসেননি?

রীমা বলল, না। বারান্দা থেকে নেমেই গাড়িতে চড়ে বসেছিলেন।

—নিজেই ড্রাইভ করে এসেছিলেন?

প্রদোষ বলল, হ্যাঁ। চকলেট রং-এর একটা ফিয়েটে এসেছিলেন।

বাসব অবাক হয়ে গেল।

দ্রুত গলায় বলল, আপনি গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলেন?

—দেখিনি তো। কোন ব্যাপার আছে নাকি?

—দেখে রাখলে কিছুটা পরিশ্রম বেঁচে যেত। রজতবাবু একটা চকলেট রং-এর ফিয়েটের কথা বলেছিলেন—আপনাদের দেখা গাড়িটা সেই গাড়ি কিনা জানা গেলে ভাল হত।

রীমা বা প্রদোষ ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে না।

আরো দুচার কথার পর ওরা বিদায় নিল।

বাসব পাইপ ধরাবার তোড়জোড় করতে করতে বলল, রজতবাবু যদি সত্যি কথা বলে থাকেন এবং বাগচীও যদি সত্যি কথা বলে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ডাক্তার? সত্যি কথা বলে থাকলে, দুটো চকলেট রং-এর ফিয়েট গাড়ি আছে।

—একজ্যাক্টলি। একটা বাগচীর। অন্যটা কার সেটাই আমাদের জানতে হবে। ঐ গাড়িটা পাওয়া গেলে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হবে।

—আমার মনে কিন্তু অন্য প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

—কি বলতো?

—তুমি বলছিলে বাগচী নিজের স্ত্রীকে ভয় পায়। স্ত্রী যা বলে দিয়েছেন, বাগচী সে কথাই সামন্তকে জানিয়েছেন।

—তুমি যা বলছো হতেও পারে। এই সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেবে। সোমনাথ চৌধুরী আবার গাড়িটা পেলেন কী ভাবে?

মুখে হাসি টেনে শৈবাল বলল, কাল রবিবার ছিল। বাগচী অফিসে যান নি। হয়তো ওঁর স্ত্রী গাড়িটা নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, মার্ভেলাস। ইদানিং তোমার প্রচুর উন্নতি

হয়েছে দেখা যাচ্ছে। 'হয়তো, টয়তো' থাকলেও, তুমি যা বলছো মনে হয় ওটাই ঠিক। অবশ্য উত্তরটা পেতে আমার অসুবিধা হবে না।

কিভাবে?

—সোমনাথ চৌধুরীকে ডায়রেক্ট প্রশ্ন করবো।

চৌধুরীর বাড়ির কারুর সঙ্গেই তো এখনো কথা বলনি?

—কালই ওঁদের ওখানে যাব। তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে?

—আমার যাওয়া হবে না। কাল একটা বড় ধরনের অপারেশন আছে। অনেক সময় লেগে যাবে।

—তুমি কিন্তু পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সম্পর্কে ভুলো না। ভালোভাবে খোঁজ খবর নিও। বাহাদুর কোথায় গেল বলতো? গলায় আবার গরম কিছু না ঢাললে চলছে না।

—দেখছি, দাঁড়াও—

শৈবাল উঠল সোফা ছেড়ে।

বেলা প্রায় দশটার সময় বাসব উমানাথ চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছালেন। পূর্ব-ব্যবস্থা মত ইন্সপেক্টার অভয় সোম মিনিট দশেক আগেই ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই টানা পোড়েনে তাঁর মনের অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। তবু আসতে হল—উপরওয়ালার আদেশ।

উমানাথের সঙ্গে বাসবের পরিচয় করিয়ে দিলেন সোম। উমানাথ অবশ্য জানতেন বেসরকারী ভাবে তদন্ত হচ্ছে। গোয়েন্দা প্রবর যে কোন দিন তাঁদের কাছে আসতে পারেন।

বাসব খুঁটিয়ে দেখল ভদ্রলোককে। বয়স ষাটের কিছু উপরেই হবে। এককালে বেশ বলশালী পুরুষ ছিলেন বোঝা যায়। এখনও শরীরে বাঁধুনী ভাল। মাথার কাঁচাপাকা চুল কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে। গায়ের রং তামাটে। চলনসই মুখ। মনে হয়, স্বভাবে গম্ভীর প্রকৃতির। ওঁকে দেখলে দুঁদে ব্যবসাদার বলে মনে হয় না।

বাসব বলল, আমার উপস্থিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর। কিন্তু করার কিছু নেই। আমি কর্তব্যের খাতিরেই এখানে এসেছি।

উমানাথ বললেন উদয় অবশ্য আর ফিরে আসবেন না, তবে প্রকৃত হত্যাকারী কে, তা অবশ্যই জানা দরকার। আপনি সংকোচ করবেন না। আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান করুন।

—আপনার কথায় বোজা গেল, আপনি রীমা সান্যালকে হত্যাকারী হিসেবে স্বীকার করেন না। তাই কি?

—প্রথমে আমি এবং আমার বাড়ির লোকেরা রীমাকেই হত্যাকারী হিসাবে মনে করেছিলাম। পুলিশকেও সেই ভাবেই বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে চিন্তা ভাবনা করে—

—বলুন?

—রীমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয় কোন ঘোরাল ব্যাপার আছে। আপনি তদন্তে নিযুক্ত হয়েছেন। ব্যাপারটা খতিয়ে দেখুন।

বাসব বলল, আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। এবার উদয়বাবু প্রসঙ্গে আসতে চাই। ওঁর স্বভাব চরিত্রের জন্য আপনারা অস্বস্তির মধ্যে পড়তেন। এর কোন বিহিত করেন নি কেন?

—কি বিহিত করব? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যেত। তাতে ফল হত না সে নানারকম হাঙ্গামার সৃষ্টি করতো।

—কিছু মনে করবেন না। শুনেছি, আপনার বড় পুত্রবধূকে জড়িয়েও—

—ঠিক শুনেছেন।—উমানাথ কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গীতে বললেন, তার পরও আমি ওকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলিনি। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু যে হাঙ্গামার ভয়ে তা নয়, এর কারণ আমার এক বিচিত্র দুর্বলতা।

—এই নিয়ে বাড়িতে কোন গোলমাল হয়নি?

—হয়েছিল। আমার বড়ছেলে উদিত বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিল উদয়কে। বহু কষ্টে ব্যাপারটা সামলানো গিয়েছিল।

—উদয়বাবু এত টাকা পয়সা পেতেন কোথা থেকে?

—ইদানিং আমি কিছু দিতাম না। শুনেছি, আমার ছোটভাই সোমনাথ দিত তাছাড়া—

—আরো কোন সোর্স অফ ইনকাম ছিল?

ফিকে হাসলেন উমানাথ।

—সোর্স না বলে চোরামী বলতে পারেন। গুদাম থেকে সে দামী কাঠের লগ সরিয়ে ফেলতো। তারপর বিক্রী করে দিয়ে টাকাটা রাখতো নিজের পকেটে। অনেক দিন ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনি।

—জানাজানি ইদানিং হয়েছিল।

—হ্যাঁ। মাস খানেক আগে। হিসাব করে দেখা হল, ক্রমে ক্রমে সে আড়াই লক্ষ টাকার মাল সরিয়েছিল।

—কি করলেন তারপর?

—বকাবকি করলাম। মাথা নীচু করে সমস্ত শুনল—একটা শব্দও উচ্চারণ করে নি। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য অতি মাত্রায় সাবধানতা নিলাম।

বাসব গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, দেখা যাচ্ছে, উদয়বাবুর স্বভাবের জন্য আপনারাই বহুলাংশে দায়ী। অত্যধিক প্রশ্রয়ই আপনার ছেলেকে নির্মম নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে গেছে। যা হোক, গতকাল আপনার ভাই সোমনাথবাবু ব্যান্ডেলে গিয়ে সান্যাল দম্পতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আপনি কি ওকে পাঠিয়েছিলেন?

উমানাথ অবাক হয়ে গেলেন।

—আমি তো কিছু জানি না। এ কি ধরনের পাগলামী। ওদের বাড়ি কি করতে

গিয়েছিল। আমি ঠিক জানি না ব্যাপারটা?

—অকারণে আপনাকে মিথ্যা কথা বলবো কেন? উনি ওখানে গিয়েছিলেন কিছু দলিল-দস্তাবেজের সন্ধানে।

—ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে। আমি তো এর মাথা-মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

বাসব এবার বলল ঘটনাটা।

উমানাথ বললেন, এত ব্যাপার ঘটে গেছে, অথচ আমি কিছু জানি না। সোমনাথকে ডাকছি এখানে। দলিল-দস্তাবেজ উদয়ের হাতে কিভাবে গিয়েছিল আমার জানা দরকার।

—আমাদের সামনে ডাকবেন না। এই ধরনের কথা বাইরের লোকের আড়ালে হওয়াই ভাল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না। আর মাত্র গুটি কয়েক প্রশ্ন আছে।

—আপনার মেয়ের চকলেট রং-এর একটা ফিয়েট আছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঐ রং-এর ফিয়েট আর কারুর আছে কি?

—আমি যতদূর জানি নেই। চকলেট রং-এর ফিয়েট—ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—ঐ রং-এর একটা ফিয়েট আমি খুঁজছি। আপনার মেয়ে পরশুদিন এখানে এসেছিলেন?

—না। গত সপ্তাহে এসেছিল।

—সোমনাথবাবু চকলেট রং-এর ফিয়েট চড়েই ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন। ঐ গাড়িটা উনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন বলতে পারেন?

—আমার জানা নেই। আপনার প্রশ্ন শুনছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই সঙ্গে একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না, এই সমস্ত প্রশ্নের সঙ্গে উদয়ের মৃত্যুর কি সম্পর্ক?

—খুনের তদন্ত করতে গেলে চারপাশটা বাজিয়ে দেখতে হয়। আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই। অনেক ধন্যবাদ।

অভয় সোমকে সঙ্গে নিয়ে বাসব উমানাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সোম এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন-উত্তর শুনে যাচ্ছিলেন। এ ধরনের প্রশ্নের সার্থকতা কি, তা বুঝে ওঠা ওঁর কাছে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল।

উদিত আর উজ্জ্বল বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল।

এগিয়ে এসে উদিত গম্ভীর গলায় বলল, এই পরিস্থিতিতে বাবাকে বার বার বিরক্ত করা কতদূর ঠিক হচ্ছে আপনারাই জানেন।

বাসব বলল, আপনি বোধহয় উদিতবাবু? মামলাটা যখন খুনের তখন পরিস্থিতির কথা মনে রাখলে চলে না। আপনার বাবা কিন্তু আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। এছাড়া একটা বাস্তব দিকও আছে। উদয় চৌধুরী মারা যাওয়াতে আপনি কি সত্যি শোকাহত হয়েছেন?

—ভাই মারা যাবে আর আমরা শোক পাব না?

—সেই ভাইকে আপনি বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন! বাধা না পেলে হয়তো গুলি করে মারতেন। শোকের ব্যাপারটা তখন মনে ছিল না বোধহয়?

উদিত থতিয়ে গেল।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। যা বলবার আমি পুলিশকে বলেছি। এই তো ইন্সপেক্টার রয়েছেন, ইনিই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

—আপনার স্টেটমেন্ট আমি দেখেছি। আমার অন্য ধরনের কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে। এখানে উত্তর দেন খুব ভাল কথা। নইলে আপনাকে লালবাজারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

—কি মশাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—না। বাস্তব দিকটা আপনাকে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। আপনার বাবা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

উদিত বোধ হয় গোলমালের মধ্যে পড়তে চাইল না।

—বলুন, কি জানতে চান?

—আপনার ভাই'এর মৃত্যু সম্পর্কে আপনার ধারণাটা বলুন?

—নিজেকে বাঁচাবার জন্য গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেই নিরপরাধ হওয়া যায় না।

উদয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী বীমা আর তার হাসবেন্ড।

—আপনার বাবার ধারণা বোধহয় তা নয়।

—হতে পারে। সকলের ধ্যান-ধারণা একই রকম হবে ভেবে নেওয়া ঠিক নয়।

—প্রসঙ্গটা শোভন নয়। তবু বলতে হচ্ছে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটা গোলমাল বাধিয়ে ছিলেন উদয়বাবু। আপনি—

—গোলমাল করার চেষ্টা করেছিল।

—আপনার কথাই মানলাম। আপনি কিন্তু বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছিলেন। সেই ভাই-এর প্রতি আপনার ভাব-ভালবাসা থাকবার কথা নয়। উনি—

—আমি খুন করেছি উদয়কে, এই কথাই বলতে চাইছেন কি?

—এখনই ঐ কথা বলতে চাইছি না। আমি এই কথাই বলতে চাইছি, আপনাদের বাড়ির প্রত্যেকেরই কোন না কোন ইসু আছে যার দরুণ উদয়বাবুর মৃত্যুটা স্বস্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

উজ্জ্বল এই সময় হঠাৎ বলে উঠল, আপনি ঠিকই বলছেন। বাড়ির প্রত্যেকের মন বিষিয়ে তুলেছিল মেজদা। এমন বিশ্রী চরিত্রের লোক বড় একটা দেখা যায় না। আমার ভাবী স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপারটা নিশ্চয় আপনি জানেন? আমি অন্তত হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

—ধন্যবাদ। মনের ভাব প্রকাশ করে সাহসের পরিচয় দিলেন।

তীক্ষ্ণ গলায় উদিত বলল, উজ্জ্বল, তুমি কি. সমস্ত বলছো? তোমার কথার অর্থ দাঁড়ায়, আমি বা তুমি কিংবা আমরা দুজনে মিলে উদযকে খুন করেছি।

উজ্জ্বল স্বাভাবিক গলায় বলল, এত উত্তেজিত হবার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। বাস্তবকে চোখ ঠেরে কি লাভ বড়দা?

—একজন পুলিশ-অফিসারের সামনে কি সমস্ত বকে যাচ্ছ?

অভয় সোম এতক্ষণ পরে কথা বললেন।

—উজ্জ্বলবাবু, হত্যাকারী সম্পর্কে আপনার যখন অন্যরকম একটা ধারণা আছে, তখন সেদিন আমাকে একথা বলেননি কেন?

—মনকে তখন আমি গুটিয়ে আনতে পারিনি। মনে হয়েছিল, রীমাই হয়তো মেজদাকে খুন করেছে।

—আপনার ধারণাটা পাল্টালো কবে?

—গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার পরই।

—কিভাবে খুনটা হয়েছে?

—তা বলতে পারবো না।

অভয় সোম এবার উদিতের দিকে তাকালেন।

—আপনার কি মনে হয়, আপনার ছোটভাই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবার চেষ্টা করছেন?

উদিত ভারি গলায় বলল, ও যা বলতে চাইছে, তার দায়িত্ব তো আমি নিতে পারি না। আমি এইটুকুই বলতে পারি, উদয়ের উপর রাগ আমার ছিল।

বাসব পাইপ ধবিয়ে নিয়েছিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কেউ স্বীকার করে না, খুনটা করেছে। ইন্সপেক্টর, আপনি অন্ততঃ বুঝে ফেলেছেন নিশ্চয়, এঁরা কেউ আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলেননি। এখন ও প্রসঙ্গ থাক। আমরা বরং কিছু তথ্যের সন্ধান করি। তাতে কাজ হবে।

বাসব এবার দুই-ভাই-এর দিকে মুখ ফেরাল।

—খুন যেই করে থাকুক তাকে চিহ্নিত করা তো দরকার। রীমা এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত দেখবেন মহিলা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। এবার আপনারা আমার গোটা কতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন—লক্ষ্যর দিকে পৌঁছাতে সুবিধা হবে।

উজ্জ্বল বলল, বলুন। উত্তর আমার জানা থাকলে এড়িয়ে যাব না।

—উদিতবাবু তো পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত আছেন। আপনি তো এক বহু জাতিক কম্পানিতে কাজ করেন। কেমিক্যালস্ নিয়ে আপনাদের নাড়াচাড়া আছে?

—হ্যাঁ। জীবনদায়ী অনেক ওষুধ তৈরি হয়। আমি ফার্মাসিউটিক্যাল ডিভিসনেই আছি।

—আপনি কি কেমিস্ট?

—না। ম্যানেজমেন্টে—

—পটাশিয়াম অ্যাকোড়াইডের নাম শুনেছেন?

উজ্জ্বল ভ্রূ কুঁচকে কি ভেবে নিয়ে বলল, আমি যতদূর জানি এই আইটেম এখানে তৈরি হয় না। বিদেশ থেকে আসে। আমরাই ইমপোর্ট করি।

—তারপর কি হয়?

—সরকারের অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়।

—কলকাতায় এরকম প্রতিষ্ঠান কটা আছে বলতে পারবেন?

—এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। কাল অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। তারপর—

—বেশ তো। খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবেন।

—ফোন নম্বর পেলে, কালই আপনাকে জানিয়ে দেব।

বাসব ফোন নম্বর দেবার পর বলল, আপনি ইচ্ছে কবলে ঐ আইটেম সংগ্রহ করতে পারেন?

—না। আমাদের সে রকম সুযোগ সুবিধা নেই। বিশেষ এক ধরনের অ্যালুমিনিয়ামের কন্টেনারে আসে। এয়ার কন্ডিশন রুমে রাখা থাকে। তারপর চাহিদামত সাপ্লাই হয়।

—যারা মাল নেয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বোধ হয় বেশি নয়।

—কলকাতায় বেশি নয়। তবে অন্যান্য প্রদেশেও সাপ্লাই হয় তো।

—অনেক কিছু জানা গেল। কাল সন্ধ্যাব মধ্যে ফোন আশা করব। এবার অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন।

—গতকাল সকালে সোমনাথবাবুর সঙ্গে আপনার কখন দেখা হয়েছিল বলতে পারেন?

বিস্ময়ের সুরে উজ্জ্বল বলল, কাকার সঙ্গে? কাল আমি ভোরে বেবিয়ে গিয়েছিলাম। কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সন্ধ্যার পর।

—ওঁর নিজের গাড়ি আছে?

—হ্যাঁ। মারুতি ওয়ান থাউজেন্ড।

—উদিতবাবু, কাল সকালে আপনার কাকাব সঙ্গে কটায় দেখা হয়েছিল?

—তখন প্রায় সাতটা বাজে। কাকা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিলেন।

—নিজের গাড়িতে বেরুচ্ছিলেন বোধহয়?

—না। আমি তো ওঁকে হেঁটেই যেতে দেখলাম।

—আপনি জানেন কাল সকালে উনি ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন?

—না তো। কেন?

—রীমা সান্যালের সঙ্গে দেখা কবতে।

দুই ভাই চমকে উঠল।

বিস্ময়ের সুরে উদিত প্রশ্ন করল, কাকা ওখানে গেলেন কেন? আপনি জানেন কেন গিয়েছিলেন?

—জানি। আমি উমানাথবাবুকে বলেছি কথাটা। উনি আপনাদের নিশ্চয় যথা সময়ে বলবেন। উদিতবাবু—

—বলুন!

—আপনাদের গুদামটা কোথায়?

—ট্যাঙরায়।

—দেখাশুনা করার ভার কার উপর আছে?

—বাবা আর কাকা মিলেই দেখাশুনো করেন। তবে একবার মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবার পর বাবা ওখানে যাওয়া আসা আজকাল কম করেন।

—জানেন, ওখান থেকে আড়াই লাখ টাকার কাঠ চুরি হয়েছে।

দুই ভাই হতবাক হয়ে গেল।

বাসব আবার বলল, কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না?

উদিত বলল, এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে অথচ আমি জানি না, এই ভেবে অবাক হচ্ছি।

—কথাটা বানিয়ে বলিনি। আপনার বাবার কাছ থেকে জানতে পেরেছি।

—বাবা আমাকে বলেন নি। আমার বিশ্বাস বাড়ির আর কেউ জানে না। আপনাকে কি ভাবে বললেন?

—তদন্তে সুবিধা হতে পারে ভেবেই বোধ হয় বলেছেন। আপনার একটা ধারণা ঠিক নয়। বাড়ির আর কেউ জানে না তা কি করে সম্ভব? আপনার কাকাও তো গুদামের ভারপ্রাপ্ত।

উদিতকে চিন্তিত দেখা গেল।

উজ্জ্বল বলল, এই কাজ কে করেছে সে সম্পর্কে বাবা কিছু আঁচ করতে পেরেছেন।

—আঁচ নয়। ওঁর নিশ্চিত ধারণা আছে। উদয়বাবু এই দুষ্কর্মের জন্য দায়ী।

—অসম্ভব। মেজদা ভাল লোক ছিল না ঠিকই। এই ধরনের কাজ করতে গেলে সাহস, পরিকল্পনা আর যে তৎপরতার প্রয়োজন তা মেজদার মধ্যে ছিল না। তাছাড়া—

—বলুন?

—এই ধরনের কাজ একা করা সম্ভব নয়। গুদামের কর্মচারীদের বলতেই হবে। এরকম ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেক আগেই আমরা সকলে জানতে পারতাম।

—উদিতবাবু আপনার কি ধারণা?

উদিত চিন্তিত গলায় বলল, উজ্জ্বল ঠিকই বলছে। আড়াই লাখ টাকার কাঠ মুখের কথা নয়। কয়েক লরির ব্যাপার। উদয়ের মত আনাড়ি লোকের পক্ষে চুরি করা এবং চুরি করা কাঠ বিক্রী করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি?

দুই ভাই চুপ করে রইল।

—একটা ধারণা নিশ্চয় করে ফেলতে পেরেছেন?

উদিত বলল, এই মুহূর্তে কিছু বলা ঠিক হবে না। আমি বাবার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে চাই। উজ্জ্বল বরং সেই সময় আমার সঙ্গে থাকবে।

—বেশ। আজকের মত আমাদের আলাপ আলোচনা এখানেই শেষ হল। সোমনাথবাবুকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?

—বাড়িতেই আছেন। দেখছি—

উদিত সবে কয়েক পা এগিয়েছে, দেখা গেল সোমনাথ চৌধুরী এদিকেই আসছেন। ব্যস্ত সমস্ত ভাব। সকলের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে থামলেন। তারপর পিছিয়ে এলেন কয়েক পা। বাসবের সঙ্গে অবশ্য সাক্ষ্যাত পরিচয় নেই, তবে বুঝতে পেরেছেন ব্যক্তিটি কে।

বললেন, আপনি বোধহয় আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। এখন একটু ব্যস্ত আছি। দাদা ডেকে পাঠিয়েছেন। কোন জরুরী কথা আছে নিশ্চয়। পরে বরং—

বাসব বলল, ঠিক আছে। আমি বরং কাল আসবো।

—আপনি কোন্ অঞ্চলে থাকেন?

—হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে আমার বাড়ি। এই যে কার্ড।

বাসব কার্ড এগিয়ে দিল।

কার্ড পকেটস্থ করে সোমনাথ বললেন, সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীতে আমার কাজ আছে। তাড়াতাড়ি যদি মিটিয়ে ফেলতে পারি, আসছি আপনার ওখানে।

—তবে তো ভালই হয়।

কারুর সঙ্গে আর কোন কথা হল না, বাসব বেরিয়ে এল ওখান থেকে। অভয় সোম সঙ্গেই আছেন। তাঁর মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ওঠা নামা করছে। বাসব সম্পর্কে এখনও কোন ভাল ধারণা গড়ে নিতে পারেন নি। ওর প্রশ্নের ধারা লক্ষ্য করে মনে হয়েছে, ভদ্রলোক ব্যাপারটা আউট অব ট্র্যাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

গাড়িতে বসার পর অভয় সোম বললেন, কাঠ চুরির ব্যাপারটাকে আপনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? খুনের মামলার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, যে কোন অপরাধ মোটিভ ছাড়া হয় না, নিশ্চয় স্বীকার করবেন? আপনারা যে মোটিভ খাড়া করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। কাজেই নানা দিক খুঁচিয়ে দেখতে হচ্ছে। আপত্তি যদি না থাকে, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?

—বলুন!

—পোস্টমর্টমের রিপোর্টে মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট কারণ দেখান হয়নি! শুধু বলা হয়েছে মৃত্যু সন্দেহজনক। কিভাবে মারা গেলেন উদয় চৌধুরী?

অভয় সোমের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

বাসব আবার বলল, আমি যদি তদন্ত করা ছেড়ে দি। আপনারা রীমা সান্যালকে কোর্টে নিয়ে যাবেন। ওখানে সুবিধা করতে পারবেন কি? আদালত জানতে চাইবে, উদয় চৌধুরীকে কিভাবে মারা হয়েছে? সঠিক উত্তর আপনারা দিতে পারবেন না। তখন নিশ্চিত ভাবে প্রশ্ন উঠবে, এটা কি আদপেই হত্যাকান্ড?

অভয় সোম ভ্রূ সরল না করেই প্রশ্ন করলেন, আপনি জানেন কিভাবে মারা গেছে উদয়?

—মোটামুটি আঁচ করেছি।

—কি ভাবে?

—এখন বলা যাবে না। চকলেট রং-এর একটা প্রিমিয়ার খুঁজছি। গাড়িটা পেয়ে গেলে ব্যাপারটা অনেক সরল হয়ে যাবে।

অভয় সোম বুঝে উঠতে পারলেন না, মৃত্যুর ব্যাপারে ফিয়েট গাড়ির কি সম্পর্ক। বিরক্তি মনকে চেপে ধরল। লোকটা দাম্ভিক সন্দেহ নেই। এখন কি তাঁর সঙ্গে ঠাট্টার খেলা আরম্ভ করেছে? বাসবের অবশ্য থানা নরেশের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। পুলিশ জিপ তখন ভবানীপুর অতিক্রম করে চলেছে।

বাসব বলল, আমি এখানে নামতে চাই।

সোম জীপ থামালেন।

রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে বাসব বলল, আমার কথায় গুরুত্ব দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি নিজের পথ ধরেই চলবেন, এটাই স্বাভাবিক। আমি কতদূর কি করতে পারি দেখি—।

অভয় সোম আর কিছু বললেন না।

জীপ স্টার্ট করলেন।

তখন সন্ধ্যা উতরে যাবার মুখে।

দুশ একচল্লিশের কে, হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে সেন্টার টপের উপর থেকে ছড়িয়ে থাকা তাস গুছিয়ে নিতে নিতে শৈবাল বাসবের দিকে তাকাল। এতক্ষণ সে পেসেন্স খেলছিল। বাসব সোফায় আড় হয়ে বসে আছে। ঠোঁটের আগায় নিভন্ত পাইপ।

শৈবাল বলল, মৌনব্রত অবলম্বন করবে ঠিক করে রেখেছো নাকি?

বাসব নড়েচড়ে বসল।

—কই, না তো।

—গত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে একটা কথাও তো বলতে শুনলাম না। আমি যে এসেছি, তুমি বোধহয় খেয়ালই করনি।

—আমি মোটেই অন্যমনস্ক ছিলাম না ডাক্তার। আসল কথা হল, চিন্তা ভাবনায় হাঁসফাঁস করছি। কূলে তো পৌঁছানো দরকার।

কূল থেকে এখন কতদূরে আছো?

বাসব হেসে ফেলল।

তারপর পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, কতকগুলো অবসট্রাকশন থাকার দরুণ কাছাকাছি থেকেও কূলে পৌঁছাতে পারছি না। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা কি জানো উদয় চৌধুরীকে খুন করেছে কে—বাড়ির লোকেদের মধ্যে কোন একজন না, বাইরের কেউ?

—আমার মতে বাইরের লোকেদের কাজ নয়।

—কি ভাবে বুঝলে? বহু পরিবারকে আতান্ডারে ফেলেছিল উদয় চৌধুরী।

াদের মধ্যে যে কেউ তাকে খুন করে থাকতে পারে।

—এক্ষেত্রে তা হয়নি।

—কেন?

—আমার মতে বাইরের লোকের কাজ হলে, একটা সাদামাটা খুন হত। গুলি খয়ে বা ছোরার মারে কোথাও মরে পড়ে থাকতো উদয় চৌধুরী। তা হয়নি। াখানে ভারি সূক্ষ্ম পরিকল্পনার পরিচয় আমরা পাচ্ছি। অর্থাৎ—

—চমৎকার। —বাসব বলল, তোমার ইদানিং বেশ উন্নতি হয়েছে, আমায় ীকার করতেই হচ্ছে। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো। হত্যাকারী কাছের মানুষ া হলে, পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড খাওয়ানো যেত না। উদয়ের স্বভাব ও অভ্যাস ম্পর্কে গভীর ভাবে ওয়াকিবহাল না হলে তা সম্ভব ছিল না। তোমাকে আগেও ালেছি, রজত মৈত্র সত্যি কথা বলে থাকলে, রিপন স্ট্রীটের ঐ-বারেই উদয়কে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড খাওয়ানো হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। মামি অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।

—বলো।

উদয়ের মৃত্যুতে তার আত্মীয়স্বজনের কার কতটা লাভ হল, তার একটা ফিরিস্তি তেরি করা যেতে পারে। অবশ্য আলাদা, আলাদা ভাবে।

বিস্ময়ের সুরে শৈবাল বলল, আলাদাভাবে বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো?

—তুমি একটা তৈরি করবে, আমি একটা। তারপর দুটোকে মিলিয়ে দেখবো মামরা—। তোমাকে তো সব কথাই বলেছি। অসুবিধা হবার কথা নয়।

বাসব উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে দুশিট ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে এল। দুটো টে পেনও। কাগজ ও পেন শৈবালকে দিয়ে নিজেও ফিরিস্তি তৈরির ব্যাপারে নযোগী হল। প্রায় মিনিট কুড়িক পরে দুজনের কাজ শেষ হল।

শৈবাল নিজের শিটটা এগিয়ে ধরে বলল, আমার বিবেচনায় যা ঠিক মনে হল তাই লিখলাম। দেখ, কাজে লাগে কিনা।

বাসব বলল, আমাদের দুজনের বিবেচনার ফল কি রকম দাঁড়ায় এখন তাই দেখতে হবে।

শৈবালের লিখিত অভিমত নিম্নরূপ—

উমানাথ চৌধুরী ঃ স্নেহপ্রবণ এবং অসহায় বাপ। ছেলেদের প্রশ্রয় দেবার পরিণাম এখন বুঝতে পারছেন। হয়তো উনি অনুমান করে ছিলেন, উদয়ের ভবিষ্যৎ এই ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাকে সুপথে আনার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

সোমনাথ চৌধুরী ঃ উদয়কে স্নেহ করতেন। প্রয়োজনে টাকা দিতেন তাকে। এমন কি মারা যাবার দিনও তাকে টাকা দিয়েছিলেন। উদয় গুদাম থেকে যে কয়েক লক্ষ টাকার কাঠ সরিয়েছিল, সোমনাথের সহযোগিতা না থাকলে বোধ হয় এটা সম্ভব হত না। তবে উদয়কে খুন করার ব্যাপারে ওঁর কোন স্বার্থ আছে বলে

মনে হয় না।

উদিত চৌধুরী : কিছুটা স্বার্থপর ও দাম্ভিক বলে মনে হয়। বিশ্রী ব্যাপারে স্ত্রীকে জড়িয়ে ফেলায় উদয়ের উপর তাঁর রাগ ছিল। শুধু তাই নয়, উদয় না থাকলে একজন শেয়ার হোল্ডার কমবে—এও একটা বড় পয়েন্ট। সুতরাং খুন প্রকরণের নায়ক হওয়া উদিতের পক্ষে অসম্ভব নয়।

রত্না চৌধুরী : উদিতের স্ত্রী। উদয়ের অবৈধ আমন্ত্রণে মহিলার সম্মতি ছিল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সম্মতি থাকলেও, ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর স্বাভাবিক কারণেই নানা ধরনের নাটকের অবতারণা ইনি করেছিলেন। ভারি অপমানিত হয়েছেন এটা প্রমাণিত করার জন্য স্বামীকে অবিরাম উস্কাতে থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

উজ্জ্বল চৌধুরী : ছোট ভাই। ভাবী পত্নীর প্রতি উদয়ের কু-দৃষ্টি পড়াটা নিশ্চয় ভাল লাগেনি। সেই মেয়েটিও উজ্জ্বলকে ভাল রকমই তাতিয়ে থাকতে পারে। একজন অংশীদার কমে যাবে, এও কম কথা নয়। তাছাড়া উজ্জ্বল এমন এক জায়গায় কাজ করে যেখানে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সহজলভ্য। সুতরাং এই হত্যার ব্যাপারে সে এক নম্বর সাসপেক্টেড মনে হয়।

উর্মিলা বাগচী : বড় বোন। উনি দুর্ঘটনার দিন সকালের দিকে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন। গিয়েছিলেন নিজেদের চকলেট রং-এর ফিয়েট কারে চড়ে। রিপন স্ট্রীটের বার-এ ঐ গাড়িতে চড়েই উদয় গিয়েছিল। উর্মিলা এই ব্যাপারটা অস্বীকার করছেন। অস্বীকার করছেন বলেই পরিস্থিতি সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। তিনিও কি হত্যাপ্রকরণের এক সহযোগি—,

লোকেন বাগচী : জামাই। যতদূর মনে হয়, ভদ্রলোক স্ত্রীকে ভয় পান। অনিচ্ছার সঙ্গেই বোনের সঙ্গে ছোট শালার বিয়ের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। উদয়ের প্রতি তাঁর ধারণা খুব-খারাপ ছিল। সে মারা যাওয়ায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই ধরনের লোক আর যাই করুক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাউকে খুন করতে পারে না।

বাসব শৈবালের অভিমত পড়ে ফেলার পর, নিজের শিট এগিয়ে ধরল তার দিকে। বাসবের অভিমত নিম্নরূপ—

উমানাথ চৌধুরী : তিন ছেলেকেই তিনি অসম্ভব প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। মেজ ছেলের ক্ষেত্রে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি ছিল। যার দরুণ সে সম্পূর্ণ গোল্লায় চলে গিয়েছিল। পরে আতঙ্কিত হয়ে

উঠলেও কিছু করার ছিল না। উদয় শুধু পারিবারিক সম্মান নষ্ট করেনি, টাকা পয়সাও তছনচ করেছে। ইদানিং তিনি এসবের জন্য সোমনাথকেই দায়ী মনে করতেন। বিস্ময়ের বিষয় মিসেস সান্যালকে তিনি এই হত্যাকান্ডর জন্য দায়ী মনে করতে পারছেন না।

সোমনাথ চৌধুরী ঃ ভদ্রলোককে মোটেই সুবিধার মনে হয় না। উমানাথের গুদামের ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামান না। কাঠ চুরির কথা এঁরই সব চেয়ে আগে জানার কথা। অথচ এ সম্পর্কে আগে কাউকে কিছু বলেননি! উদয়ের মত একজন চরিত্রহীন, লোফার ভাইপোকে টাকা পয়সা দিতেন। কিসের স্বার্থে দিতেন এটা ভাবার বিষয়। এক সুটকেস দলিল দস্তাবেজ উদয় সরিয়েছে, একথাই তিনি সান্যালদের বলেছেন। অথচ এ সম্পর্কে উমানাথ কিছুই জানেন না। ভাইপোকে খুন করার মোটিভ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিয়ে করেন নি। কিসের স্বার্থে বা কার স্বার্থে ঘুরপাক খাচ্ছেন অনুসন্ধান করে দেখার দরকার।

উদিত চৌধুরী ঃ বড়লোক বাপের এই পর্যন্ত, কোন কাজের লোক নয়। মনে হয় স্ত্রৈণ। স্ত্রী ভাই-এর সঙ্গে এক বিশ্রী কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ার পরও, আর দশটা স্বামী যে সমস্ত স্টেপ নেয়, তার ধারে কাছেও জান নি। তবে মনে রাগ পুষে রাখার অভ্যাস থাকতে পারে। একজন অংশীদার কমে যাবে এটা ফাউ হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে। এখন দেখতে হবে, নিখুঁত পরিকল্পনা খাড়া করে কোন কাজ করার মানসিকতা এঁর আছে কি না।

উজ্জ্বল চৌধুরী ঃ বুদ্ধিমান ও করিতকর্মা তরুণ বলেই মনে হয়। ভাবী পত্নীকে উত্যক্ত করার জন্য উদয়ের উপর রাগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। একজনের নক্কারজনক কার্যকলাপের দরুণ পরিবারের সম্মান বারংবার নষ্ট হচ্ছে এটা তার মনে বাসা বেঁধে থাকতে পারে। তার ক্ষেত্রেও উদয় না থাকলে একজন অংশীদার কমে যাবে। সুতরাং মোটিভ বর্তমান। এছাড়া পটাশিয়াম অ্যাকোডা...ডের সহজেই কাছাকাছি পৌঁছাবার সুযোগ একমাত্র এঁরই রয়েছে।

উর্মিলা বাগচী ঃ বড়বোন। মহিলার বাপের বাড়ির প্রতি শুধু দুর্বলতা নেই, আধিপত্যও আছে মনে হয়। ননদ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মেজভাই-এর উপর নিশ্চিত ভাবে চটে ছিলেন। ছোট ভাইকে উসকে দেওয়া অসম্ভব নয়। নিজের চকলেট রং-এর ফিয়েট চড়ে

সেদিন তিনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে পরে কে গাড়ি ব্যবহার করেছে তা জানা থাকলেও অস্বীকার করছেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

লোকেন বাগজী : ব্যক্তিত্বের ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও, ছুঁকছুঁকে স্বভাবের লোক। স্ত্রীকে সমীহ করে চলেন। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে খোলাখুলি ভাবে কোন মতামত দেওয়ার সাহস তাঁর নেই। তবে এই চরিত্রের লোক অনেক সময় মরিয়া হয়ে কিছু করে বসে। মনে রাখতে হবে সহোদরাকে উত্যক্ত করার দরুণ উদয় চৌধুরীর উপর ভদ্রলোকের বিলক্ষণ রাগ ছিল।

রত্না চৌধুরী : পুত্রবধূ। মেজ দেওরের প্রতি মহিলার দুর্বলতা ছিল না মেজ দেওর ওঁকে সাপটে ধরার চেষ্টা করেছিল—এখন তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি এমন অনেক কিছু বলেছেন যা স্বামীকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট। উদয় হত্যাকান্ডর নেপথ্যে এই প্ররোচনা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

শৈবাল পড়া শেষ করে শিটটা সেন্টার টেবিলের উপর রেখে বলল, আমাদের দুজনের লিস্টেই দুই ভাইকে টার্গেট করা হয়েছে। ওদের স্বার্থই সবেচেয়ে বেশি এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাজটা করেছে কে? একা কেউ, না, দুজনে মিলে?

বাসব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ভাববার বিষয়। তবে এক্ষেত্রে আরো একটা কথা আছে ডাক্তার।

—কোন্ কথা?

—সাদা চোখে স্বার্থটা সকলেই দেখতে পাচ্ছে। এত বড় ঝুঁকি, একা দুই ভাই এক সঙ্গে মিলে নেবে কি?

—অনেক সময় কিন্তু এরকম হয়।

—ঠিকই বলছো। মানিকতলার সেই পুড়িয়ে মারার কেসটার কথা ভাবনা তবু মনের কাঁটা সোমনাথ চৌধুরীর দিকেই যেন হেলছে। ভারি ফিশি ক্যারেকটার এখনও ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হয়নি। তবে ঘটনার আরেকটা দিক নিয়ে আমর চিন্তা-ভাবনা করতে পারি।

—কোন্ দিকের কথা বলছো?

—বাড়ির লোকেদের কথা বাদ দিয়ে যদি আমরা ভাবি। আমাদের চেনা জানার মধ্যে দুজন লোক বাঁচছে—প্রদোষ সান্যাল আর রজত মৈত্র।

শৈবাল অবাক হয়ে বলল, প্রদোষ সান্যাল! উনি তো তোমায় অ্যাপয়েন্ট করেছেন।

—অনেক ক্ষেত্রে এটা ডিফেন্সের কাজ করে। উদয় চৌধুরী যে রীমা সান্যালের

কাছে আসা যাওয়া করছে এটা হয়তো উনি বাড়ির চাকরের কাছ থেকে শুনেছিলেন কিংবা প্রতিবেশীদের মধ্যে কারুর মুখ থেকে জানতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসেন বলে ওঁকে কিছু বলেননি। স্ত্রীর অসহায়তাও হয়তো অনুভব করেছিলেন। তারপর পরিকল্পনা করে চিরদিনের মত উদয়কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে, নিজের দাম্পত্য জীবনে শান্তি আনার চেষ্টা করেছেন। মনে রাখতে হবে, প্রদোষ সান্যাল একজন ধনী ব্যক্তি। উঁচু মহলে তাঁর খাতির থাকা বিচিত্র নয়। কাজেই পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়নি।

শৈবাল বলল, এতটা যখন কল্পনা করছোই তখন আরেকটু এগিয়ে যাও। রীমা হয়তো স্বামীকে সব কথা বলেছিল। তারপর দুজনে মিলে এই হত্যা প্রকরণের পরিকল্পনা ছকে নিয়েছে। তবে আমার মন বলছে, এরকম হয়নি। ব্যাপারটা অন্য খাতে বইছে।

বাসব এতক্ষণ পরে আবার পাইপ ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমি সম্ভাবনার কথা বললাম। এরকম হলেও হতে পারে। আমার মনও বলছে, ব্যাপারটা এত সরল নয়। কোথাও একটা ঘোরাল প্যাঁচ আছে। সেই প্যাঁচটার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

এই সময় টেলিফোনের ঝনঝনানি কানে এল।

বাসব সোফা ছেড়ে উঠে, হোয়াটনটের কাছে এগিয়ে গেল। ক্রেডেল থেকে তুলে নিল রিসিভার।

—হ্যালো...ব্যানার্জী স্পিকিং—

অপর প্রান্ত থেকে গলা ভেসে এল, আমি উজ্জ্বল চৌধুরী কথা বলছি...যোগাযোগ করতে একটু দেরি করে ফেললাম...

বাসব : তেমন কিছু নয়...খোঁজ খবর নিয়েছিলেন...

উজ্জ্বল : হ্যাঁ...কলকাতার তিনটে প্রতিষ্ঠানে ঐ আইটেম পাঠানো হয়...এদের লাইসেন্স আছে...

বাসব : ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির নাম কি...

উজ্জ্বল : ন্যাশানাল ড্রাগসেন্টার...ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল ইনিস্টিউট...ইন্ডিয়ান ফার্মা ফোরাম...

বাসব : ঠিকানা...

উজ্জ্বল : টেলিফোন ডিরেক্টিতে পেয়ে যাবেন...ভারতের আরো তিনটি প্রদেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়...যদি বলেন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির...

বাসব : না...আর কোন নাম ঠিকানার প্রয়োজন হবে না...ধন্যবাদ উজ্জ্বলবাবু...অনেক উপকার করলেন...এখন ছাড়ছি...শুভরাত্রি...

বাসব রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার সোফায় এসে বসল।

শৈবাল প্রশ্ন করল, কে ফোন করছিল?

—উজ্জ্বল চৌধুরী। পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড কলকাতার যে তিনটে প্রতিষ্ঠানকে রা সাপ্লাই করে তার নাম জানিয়ে দিল। কাল খোঁজ খবর নিতে হবে।

—সুবিধা করতে পারবে কি?

—চেষ্টা করে দেখতে তো হবে। ডাক্তার তোমার কি মনে হচ্ছে না বহুক্ষণ আমরা গলায় কিছু ঢালিনি। দেখতো বাহাদুর কি করছে। চা বা কফি কিছু আনতে বলো।

শৈবাল উঠে দাঁড়াল।

পরের দিন সকালে বাসব আটটার মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিল। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসল। তিনটে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা টেলিফোন ডিরেক্ট্রি থেকে সংগ্রহ করে রেখেছে। বেলা বাড়লে একে একে তিন জায়গাতেই যাবে। যাবে একাই। কারণ শৈবাল আজ মেডিক্যাল কলেজে আটকে থাকবে।

সওয়া নটা, আন্দাজ সময় সোমনাথ চৌধুরী দেখা দিলেন। কিন্তু কিন্তু ভাব। গতকাল সন্ধ্যায় আসতে পারেন নি তাই বোধ হয়। বাসব ওঁকে বসাল। বাহাদুরকে ডেকে চা আনার আদেশ দিল।

সোমনাথ বললেন, গত সন্ধ্যায় এমন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম, আসা হল না। সকালেই তাই চলে এলাম।

—ভালই করেছেন। অবশ্য আর কিছুক্ষণ পরে এলে দেখা হত না। শুনুন মিঃ চৌধুরী, এই তদন্তের ব্যাপারে আপনার যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে তবে খোলা মন নিয়ে সহযোগিতা করুন।

—আগে হলে কি করতাম জানি না। তবে এখন মনে হচ্ছে রীমা এই খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে নেই। আমি চাই অপরাধী কাস্টডিতে গিয়ে ঢুকুক। তবে বুঝতে পাচ্ছি না, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করবো।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠেসে নিয়ে বলল, সাহায্য বা সহযোগিতার অর্থে আমি বলতে চেয়েছি, এড়িয়ে না গিয়ে আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবেন।

—আমি যা জানি তাই বলবো।

—বেশ। আপনার ভাইপো উদয় শুধু উচ্ছৃঙ্খল নয়, পরিবারের সম্মান নষ্ট করে ফেলছিল নিশ্চয় স্বীকার করবেন?

—হ্যাঁ। তার কাণ্ডকারখানায় আমরা আতান্তরের মধ্যে ছিলাম।

—বোঝা-স্বরূপ এমন ছেলেকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়নি কেন?

ইতস্তত ভাবে সোমনাথ বললেন, দাদা তাই চাইছিলেন। উদিতেরও এই রকম ইচ্ছে ছিল। আমিই বারংবার বাধা দিয়েছি।

—কেন?

—ছেলেবেলা থেকেই ওকে আমি ভারি স্নেহ করতাম। যৌবনে পা দেবার পর থেকেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে মন সায় দিত না। সব সময় ওকে ভাল রাস্তায় আনবার চেষ্টা করতাম।

—শুনেছি টাকা পয়সা দিতেন।

—দিতাম।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

—আপনি আগেই বলেছেন, রীমা সান্যাল এই খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে নেই। কাজটা কে করেছে বলে আপনার মনে হয়?

—কে করেছে জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি বাড়ির লোকেদের হাত নেই।

—কি ভাবে বলছেন একথা?

—এত পরিকল্পনা করে কাউকে খুন করার মানসিকতা বলুন—চাতুর্য বলুন, আমাদের কারুর নেই।

বাহাদুর চা দিয়ে গেল।

পেয়ালা তুলে নিল দুজনে।

কয়েক চুমুক দেবার পর বাসব বলল, আপনার বাকী দুই ভাইপোর মোটিভ কিন্তু রয়েছে। শুধু ঝামেলা কমে যাবে না, একজন অংশীদারও কমে যাবে। এমন কি হতে পারে না, ওঁরা কেউ লোক লাগিয়ে এই কাণ্ডটা করেছেন?

—না। এমন হতে পারে না।

—জোর দিয়ে কি ভাবে বলছেন কথাটা।

নির্বিকার ভঙ্গীতে সোমনাথ বললেন, আমার ভাইপোদের আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি জানি। ওরা আর যাই হোক, স্বার্থেব খাতিরে নিজের সহোদর ভাইকে খুন করবে না।

—এধারটা যা হোক হল। এবার কিছু ব্যক্তিগত কথায় আসা যাক। আপনি তো বিয়ে করেন নি। বয়স অনেক বেড়ে গেছে। এখন নিশ্চয় বিয়ে করে ছেলে-মেয়ের বাপ হতে চাইবেন না। আপনার অংশে যে বিষয় সম্পত্তি আছে, আপনার অবর্তমানে ওয়ারিশন কে হবে?

—বছর কয়েক আগেই এ সমস্যার সমাধান করে রেখেছি? মারা যাবার পর আমার অ্যাটর্নি জানিয়ে দেবে আমি কি বিলি ব্যবস্থা করে গেছি।

—অর্থাৎ এখন আপনি বলতে চাইছেন না।

—ও প্রসঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ক্ষমা করবেন।

—ঠিক আছে। প্রসঙ্গান্তরে তাহলে যাওয়া যাক। আপনারা বড় বড় টিম্বারের লট কেনেন। তারপর বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত গুদামে রাখেন। গুদামটা কোথায়?

এই প্রশ্নের তাৎপর্য কি বুঝে উঠতে পারলেন না সোমনাথ। উদয়ের হত্যার সঙ্গে এই ধরনের প্রশ্নের সম্পর্ক কি? অবশ্য কোন প্রশ্ন তুললেন না। সরল ভঙ্গীতেই যথাযথ উত্তর দিলেন।

—আমাদের দুটো বিশাল বিশাল গুদাম আছে। ওখানে একটা ছোট অফিসও আছে। ট্যাংরা অঞ্চলে—।

—গুদাম দুটো দেখাশুনা করে কে?

—দাদা আর আমি। তবে ইদানিং দাদা তেমন ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন না। ওঁর এখন সময় কাটে বইপত্তর নিয়ে।

—এর মানে দাঁড়াল গুদামের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার হাতেই।

—বলতে পারেন।

বাসব এবার নির্বিকার গলায় বলল, আড়াই লাখ টাকার কাঠ ওখান থেকে চুরি গেছে—আপনি সময় মত তো সকলকে জানান নি কথাটা।

সোমনাথ অবাক হয়ে বাসবের দিকে তাকালেন।

—চুরির কথা কে বলেছে আপনাকে?

—আপনার দাদা। উদয়ের মারা যাবার আগে কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়নি। এর কারণটা কি?

—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—যে মুহূর্তে আপনি জানতে পারলেন চুরির ব্যাপারটা—মনে রাখতে হবে আড়াই লক্ষ টাকা ছোটখাটো অ্যামাউন্ট নয়, সঙ্গে সঙ্গে জানাজানি হল না কেন? এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা ঘটল না কেন বলুন তো?

একটু থেমে সোমনাথ বললেন, উদয়কে ব্যস্থ্ রাখার জন্য মাস কয়েক ধরে ওখানে নিয়ে যাচ্ছিলাম। ও যে ক্রমে ক্রমে এই কান্ড বাধিয়ে বসে আছে, বুঝতে পারলাম অনেক পরে। তখন বলতে সাহস হয়নি। রাগের মাথায় দাদা হয়তো ছেলেটাকে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দিতেন। ও মারা যাবার পর বলেছিলাম।

—শুনে, উমানাথবাবু কি বললেন?

—উনি রাগারাগি করলেন। তারপর বললেন, আগে জানলে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেন। এইভাবে মারা পড়তো না। কিংবা মারা পড়লেও, কোথাও পড়ে থাকতো আমরা জানতেও পারতাম না। একদিক থেকে তা ভাল ছিল।

বাসব ভ্রূ কুঁচকে কি ভেবে নিল।

বলল তারপর, দলিল দস্তাবেজের ব্যাপারটা কি?

—আমি আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—এক সুটকেস বৈষয়িক কাগজের সন্ধানে আপনি সান্যালদের ব্যান্ডেলের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐ ব্যাপারে আমার আগ্রহ রয়েছে।

সোমনাথ যেন কূল পেলেন।

দ্রুত গলায় বললেন, ও, আপনি জানতে পেরেছেন। বিশ্রী ব্যাপার মশাই, অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের।

—ক্ষতি হবে কেন? দলিল দস্তাবেজের নকল তো রেজিস্ট্রি অফিসে পাওয়া যায়। সার্টিফায়েড কপির ব্যবস্থা করুন।

—আসল কথা হল, ঐ দলিলগুলোর সঙ্গে কয়েকটা হ্যান্ডনোটও ছিল। দাদা সুদের কারবারও করেন।

—ঐ হ্যান্ডনোটগুলো পাওয়া না গেলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা সুদ দূরের কথা, আসল টাকাও দিতে চাইবে না—পরিস্থিতি এখন এইরকম দাঁড়িয়েছে কি বলেন?

—আপনি ঠিকই বলছেন।

—কত টাকার হ্যান্ডনোট ছিল?

—আট লাখ টাকার কিছু বেশি।

বাসব বলল, এই সমস্ত জরুরী কাগজপত্র সুরক্ষিত ভাবে থাকাব কথা। উদয়েব মত মার্কামারা লোকের হাতে গেল কিভাবে?

—দাদার অফিস ঘরের স্টিল আলমারিতে ইম্পর্টান্ট কাগজপত্র থাকে। উদয় কিভাবে চাবি হাতিয়েছিল বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

—আপনার দাদাও ব্যাপারটা জানতেন না। আমি ওঁকে বললাম। এ প্রসঙ্গে ওঁর সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছে?

—গতকাল আপনার উপস্থিতিতেই উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বকাঝকা করলেন। তারপর স্টিল আলমারি খুলে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতেই বুঝতে পারা গেল আটটা হ্যান্ডনোট নিখোঁজ।

—চাবি থাকতো কার কাছে?

একটা দাদার কাছে থাকতো, একটা আমাব কাছে।

—আপনি কিভাবে বুঝলেন, আলমারি থেকে কাগজপত্র নিখোঁজ হয়েছে? সোমনাথ রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বললেন, মামলার ব্যাপারে একটা দলিলের দরকার ছিল। সেটা বার করতে গিয়েই লক্ষ্য করলাম কয়েকটা দলিল নেই। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর মনে পড়ল দাদার চাবিটা পাওযা যাচ্ছিল না। উদয়কে শেষবার যখন দেখি তখন ওর হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল।

—আপনি হিসাবটা মিলিযে ফেললেন। হারিয়ে যাওয়া চাবির সাহায্যে উদয় কাজ সেরেছে। ব্রিফকেসে ওগুলো ভবে নিযে কোথাও গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। পুলিশ হোটেলে উদয়ের সুটকেসেব সন্ধান পেয়েছে। ব্রিফকেস উধাও। আপনারা যাই বলুন, এটা সত্যি, রীমা সেদিন হোটেলে ছিল। আব ধারণা হল, যে কেন কারণেই হোক রীমা ব্রিফকেসটা নিয়ে গেছে। ওখানে তাই গিয়েছিলাম।

—ব্রিফকেসটা নিয়ে গিয়ে থাকলে উনি ফিরিয়ে দেবেন এই ধারণা আপনার ছিল?

—চেষ্টা কবে দেখাটা দোযেব নয়।

—নিশ্চয় নয়। তবে এক্ষেত্রে একটু অদ্ভুত মনে হবে। কারণ রীমা সান্যাল উদয়ের সঙ্গে হোটেলে ছিলেন না, এই পয়েন্টেই স্ট্যান্ড করে রয়েছেন! যাহোক, একটা ব্যাপারের কিন্তু কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কোন্ ব্যাপারের?

—এই প্রথম বিষয়টা আপনার উমানাথবাবুকে জানানো উচিত ছিল। তা না করে আপনি দৌড়লেন ব্যান্ডেলে! এর মানে কি?

ইতস্তত ভাবে সোমনাথ বললেন, অসম্ভব বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম, আগে ব্যান্ডেলে গিয়ে খোঁজ খবর করি।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

—আপনি তো ব্যান্ডেলে বাই কার গিয়েছিলেন। চকলেট রং-এর ফিয়েট নয় কি?

—হ্যাঁ। প্রিমিয়ার পদ্মিনী।

—গাড়িটা কার?

—আমার ভাইঝির। আমার গাড়ি ট্রাবল দিচ্ছিল। কারখানায় পাঠিয়েছি। উর্মিলা সে দিন সকালে এল আমাদের বাড়ি। আমি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

—দুর্ঘটনার দিন উর্মিলা বাগচী বাপের বাড়ি এসেছিলেন। সেদিন ওঁর গাড়িটা নিয়ে কে বেরিয়েছিল বলতে পারেন?

একটু ভেবে নিয়ে সোমনাথ বললেন, ওর গাড়িটা কেউ ব্যবহার করেছিল কিনা বলতে পারবো না। আমি দুপুরে কাজে বেরিয়েছিলাম।

—এ সম্পর্কে কারুর কাছ থেকে কিছু শুনেছেন?

—না।

—অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। এখন আর কোন প্রশ্ন নেই। ধন্যবাদ।

সোমনাথ বিদায় নিলেন।

আধ ঘন্টার মধ্যেই বাসবও বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। জওহরলাল নেহরু রোড-এ এসে বাস ধরল। নামল লেনিন সরণীর মোড়ে। তারপর কয়েক পা হেঁটে পৌঁছাল প্যারাডাইস সিনেমা হলের সামনে। ওখানেই প্রাক্তন গুন্ডা এনায়েতের পান-সিগারেটের দোকান। বহুবার এনায়েত নানা তদন্তে বাসবকে সহযোগিতা দিয়েছে।

এনায়েত দোকানে বসেই এক ধরনের লম্বা বিড়ি টেনে যাচ্ছিল। বাসবকে দেখে, বিড়ি ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে নেমে এল। সময়োচিত হাসিতে মুখ ভাসিয়ে সেলাম জানাল।

—কেমন আছেন সাব?

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, খুব ভাল নেই। একটা মামলার কুলে পৌঁছতে পারছি না। বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে।

—আমি কি কোন কাজে আসতে পারি না সাব?

—তাই তো তোমার কাছে এলাম। তোমার অবশ্য কিছু সময় নষ্ট হবে। কাজটা একটু ঘোরাঘুরির।

একগাল হেসে এনায়েত বলল, কোন অসুবিধা হবে না। ভাইপোকে দোকানে বসিয়ে দেব সাব। ছোঁড়াটা সব শিখে ফেলেছে।

—একটা লোককে চিনিয়ে দেব। তার হাঁড়ির খবর তোমায় বার করতে হবে। তবে সে যেন কিছুই বুঝতে না পারে।

—একেবারেই বুঝতে পারবে না। এনায়েত শেখ রদ্দুরে চুল পাকায়নি সাব। কখন আপনার কাছে আসবো বলুন?

—তোমার অসুবিধা না হলে এখনই যাওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক, কি বল?

কথা শেষ করেই বাসব ওর হাতে একশ টাকার একটা নোট দিল।

এনায়েতকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, রেখে দাও। মক্কেলের টাকা। তোমার

আরো পাওনা হবে।

নোটটা হাতে নিয়ে এনায়েত গলা তুলল।

—করিম—বেটা করিম, দু'গেলাস চা নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি করে আন। বেরুতে হবে।

বেলা তিনটের সময় বাসব আবার বাড়ি থেকে বেরুল। এনায়েতের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়েছে বেলা সাড়ে এগারটার সময়। যাকে চিনিয়ে দিতে হবে তার বাসস্থানের কাছাকাছি একটু আড় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি এক সময় সেই ব্যক্তি কাজে যাবার তাগিদে বাড়ি থেকে বেরুল—এনায়েত ভালভাবে তাকে দেখে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বাসব পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছাল। ওল্ডস মোবাইল থামাল রাস্তার আধা-আধি যাবার পর। ঠিকানা খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হল না। সেকেলে ধাঁচের একটা পুরো বাড়ি নিয়েই ন্যাশনাল ড্রাগ-সেন্টার। কাচের পাল্লা ঠেলে বাসব ভেতরে গেল।

এনকোয়ারী লেখা কাউন্টারের সামনে একজন মধ্যবয়স্ক লোক বসে আছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুকের দিকে।

কোন ভূমিকা না করে বাসব বলল, আমি ডায়রেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিশেষ প্রয়োজন।

মধ্যবয়স্ক প্রশ্ন করল, কোথা থেকে আসছেন?

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল।

—হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে।

—উনি দেখা করবেন কিনা জানি না। স্লিপে নাম আর পরিচয় লিখে দিন। দেখছি কি বলেন।

বাসব নিজের কার্ড এগিয়ে ধরল।

কার্ড নিয়ে একজন বেয়ারা ভেতরে চলে গেল। ডায়রেক্টার সাহেব কি রকম মেজাজের লোক এটাই এখন প্রশ্ন। বেয়ারা ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে। সাহেব দেখা করবেন। বাসব বেয়ারাকে অনুসরণ করে দোতলায় পৌঁছাল। প্রথম ঘরখানাই ডায়রেক্টার'স চেম্বার। সুইংডোরের উপর লেখা আছে বেশ মোটা অক্ষরে, ডাঃ প্রশান্ত মুখার্জি।

পাল্লা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল বাসব। বেশ বড় ঘর। আধুনিক কায়দায় তৈরি বিশাল সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে ওধারে সুইভেল চেয়ারে বসে আছেন এক সৌম্য দর্শন ব্যক্তি। বয়স পঁয়তাল্লিশের উপরে নয়। টেবিলের উপর রাখা চশমা তুলে নিয়ে পরে নিলেন।

—বসুন। আপনার নাম সংবাদপত্রে মাঝে-মধ্যে আমি দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কি প্রয়োজনে এখানে এলেন।

বেশ ভারি গলা ভদ্রলোকের।

বাসব সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। একটা জটিল খুনের তদন্ত বর্তমানে আমার হাতে রয়েছে। সেই সম্পর্কেই এখানে আমার আসা। কিছু জেনে নেওয়ার ব্যাপার আছে।

ডাঃ মুখার্জি আঁতকে উঠলেন।

—বলেন কি? আমরা তো গবেষণা নিয়ে থাকি। কিছুই বুঝতে পারছি না?

—আপনার জায়গায় আমি থাকলেও অবাক হতাম। আসল কথাটা হল, অনুমান করা যাচ্ছে, হত্যাকারী পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড ব্যবহার করেছিল। বস্তুটা দুর্লভ।

—তাতো বটেই। তবে—

—কলকাতায় এমন তিনটে প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে সাপ্লাই করা হয়। তাই এখানে এসেছি আপনাদের কাছ থেকে লিক হবার সম্ভাবনা আছে কি না জেনে নিতে। বিষয়টা ভারি প্রয়োজনীয়। হোমডিপার্টমেন্টের সমর্থন আমাব আছে বুঝতেই পারছেন। এখন আপনার সদিচ্ছার উপবই সমস্ত কিছু নির্ভবশীল।

ডাঃ মুখার্জি কি যেন চিন্তা কবে নিলেন।

—দেখুন, লিকের সম্ভাবনা থাকলে আমি স্বীকাব করতাম না। এটাই স্বাভাবিক। তবে আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট সিওর থাকুন এখান থেকে সিকি গ্রেনও পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড বাইরে যাবার সম্ভাবনা নেই। বরং যে সাপ্লাই পাওযা যায তাতে আমাদের কাজ চলে না। মাঝে মধ্যেই চড়া দামে অন্য জাযগা থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

বাসব অবাক হয়ে গেল।

এই তাহলে ব্যাপার।

—সংগ্রহ করার মাধ্যম সম্পর্কে কাইন্ডলি কিছু বলবেন?

—বিষ্ণুবর্ধন নামে একজন আছে। লোকটা বাঙ্গালী কি অন্য কোন জাতের বোঝা মুশকিল। ওর কাছ থেকেই মালটা আমরা পাই।

—কোথায় থাকে বিষ্ণুবর্ধন?

টেবিলের উপর থেকে অ্যাড্রেস বুকটা তুলে নিলেন ডাঃ মুখার্জি।

ঠিকানাটা দেখে নিয়ে বললেন, ২৭/বি, বামকিশোর বর্মন স্ট্রীট। নর্থের দিকে। মনে হয় ঐ লোকটা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।

—অনেক ধন্যবাদ। এবার উঠি।

—ঘটনা সম্পর্কে তো কিছুই বললেন না। আগ্রহ নিয়ে থাকলাম। সম্ভব হলে পরে জানাবেন।

—কেস হ্যারাহেরি হয়ে গেলে আপনাকে সমস্ত কিছু জানাবো। বেশ কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। কি ভাবে গড়ায় দেখি।

বাসব বিদায় নিল।

তখন আটটা।

বাসব অনেকক্ষণ ধবে পায়চারী করে চলেছে। নানা ধরনের চিন্তা মনেব আনাচে কানাচে জট পাকাচ্ছে। এক সময় জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাল বোধ হয় পূর্ণিমা। পুবের আকাশে চাঁদ হাসছে। এক সময় ওর তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। কেউ এসেছে ঘরে। ফিরে দাঁড়াতেই শৈবালকে দেখতে পেল। জানলার কাছ থেকে সরে এসে বলল, আজ তোমার আসতে এত দেরি হল ডাক্তার?

—আজ কাজের চাপ ছিল। সোজা মেডিকেল কলেজ থেকে আসছি। তুমি কত দূর এগুলে?

—এখনও হামাগুড়ির স্টেজেই আছি। আজ গিয়েছিলাম ন্যাশনাল ড্রাগ সেন্টাব-এ। ওদের কাজ থেকে অবশ্য কাজের কথা কিছু জানতে পারিনি। তবে কাজ হতে পারে এমন একটা সূত্র পেয়েছি।

—কি রকম?

ডক্টর মুখার্জির সঙ্গে যা কথা হয়েছিল, বলল বাসব।

শোনার পরে শৈবাল বলল, বাকী দুটো প্রতিষ্ঠানে আর যাবার দরকার নেই। কাজে লাগে এমন কিছু ওখান থেকেও জানতে পারবে বলে মনে হয় না। বিষ্ণুবর্ধনকেই চেপে ধবতে হবে।

—কাল্ সকালেই যাচ্ছি ওর আস্তানায়।

—লোকটা তোমাকে সহযোগিতা দেবে কিনা এটাই হল প্রশ্ন।

বাসব হেসে ফেলল।

—তুমি ঠিকই বলছো। একা গেলে সে আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। তাই তো একা যাব না। সঙ্গে থাকবেন হোমিসাইডের বড়কর্তা। সামন্তসাহেবের সঙ্গে দুপুরে কথা বলেছি। উনি রাজী আছেন। এদিকে এনায়েতকে লাগিয়েছি একজনের পিছনে।

—এনায়েত কাজের লোক। কিন্তু ওকে লাগিয়েছো কার পিছনে?

ঠিক এই সময় এনায়েত শেখকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল। দুজনকে সেলাম জানিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে বসল সোফায়। মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যায় সাফল্যের চাবিকাঠি হাতে নিয়েই উদয় হয়েছে।

মুখে হাসি টেনে এনায়েত বলল, লোকটার ঘাঁটি দেখে এসেছি সাব।

বাসব বলল, এসমস্ত কাজে তুমি ভারি ধুরন্ধর আমি জানি এনায়েত। আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তুমি কি ভাবে এগুলে সেই কথা থেকেই আরম্ভ করো।

—লোকটা মোড়ের মাথায় এসে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আমি তার কয়েক হাত পিছনে ছিলাম। মনে হয় ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। শেষে বাসে চড়লো। আমিও রইলাম। তারপর দুবার বাস বদল করে ট্যাঙরায় পৌঁছাল। বিরাট কাঠের আড়ত। ওখানে লোকটা রইল বেলা চারটে পর্যন্ত।

—দাঁড়াও। দুপুরের খাওয়াটা সারলে কোথায়?

—ঐ কাঠের আড়তের কাছেই অনেকগুলো দোকান আছে। আধ কেজি দই

খেলাম সাব। দুধ বলুন বা দই বলুন, আমাকে বেশ তাজা রাখে।

—তারপর কি হল বল?

—লোকটা আড়ত থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বৈশালী সিনেমার কাছে এসে থামল। ওখানে অনেক অটো-রিকসা দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচজন করে প্যাসেঞ্জার নেয়। একটাতে চেপে বসল। আমিও বসলাম ওর পাশে। নামল শেয়ালদা কোর্টের সামনে। তারপর বড় রাস্তা পেরিয়ে গোপাল বোস লেনে ঢুকল। থামল গিয়ে পুরানো ধাঁচের একতলা একটা বাড়ির সামনে। এখন ওই বাড়িতেই আছে সাব।

—কি ভাবে বুঝলে?

—ঐ বাড়ির কাছেই একটা সিগারেটের দোকান আছে। দোকানদারকে পাঁচ টাকা দিতেই মুখ খুলল। বাড়িটা ঐ লোকটারই। তবে নিয়মিত থাকে না। হপ্তায় বার তিনেক আসে। থাকে রাত ভোর। বাড়িতে বৌ আর বছর দশেকের একটা ছেলে আছে।

বাহাদুর তিন কাপ চা রেখে গেল।

পেয়ালা তুলে নিয়ে বাসব বলল, চমৎকার কাজ করেছো। অবশ্য অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছে তোমাকে। ওখানে তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাওয়া যাবে। এবার একজনের নাম করছি, চিনতে পারো কিনা দেখ?

—কার কথা বলছেন সাব?

—লোকটার নাম বিষ্ণু বর্ধন। চেন তাকে?

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিত গলায় এনায়েত বলল, এ নামের কাউকে তো জানি না সাব। নতুন কেউ হবে। ছিনতাই টিনতাই করে—

—না। স্মাগল্ করা ওষুধ বিক্রী করে।

—থাকে কোথায়? ঠিকানা পেয়েছেন?

—কলুটোলা অঞ্চলে। রামকিশোর বর্মন স্ট্রীট।

—কলুটোলায় পান্না ওস্তাদ থাকে। ও সকলকেই চেনে। ভারি ওজনদার লোক। ওর কাছে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে।

—তাই নাও। সকালে তোমার দোকানে আসছি।

চা-এর পেয়ালায় শেষবার চুমুক দিয়ে এনায়েত বলল, ঠিক আছে সাব।

এনায়েত চলে যাবার পর শৈবাল বলল, তুমি তো বললে সামন্তসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণু বর্ধনের কাছে যাবে। আবার—

—বোঝার চেষ্টা কর ডাক্তার—বাসব বলল, পুলিশ সঙ্গে থাকলে সে সব সময় মনোমত কাজ হবে তার কোন মানে নেই। তাই দু দিকটাই বাজিতে দেখতে চাই। আমার নিশ্চিত ধারণা, এই বিষ্ণু বর্ধনই আমাদের আসল পথ দেখাবে।

—আমারও তাই মনে হয়। নইলে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড লিক করার আর তো কোন পথ দেখা যাচ্ছে না।

অভাবনীয় ভাবে এই সময় রীমা, প্রদোষ আর রজত এসে উপস্থিত হল। বাসবের ড্রইংরুম যেন ভরে উঠল। জানা গেল, সান্যালরা দুপুরের দিকে এসেছিল

কলকাতায় কিছু কেনাকাটা করতে। তারপর গিয়েছিল চেতলায়। তারপর রজতকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে।

প্রদোষ বলল, একটা ভয় মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। সেই কারণেই আমরা আপনার কাছে এলাম।

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার নিয়ে পাইপে ঠাসতে ঠাসতে বলল, কি ধরনের ভয়ের কথা বলছেন?

—পুলিশ যদি কোর্টে চার্জশিট দিয়ে দেয়, মামলা তো আরম্ভ হয়ে যাবে। ভারি ঝামেলার ব্যাপার হবে নাকি?

—নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশিট আদালতে প্রস্তুত করাই হল নিয়ম! আপনারা চিন্তা করবেন না। পুলিশের উপর মহলে আমি কথা বলে রেখেছি। তাছাড়া এই তদন্তের নিষ্পত্তি কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করছি।

রজত বলল, আপনি তাহলে বেশ কিছুটা এগিয়েছেন।

—তদন্ত হাতে নেবার পর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা আমার স্বভাব নয়। মক্কেলের মনে চাপ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, ডাক্তার, এক রাউন্ড কিছু হলে কেমন হয়? দেখ না বাহাদুর কি করছে।

শৈবাল বলল, দেখার দরকার নেই। ইতিমধ্যে বাহাদুর উঁকি মেরে গেছে।

সকলে হেসে ফেলল।

রীমা বলল, ওসব হাঙ্গামা আর করবেন না। আমরা বরং—

—ব্যান্ডেলে ফিরতে দেরি হবে বুঝতে পারছি—বাসব বলল, তবু কিছুক্ষণ বসুন। আপনারা যখন এসে পড়েছেন, গোটা কতক কথা জেনেনি। রজতবাবু—

—বলুন?

—রিপন স্ট্রীটের বার-এর সামনে সেদিন যে গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন ওটা ফিয়েট-এর—

—প্রিমিয়ার পদ্মিনী মডেলও ইদানিংকার।

—ঐ-সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন?

রজত ভাবতে লাগল।

শেষে বলল, আর তো কিছু মনে পড়ছে না।

—উদয়ের হাতে তখন কোন ব্রিফকেস বা সুটকেস ছিল?

—না।

—গাড়িতে আগে থেকে যে বসেছিল তাকে লক্ষ্য করেননি বলছেন। আচ্ছা, সেকি ড্রাইভিং সিটে ছিল না, পিছন দিকে?

বাহাদুর সকলকে চা পরিবেশন করে গেল।

রজত বলল, ড্রাইভিং সিটে। উদয় এসে সামনের দিকের পাশের সিটে বসেছিল।

এবার সকলে পেয়ালা তুলে নিল।

রীমা বাসবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আমরা পরিশ্রান্ত করে তুলেছি

মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার উপর নির্ভর না করেও উপায় নেই।শেষ পর্যন্ত—

—শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতবো—বাসব বলল, আতান্তর, পরিশ্রম এসবের জন্য পিছিয়ে গেলে আমার চলবে না, অভিজ্ঞতা এটাই আমায় শিখিয়েছে। এবার আপনি একটা প্রশ্নেব উত্তর একটু ভেবে চিন্তে দিন।

—কোন্ বিষয় জানতে চাইছেন?

—সোমনাথ চৌধুরী সেদিন ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে। ঐ প্রথমবার না, আগেও তাঁর সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছে।

রীমা বলল, বিয়ের আগে যতদূর মনে পড়ছে বার দুয়েক কথা হয়েছে।

—প্রসঙ্গটা কি?

—দুবারই কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একবাব উদয় চৌধুরী সম্পর্কে আমাকে সাবধান করেছিলেন।

—দ্বিতীয়বার?

—উদয় নিজেব বৌদির সঙ্গে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়তে চাইছে একথাই বলেছিলেন।

—আশ্চর্যজনক ঘটনা। আপনার মত অবিবাহিত অল্পবয়স্কা মেয়েকে পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে বললেন?

—তাইতো বলেছিলেন। এই সমস্ত শুনেই তো আমি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। মাকে বললাম সব কথা। তারপরই বাবা আমাকে মামার বাড়ি পাঠিযে দিলেন।

—উনি সেদিন প্রকারান্তরে আপনার উপকারই করেছিলেন। যাহোক, উনি যে গাড়ি চড়ে ব্যান্ডেলে গিয়েছিলেন এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

—আগেই তো আপনাকে জানিয়েছি চকলেট রং-এর একটা গাড়ি।

প্রদোষ বলল, ফিয়েট। বলেছিলাম তো আপনাকে।

—বলেছিলেন বটে। নম্বরটা দেখেননি। মডেলটা—

—কোন্ সালের মডেল অনুমান করা কঠিন। তবে প্রিমিয়ার পদ্মিনী।

—আপনি ও রজতবাবু যদি নম্বরটা মনে রাখতেন, তবে বোঝা যেত দুটো আলাদা আলাদা না, একই গাড়ি।

এরপব ও প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করল না বাসব।

কয়েক মিনিট পরে ওরা বিদায় নিল।

শৈবালের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, সোমা তো কলকাতায় নেই। রাতটা এখানেই থেকে যাও ডাক্তার। অনেক আলোচনা আছে।

—তবু বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

শৈবাল ফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

রামকিশোর বর্মন স্ট্রীট অল্প চেষ্টাতেই খুঁজে পাওয়া গেল। গাড়ি সদর রাস্তাতেই রেখে আসা হয়েছে। এই অঞ্চলের একজন সাব ইন্সপেক্টারকে সঙ্গে আনা হয়েছে কাজের সুবিধার জন্য। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে বাসব দেখল, একটা বড় আকারের

দর্জির দোকান। জন সাতেক লোক এক মনে কাজ করছে। পুলিশ দেখে সচকিত হওয়াই স্বাভাবিক।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, বিষ্ণু বর্ধন কার নাম?

একজন ত্রস্ত ভাবে বলল, উনি ভেতরে আছেন স্যার।

—ডাকো—

ওধারে একটা পর্দা ঝোলানো দরজা ছিল। পর্দা সরিয়ে একজন ভেতরে চলে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি শোভিত, ঘিয়ে ভাজা চেহারার একটা লোক বেরিয়ে এল। বিশেষত্বহীন মুখ। এখন অবশ্য কিছুটা সচকিত ভাব।

দ্রুত এগিয়ে এসে বিনীত ভঙ্গীতে বলল, আমি বিষ্ণু বর্ধন। বলুন স্যার—

সামন্ত বললেন, কিছু কথা আছে। নিরিবিলিতে বলতে চাই।

—আসুন স্যার। ভেতরে আসুন—

বিষ্ণু বর্ধন সকলকে সঙ্গে নিয়ে পর্দা সরিয়ে ভেতরে গেল। ঘরখানা বেশ বড়ই। একধারে একসেট সোফা। সেন্টার টপও আছে। অন্যধারে অজস্র কাপড়ের পিস ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছু গাদাগাদি করে রাখা রয়েছে। কেমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে। সামন্ত বাসব ও সাব ইনস্পেক্টারকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন সোফায়। বিষ্ণু বর্ধন দাঁড়িয়ে রইল।

সামন্ত বললেন, একটা এনকোয়ারিতে এসেছি। যা জানতে চাইবো তার সঠিক উত্তর দিলেই ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

বিষ্ণু বর্ধন স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার জানা থাকলে সঠিক উত্তর দেব স্যার।

—আমরা জানতে পেরেছি, আপনি স্মাগলিং করেন। আন্ডার ওয়ার্লডে অবাধে যাতায়াত করে থাকেন।

—আপনাদের কেউ ভুল সংবাদ দিয়েছে স্যার। শত্রু কার নেই বলুন? আমি খেটে খাওয়া লোক। টেলারিংশপ আছে। এছাড়া—

—এছাড়া কি?

বিষ্ণু বর্ধনের মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই।

সে সহজ ভাবেই বলল, নেপাল থেকে বিদেশী কাপড় চোপড়, বা অন্যান্য জিনিষ কিনি। তারপর দাম বাড়িয়ে বিক্রী করি। ঐ দেখুন না, ঘরের ওধারেই ঐ সমস্ত মাল রাখা রয়েছে। এর অবশ্য লাইসেন্স নেই স্যার। এরজন্য যদি—

সামন্ত ধমকে উঠলেন।

—থামুন। ওভার স্মার্ট হবার চেষ্টা করবেন না। বিদেশ থেকে ওষুধ আনিয়ে আপনি এখানে বিক্রী করেন না?

—না স্যার। এত ক্যাপিটাল আমার কোথায়?

—আমরা খবরাখবর নিয়েই এসেছি। ন্যাশানাল ড্রাগ সেন্টার-এর ডাঃ মুখার্জি আপনার কাছ থেকে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড মাঝে মধ্যে কিনে থাকেন।

—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা স্যার। ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম জীবনে শুনিনি। কোন ডাঃ

মুখার্জিকে জানি না পর্যন্ত। ইচ্ছে করলে, আমার ঘরদোর সার্চ করে দেখতে পারেন। একফোঁটা ওষুধ কোথাও পাবেন না।

বাসব বুঝতে পারছিল, লোকটা অসম্ভব ঘোড়েল! ব্যবস্থা আগেই করা আছে। সার্চ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে যতই চাপ দেওয়া হোক না কেন, লোকটার মুখ থেকে দরকারী কোন কথা বার করা যাবে না। কারণ লোকটা নিশ্চয় অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে ওদের এখানে আসাটা বিচার করেছে।

এতক্ষণ পরে বাসব বলল, দেখুন, আপনি বিদেশী ওষুধ স্মাগল করে কেথায় কিভাবে বিক্রী করেন আমাদের তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। একটা মামলার ব্যাপারে শুধু জানতে চাইছি, পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড কোন প্রতিষ্ঠান নয়, কোন ব্যক্তি বিশেষ আপনার কাছ থেকে নিয়ে গেছে কিনা?

বিষ্ণু বর্ধনের সেই এক বুলি।

—আমি বললাম স্যার, ও সমস্ত কারবার করি না।

—ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনি বলুন?

—ভয় পাবো কেন স্যার। আপনারা যা জানতে চাইছেন সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

সামন্ত নিজের পুলিশি মেজাজ আর চাপতে পারলেন না।

—ইউ বাস্টার্ড, ভদ্রভাবে কথা বলছিলাম বলে মাথায় চড়ে বসেছো? হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হোক এটাই বোধহয় চাও? আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর তুমি দিতে চাও কিনা জানতে চাই?

ভয় পেয়ে গেছে এরকম একটা ভাব দেখিয়ে বিষ্ণু বর্ধন বলল, একি জুলুম! আমি বলছি আমার কিছু জানা নেই।

—রক্ষিত—

সাব ইন্সপেক্টার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস স্যার—

সামন্ত কোন আদেশ করার অগেই বাসব বলল, এই লোকটার অনেক আগেই কাস্টডির মধ্যে যাওয়া উচিত ছিল। আর একটা দিন একে বাইরে থাকতে দিন। কাল যা হোক একটা ব্যবস্থা করলেই হবে। দম আটকে আসছে এখানে। এবার বাইরে যাওয়া যাক।

সামন্ত অবাক হয়ে বাসবের দিকে তাকালেন।

—ব্যাপারটা কি?

—পরে বলছি।

বিষ্ণু বর্ধনের দিকে আর না তাকিয়ে তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তায়। গাড়ির কাছে পৌঁছাবার আগেই, সোজাপথে যখন হল না তখন বাঁকা পথে লোকটার কাছ থেকে কি ভাবে কথা আদায় করা যাবে তাব পরিকল্পনা জানাল।

এনায়েতের দেখা পাওয়া গেল মিঃ সামন্তের জীপের কাছেই। বিশেষ আকারের বিড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টানছিল। ওদের দেখেই বিড়ি ফেলে দিল একধারে। তারপর

এগিয়ে এল।

বাসব বলল, তুমি এখানে কি করছো?

—পান্না ওস্তাদের কাছে এসে সব ঠিকঠাক করে ফেললাম। লোকটা ওস্তাদের সংরক্ষণেই আছে সাব। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আপনারাও এখানে এসেছেন। তাই—

—পান্না ওস্তাদের সঙ্গে এখন দেখা হতে পারে?

—না, সাব। আমার সঙ্গে কথা বলেই মোমিনপুর চলে গেল। আমি ওকে বলে রেখেছি, সন্ধ্যার পর আসবো।

বাসব সামন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার একজন অ্যাসিস্টেন্ট। ওকে বিষ্ণু বর্ধনের পিছনে লাগিয়েছি। মনে হচ্ছে কোন একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। বাঁকাপথে যারা যাতায়াত করে তাদের ঐ পথের অন্য কেউ ঠিকভাবে ঘায়েল করতে পারবে।

সামন্ত রাস্তা পার হয়ে যাওয়া এনায়েতের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, সেই লোকটাই তো, আগে যে গুন্ডা ছিল?

—হ্যাঁ। অনেক মামলায় আমাকে দারুণ সাহায্য করেছে।

—আপনার কথাই ঠিক। এখন বিষ্ণু বর্ধনকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ হত না। দুচারটে চড় চাপড় খেয়েও আসল কথা স্বীকার করতো না। আজেবাজে কথা বলতে থাকতো। তারপর ওব উকিল গিয়ে উপস্থিত হত ওখানে। পরে প্রমাণ সমেত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে হারামজাদাকে আমরা জেলে পুরবো।

বাসব বলল, এখন আর লালবাজারে যাবো না। কাল সকালে দেখা করছি। আপনি রওয়ানা দিন। আমি ট্যাক্সি ধরে নেবো।

—তা হয় না। আপনিও আসুন আমাদেব সঙ্গে। আপনাকে নামিয়ে স্বচ্ছন্দে অফিসে ফেরা যাবে।

রাত দশটা আন্দাজ সময এনায়েত বাসবকে সঙ্গে নিয়ে কলুটোলা অঞ্চলে এসে উপস্থিত হল। বিষ্ণু বর্ধনের আস্তানায় পৌঁছাবার আগে পান্না ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। পান্নাকে পাওয়া গেল চুন বালি খসা একটা ঘরে। কয়েকজনের সঙ্গে ওখানে বসে মাকালী ব্র্যান্ডের সেবা করছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাসবকে সেলাম ঠুকে বলল, এনায়েতের মুখে সব কথা শুনেছি সাব। লোকটা ভারি ধুরন্ধর। আমি ওর মাথায় ছাতা ধরে আছি—সেই, আমাকেই মাঝে মাঝে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। লোকটাকে শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম।

পান্না ওস্তাদের চেহারা দেখার মত। ছ-ফিটের এক ইঞ্চির কম হবে না উচ্চতায়। শরীরে কম করেও দুমণ মাংস আছে। ঘাড়ের কাছে মোচড় খাওয়া বাহারে চুল। এছাড়া আছে অনেকটা নেমে আসা জমকালো জুলফি।

বাসব বলল, ধন্যবাদ ওস্তাদ। কাজটা করে দিতে পারলে সরকারকেই সাহায্য করা হবে। একটা লোক খুন হয়েছে ওর সাপ্লাই করা ওষুধ খেয়ে। পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলাম, লোকটা মুখ খুলল না।

পান্নার মুখে বিজ্ঞের হাসি দেখা দিল।

—এবার মুখ খুলবে। তবে সাব একটা কথা—

—বলো?

—মালকড়ি ছাড়া কোন কাজ করি না সাব। গুরুর নিষেধ।

এবার এনায়েত বলল, তোমাকে তো আগেই বলেছি সার্ভিস চার্জ দিয়ে দেওয়া হবে। কত চাও?

পান্না ভ্রূ কুঁচকে কি ভাবল।

—কাজটা ছোট। তারপর আপনার মত মানীলোক বলছে, সরকারকেও সাহায্য করা হবে। পাঁচটা পাত্তি দিয়ে দেবেন সাব।

বাসব নিজের পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনজন বিষ্ণু বর্ধনের দর্জির দোকানের সামনে এসে পৌঁছল। দোকান এখন খোলা নেই। এত রাতে খোলা থাকার কথাও নয়। এনায়েত এগিয়ে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিল। কোন সাড়া নেই। এবার জোরে ধাক্কা মারল। কাজ হল। সাড়া পাওয়া গেল ভেতর থেকে।

—কে? ইব্রাহিম?

পান্না ওস্তাদ। দরজা খোল।

বিষ্ণু বর্ধন দরজা খুলে বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল, এত রাত্রে? বিশেষ কিছু ঘটেছে নাকি? রাত বেশি হয়নি। আমার সঙ্গে আরো লোক আছে। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

বিষ্ণু বর্ধনের দৃষ্টি এবার এনায়েত আর বাসবের উপর পড়ল। এনায়েতকে চেনে না। বাসবকে চিনতে কষ্ট হল না। এই লোকটাই পুলিশের সঙ্গে এসেছিল। মনকে ঘিরে ধরল অমঙ্গলের আশঙ্কা। বাধ্য হয়ে দবজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়ে তিনজনকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিল।

পান্না ওস্তাদ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাসবকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, এই ভদ্রলোককে চেনো?

বিষ্ণু বর্ধন বলল, সকালের দিকে এসেছিলেন এখানে। চিনি না। বোধহয় পুলিশ বিভাগেব লোক।

—পুলিশের লোক নন। বলতে পারো নানা ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করেন। আগে যখন এসেছিলেন তখন তোমাকে কোন প্রশ্ন করেছিলেন?

—না, মানে...উনি...

—আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই। কোন প্রশ্ন করেছিলেন?

—একটা ওষুধের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমি তো ওসমস্ত কারবার করি না। অনেক করে বললাম, ওঁরা বিশ্বাস করলেন না।

—পুলিশকে আইন মেনে চলতে হয়, তাই তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। তুমি কিন্তু ভাল মতই জান বর্ধন, আমি আইন মানি না। শেষবারের মত বলছি, এই ভদ্রলোক ঐ ওষুধ সম্পর্কে তোমাকে যে প্রশ্ন করবেন তার সঠিক উত্তর

দাও।

—সত্যি কথাই ওদের আমি বলেছি ওস্তাদ। গলা ফাটিয়ে ঐ একই কথা আবার বললে তবে বিশ্বাস করবে?

পান্না ওস্তাদ বিষ্ণু বর্ধনের কলাব চেপে ধরল।

—খানকির বাচ্চা—আমার সঙ্গে ওস্তাদি?

—এসমস্ত কোন মানে হয় না। তুমি কেন আমার কলার ধরেছো?

—শালা, দোগলা, আমার মুখের উপর কথা বলছে!

কথাটা শেষ করেই প্রচন্ড চড় কষাল বিষ্ণু বর্ধনের মুখের উপর। তারপর তাকে দু'হাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা সেলাই মেশিনের উপর হুড়মুড়িয়ে পড়ল লোকটা। নিজে উঠে দাঁড়াবার আগেই, পান্না ওস্তাদ এগিয়ে গিয়ে ওকে তুলে ধরল। টলছে বিষ্ণু বর্ধন? এক ধারের ঠোঁট কেটে গিয়ে বক্ত পড়ছে।

—কি-বে হারামি—কেমন লাগছে?

এবার তলপেটে একটা ঘুসি। কাতরাতে, কাতরাতে বিষ্ণু বর্ধন ডিগবাজী খেল। ছিতরে যাওয়া কয়েকটা সেলাই মেশিনের মাঝখানে পড়ে ছটপট করতে লাগল।

—ওঠ শালা। উঠে আয়, নইলে আরো মাব দেবো।

কেঁউ কেঁউ করতে করতে হামাগুড়ির ভঙ্গীতে বিষ্ণু বর্ধন উঠে দাঁড়াবাব চেষ্টা করল। ভাল মতই লেগেছে। শবীরে বল না পাওয়ায় দাঁড়াতে পারছে না। শেষে পান্না-ওস্তাদই ঘাড় ধরে ওকে টেনে তুলল। চোখ বুঁজে আসছে। সারা মুখ ঘাম আর রক্তে মাখামাখি।

নির্বাক দর্শক হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসব আর এনায়েত।

পান্না বলল, কুত্তার মত হাঁপানি বন্ধ কব। মুখ খুলবি না, আরো দাবাই চাই?

কোন রকমে বিষ্ণু বর্ধন বলল, আমি—আমি তো—

—খাবি-খাওয়া বন্ধ কব। আমি যখন এর মধ্যে এসে পড়েছি তখন পেট তোকে খালি করতেই হবে। নইলে তোর ব্যবসা যাবে, তুইও যাবি সেই সঙ্গে।

বিষ্ণু বর্ধন কোনরকমে বলল, বিশ্বাস করো আমি কাউকে খুন করিনি।

এতক্ষণ পরে বাসব কথা বলল।

—আমরাও জানি আপনি কাউকে খুন করেননি। তবে আমরা এও জানি, আপনি পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড বিক্রী করে থাকেন। কথাটা সকালে স্বীকার করে নিলে আপনাকে এই নিগ্রহ সহ্য করতে হত না। নিজেকে আর বিপদে ফেলবেন না।

পান্না বলল, উনি ঠিকই বলছেন। আব লুকোচুরি না খেলে উনি যা জানতে চাইছেন পরিষ্কার করে জানিয়ে দে শালা। আবার সব ঠিকঠাক চলতে থাকবে।

বিষ্ণু বর্ধন অবশ্য বুঝতেই পেরেছিল আর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। বিশেষ করে পান্না-ওস্তাদ যখন মাঠে নেমে পড়েছে। পুলিশের চেয়ে হাজার গুণ বেশি

ক্ষতি সে সহজেই করতে পারবে। সুতরাং মুখ খোলাই ভাল। মুখ ধুয়ে টুয়ে এক গেলাস জল খেল বিষ্ণু বর্ধন। তারপর নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল বাসবের সঙ্গে।

বাসব ঃ পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড কোথা থেকে আনান?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ দুবাই থেকে আসে। আমি পাই বম্বের একজন লোকের কাছ থেকে।

বাসব ঃ যতদূর মনে হয়, কলকাতার তিনটে প্রতিষ্ঠান আপনার কাছ থেকে মাল নেয়। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ মাল নিয়ে যায় কি?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ কালে ভদ্রে এক আধজন আসে।

বাসব ঃ যে কেউ এলেই তাকে মাল দেবেন?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ তা সম্ভব নয়। যদি পুলিশের লোক হয়। পরিচিত লোকের সুপারিশপত্র নিয়ে এলে মাল দিয়েছি। এখানে দরাদরি হয় না।

বাসব ঃ ইদানিং, এই ধরুন, দিন কুড়িক কি একমাস আগে আপনার কাছ থেকে কেউ মাল নিয়ে গেছে?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ মনে রাখা মুশকিল। খাতা দেখতে হবে।

ভেতরের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। বিষ্ণু বর্ধন ডায়রির মত চেহারার, রেক্সিনে মোড়া একটা খাতা আলমারি থেকে বার করে আনল। পাতা উল্টে কি দেখে নিল।

বিষ্ণু বর্ধন ঃ ৩০শে ডিসেম্বর একজন মাল নিয়ে গেছে। তারপর ব্যক্তিগত ভাবে কেউ মাল নেয় নি।

বাসব ঃ সেই ক্রেতা নিশ্চয় পরিচয়পত্র এনেছিল?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ হ্যাঁ।

বাসব ঃ দেখাতে পারেন?

খাতার পিছন দিকের মলাটে ফ্ল্যাপ ছিল। ফ্ল্যাপের মধ্যে থেকে কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজ বার করল বিষ্ণু বর্ধন। তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে এগিয়ে ধরল। বাসব চিঠিটা পড়ল—

২৭শে ডিসেম্বর।

প্রিয় বিষ্ণু,

পত্রবাহক আমার অতি পরিচিত ব্যক্তি। ওঁর কয়েক গ্রেন 'পটএক' দরকার। উচিত দরে মাল ওঁকে অবশ্য করে দেবে। আগামী মাসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

অসীম ঘোষাল

বাসব ঃ 'পটএক' বোধহয় পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড-এর শট ফর্ম?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাসব ঃ এই অসীম ঘোষাল লোকটা কে?

বিষ্ণু বর্ধন ঃ একজন ঠিকেদার। বড় বড় বাড়ি, অফিস টফিস তৈরি করেন। বেশ পয়সাওয়ালা লোক।

বাসব : ভদ্রলোক থাকেন কোথায়?
বিষ্ণু বর্ধন : চৌরঙ্গী টেরেস-এর কর্ণার ম্যানসন-এ। একুশ নম্বর ফ্ল্যাটে।
বাসব : যে ভদ্রলোক মাল নিতে এসেছিলেন তার সম্পর্কে কিছু বলুন? তিনি দেখতে কেমন, বয়স কত—এই সব আর কি।
বিষ্ণু বর্ধন : দেখতে অতি সাধারণ। বসা গালে একদিনের না কামানো দাড়ি। রোগা চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে।
বাসব : অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত চেহারা। মাথার চুল বোধহয় কাঁচাপাকা?
বিষ্ণু বর্ধন : দু'পাশের কানের কাছে সামান্য চুল আছে। বাকী মাথাটায় চকচকে টাক। এই জন্যই বোধহয় লোকটাকে রুগ্‌ণ মনে হচ্ছিল।
বাসব : একাই এসেছিল বোধহয়?
বিষ্ণু বর্ধন : আরেকজন লোক সঙ্গে ছিল। তাকে আমি ভালভাবে লক্ষ্য করিনি। সে গাড়িতেই বসেছিল।
বাসব : গাড়ি!!! গাড়ির মেক বলতে পারবেন?
বিষ্ণু বর্ধন : প্রিমিয়ার পদ্মিনী।
বাসব : রং—?
বিষ্ণু বর্ধন : চকলেট।

বাসব হেসে ফেলল।

এনায়েত : আপনি হাসছেন সাব?
বাসব : হাসির কথা নয়, তবু হাসছি দেখে অবাক হলে বোধহয়? আসল কথা হল, এখানে এসে এত কথা জানতে পারবো ভাবতে পারিনি; অনেক ধন্যবাদ বর্ধনবাবু। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। দিনের বেলা যদি এই ভাবে সমস্ত কিছু বলতেন, রক্তারক্তি কান্ডটা ঘটত না।

বাসব ওখান থেকে বেরিয়ে এল। রাত তখন দেড়টা। পান্না-ওস্তাদ আর এনায়েত কিছু দূর ওর সঙ্গেই এল। কাল অনেক কাজ আছে। ওল্ডস মোবাইল এনায়েতের ভাইপোর জিম্মায় এক জায়গায় দাঁড় করানো ছিল। বাসব এবার বাড়ি ফিরে টানা ঘুম দেবে।

চৌধুরী টিম্বারস্-এর গুদামের লাগোয়া অফিস ঘরে উদিত ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এখানে প্রায়োজন পড়লে মাঝে মধ্যে আসতে হয়। বড় একটা অর্ডার হাতে এসেছে। বাঁকুড়ার পার্টি। চালান যাতে সময় মত পৌঁছায় সেই ব্যবস্থা করতেই এখানে আসা। নইলে উদিত গণেশ অ্যাভিনিউ-এর অফিসেই বসে।

বেলা তখন দুটো।

বেল বাজাল।

সুইংডোর ঠেলে একজন ছোকরা এল।

—কাকা এসেছেন?

ছোকরা বলল, না স্যার।

—হুঁ। তুমি এক কাপ চা নিয়ে এস।

—দু'কাপ আনতে বলুন।

উদিত বাসবকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এখানে খবর না দিয়েই গোয়েন্দাপবর আসতে পারেন যে ভাবতেই পারেনি।

দ্রুত গলায় বলল, কি আশ্চর্য! আপনি?

বাসব সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, চলে এলাম। ভাবলাম, আপনারা কি ভাবে কাজ কারবার চালান দেখে আসি।

উদিত বলল, উদয়ের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের এই গুদামের কোন যোগাযোগ আছে নাকি?

—আপনার কি মনে হয়?

—আমার তো মনে হয় সেরকম কিছু নেই। তবে উদয় এখান থেকে আড়াই লাখ টাকার মাল সরিয়ে ছিল জানতে পেরেছি। তার সঙ্গে খুনের কি সম্পর্ক?

—কি ভাবে জানতে পারলেন?

—কাকা বলেছিলেন। বাবাও বললেন। আপনি তো সব চেয়ে আগে বলেছিলেন একথা।

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, সে লোক মারা গেছে। প্রতিবাদ করতে পারবে না। তার ঘাড়ে দোষ চাপানোটা ভারি সহজ।

বিস্ময়ের সুরে উদিত বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন?

—আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে মনে করি। বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখুন না। ভাল কথা, সোমনাথবাবু এসেছেন?

—কাকা এখনও আসেন নি।

ছোকরা দু'কাপ চা দিয়ে গেল।

কাপে চুমুক দিয়ে বাসব বলল, আপনি কাজ করুন। আমি একাই চারিধার ঘুরে দেখে আসি।

—তেমন কোন ব্যস্ততা নেই। চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

চা শেষ করে দুজনে অফিস ঘর থেকে বেরুল।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রায় বিঘা তিনেক জায়গা। টিন দিয়ে ছাওয়া অর্ধগোলাকার দুটো বিশাল গুদাম। গুদামের প্রবেশদ্বার প্রস্থে এবং উচ্চতায় এত বড় যে মাল বোঝাই ট্রাক অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। সামনে ভারি পাল্লার দরজা। ভেতরে সাইজ করে কাটা দামী কাঠ রাখা হয়।

গুদামের দক্ষিণ দিকে খোলা আকাশের নিচে আম, কাঁঠাল, গরান ইত্যাদি গাছের অজস্র গুঁড়ি পরে রয়েছে। তিনটে করাত কল বসানো আছে অন্য ধারে। সেখানে পুরোদমে কাজ চলেছে। একটানা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে।

জনা ত্রিশেক লোক ব্যস্ত ভাবে কাজ করছে। দুটো ট্রাকে মাল তুলতে গলদঘর্ম হচ্ছে কুলিরা। উদিত ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল বাসবকে। ঐ সঙ্গে কাঠ কোথা থেকে

সংগ্রহ করা হয় ইত্যাদি সম্পর্কেও বলছিল।

এক সময় বাসব প্রশ্ন করল, খোলা জায়গাতেও তো অনেক কাঠ পড়ে রয়েছে, চুরি যায় না?

—নাইট গার্ডের ব্যবস্থা আছে।

—অথচ দেখুন, খোলা জায়গা থেকে নয়, গুদামের মধ্যে থেকে আড়াই লাখ টাকার কাঠ পাচার হয়ে গেল। দিনের বেলা এত লোকের চোখের উপর দিয়ে নিশ্চয় ব্যাপারটা ঘটেনি?

—আপনি বলতে চাইছেন, নাইট-গার্ডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয় কাজ সেরেছিল?

—আমি এই কথাই বলতে চাইছি, নাইট-গার্ডদের সহযোগিতা না থাকলে এত বড় চুরি হওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না। এনিয়ে খোঁজ-খবর বোধ হয় করা হয়নি?

চিন্তিত গলায় উদিত বলল, এই ব্যাপারটা আমার জুরিকডিকসনের মধ্যে পড়ে না। বাবা বা কাকা কি করেছেন বলতে পারবো না।

—এখানকার কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে কে?

—নিতাই দত্ত।

—লোকটাকে এখানে আসতে বলুন।

উদিত গলা চড়িয়ে একজনকে বলল, নিতাইবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। মিনিট কয়েক পরেই হন্তদন্ত ভাবে দত্ত এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল বাসব। চোখে লাগে না দেখলেও লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে। মাথায় চকচকে টাক, কানের দু'পাশে সামান্য চুল, বসা গাল রুগণ চেহারা—এই ধরনের একটা লোকই বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড নিয়ে এসেছে।

—আমায় ডাকছেন স্যার?

উদিত বলল, ইনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

নিতাই দত্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে বাসবের দিকে তাকাল।

বাসব বলল, নাইট-গার্ড দুজনকে এখন পাওয়া যাবে?

—ওরা বিকেল পাঁচটার সময় আসে।

—কত দিন কাজ করছে ওরা?

—মাস দুয়েক হল ওদের নেওয়া হয়েছে।

—সেকি!

বাসব উদিতের দিকে তাকাল।

—মাত্র দুমাস থেকে নাইট-গার্ড আছে?

উদিত বলল, নাইট-গার্ড প্রথম থেকেই আছে। আসল কথা হল, আগেকার দুজন অন্যত্র ভাল চান্স পেয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছিল।

—সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় লোক পাননি?

—দিন দশেক পরেই ওদের পাওয়া গিয়েছিল। কি ব্যাপার মিঃ ব্যানার্জি,

নাইট-গার্ডদের সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছেন?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে ভাবিনি। উত্তর শোনার পরই তো জানা গেল পরিষ্কার একটা ফাঁক রয়েছে।

—ফাঁক! আমি তো—

—পরে বলবো। নিতাইবাবু—

—আজ্ঞে—

—আপনি কতদিন এখানে চাকরি করছেন?

—তা স্যার দশ বছরের উপর হয়ে গেল।

—আপনি অসীম ঘোষালকে চেনেন?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নিতাই দত্ত বলল, না।

—৩০শে ডিসেম্বর কলুটোলা অঞ্চলে একটা চিঠি নিয়ে একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—না স্যার।

উদিত বলল, উনি ঠিকই বলছেন, ৩০শে ডিসেম্বর ব্যবসার ব্যাপারে আমি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ভুবনেশ্বর গিয়েছিলাম। আমরা ফিরেছি ৫ই জানুয়ারী। বাসবের মনের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিল। বিষ্ণু বর্ধন মিথ্যা কথা বললে চেহারায় মিল হত না। কিন্তু উদিত যা বলছে তাতে তো প্রমাণ হয়, নিতাই দত্তর কোন মতেই পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহের ব্যাপারে বিষ্ণু বর্ধনের কাছে ঐ দিন যাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার ১৪ই আমার সঙ্গেই ভুবনেশ্বর গিয়েছিল। আমরা ফিরেছিলাম ১৮ই। অস্বস্তি ভাবটা একধারে সরিয়ে বাসব প্রশ্ন করল, আপনি কোথায় থাকেন?

—চক্রবেড়িয়া রোডে—

—বাড়িতে কে, কে আছেন?

—আমি, আমার ভাই। বাবা মা মারা গেছেন।

—বিয়ে করেন নি?

—না।

—ঠিক আছে। আপনি এবার যেতে পারেন।

নিতাই দত্ত চলে যাবার পর উদিত বলল, আপনি নিতাইবাবুকে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করলেন? কি হয়েছে বলুন তো?

—নিতাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সময় আপনি ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন, আশা করি কথাটা হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি?

—হ্যাঁ। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

—আপনি ওঁকে নিয়ে ভুবনেশ্বর না গেলেই ভাল হত। একটা অঙ্কর উত্তর সঠিক ভাবে পেয়ে যেতাম তাহলে!

উদিত উত্তর উত্তর অবাক হচ্ছিল।

বলল, কি সমস্ত বলছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—ওকথা এখন থাক। অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। এবার যাবো।

যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই। আপনি বাড়ির বড়ছেলে। সমস্ত কিছুর উপর ভালভাবে নজর দিন। গা এলিয়ে থাকার দিন আর নেই।

কথা শেষ করেই বাসব এগুলো।

হতভম্ব উদিত দাঁড়িয়ে রইল একই ভাবে।

সন্ধ্যার মুখে বাসব চৌরঙ্গী টেরেস পৌঁছাল।

কর্ণার ম্যানসান খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। অভিজাত চেহারার পিঙ্ক রং-এর পাঁচতলা বাড়ি। একুশ নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে ডোর বেলের নব-এ আঙ্গুল ঠেকাল। বাইরে থেকেই শোনা গেল, ভেতরে মিষ্টি ঝঙ্কার উঠেছে। দরজা সামান্য সরে গেল। বছর কুড়িকের একজন তরুণ উঁকি মারল ফাঁক দিয়ে।

বাসব বলল, মিঃ ঘোষাল আছেন? দেখা করতে চাই।

—বাবা ব্যস্ত আছেন? জেনে আসছি দেখা করবেন কিনা।

—এই কার্ডটা ওঁকে দিন।

কার্ড নিয়ে চলে গেল তরুণ ফিরে এল মিনিট খানেক পরেই।

—আসুন।

বাসব ভেতরে গেল।

বেশ বড় ঘরখানা। আধুনিক কায়দায় সাজানো। ঘরের অন্য প্রান্তে, আধ-গড়ান একটা চেয়ারে ভারি চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন। হাতে বল পেন। সামনের 'সেন্টার পিস'-এর উপর কিছু কাগজ-পত্র ছড়ান। বাসবকে দেখে উনি উঠে পড়লেন। এগিয়ে এলেন ওর দিকে।

বাসব বলল, আপনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় এসে পড়াটা ঠিক হয়নি। অসীম ঘোষাল বললেন, তেমন কোন ব্যস্ততা ছিল না। বসুন—আপনার নাম তো এখন প্রায় সকলেরই জানা। কি ব্যাপার বলুন তো? আমি আপনার কোন্ কাজে লাগবো বুঝতে পাচ্ছি না।

—একটা তদন্তের ব্যাপারে কয়েকটা কথা জেনে নিতে এসেছি। আশা করি সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

—যদিও কিছু বুঝতে পারছি না। তবু বলুন? আমার দিক থেকে সহযোগিতার অভাব হবে না।

—আপনি বিষ্ণু বর্ধনকে চেনেন?

অসীম ঘোষালের কপালে ভাঁজ পড়ল।

—লোকটা খুন হয়ে গেছে নাকি?

—না। বেঁচেবর্তেই আছে। লোকটাকে চেনেন তাহলে।

—বিলক্ষণ চিনি। বাইরে থেকে মালটাল এনে বিক্রী করে। আমিও পছন্দ মত কিছু পেলে কিনি।

—বিষ্ণু বর্ধনের খুন হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি?

—ষোল আনা। ঐ ধরনের কারবারে সবই সম্ভব। আসল কথাটা কিন্তু আপনি

এখনও ভাঙ্গেননি।

বাসব বলল, গুরুতর কিছু নয়। গত ৩০শে ডিসেম্বর আপনি একজনকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন বিষ্ণু বর্ধনের কাছে?

ঘোষালের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—চিঠি!

—হ্যাঁ।

—কতলোককে তো সুপারিশপত্র দিচ্ছি। সব সময় মনে থাকে না। একটু ক্লিয়ার করে বলুন তো?

—যে চিঠি আপনি বিষ্ণু বর্ধনকে পাঠিয়েছিলেন তার জেরক্স কপি, এই যে—বাসব একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে ধরল।

ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়তেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল অসীম ঘোষালের। এতটা তিনি আশা করেন নি। বুঝলেন, বেশ কাঁচা কাজই তিনি করে ফেলেছেন। অবশ্য দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন।

সহজভাবেই বললেন, ও, হ্যাঁ। চিঠিটা আমারই লেখা। এতো বিজনেস সিক্রেট। বিষ্ণু বর্ধনের তো উচিত হয়নি চিঠির জেরক্স কপি আপনাকে দেওয়া।

—জেরক্স আমি করিয়েছি। আসল চিঠিটা আমার কাছে আছে। যাহোক, এবার পরিষ্কার কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হওয়া উচিত। এই সঙ্গে আমার জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করি, একটা খুনের তদন্ত সূত্রেই আপনার কাছে এসেছি।

অসীম ঘোষাল স্বাভাবিক কারণেই এবার ঘাবড়ালেন।

বিচলিত ভঙ্গীতে বললেন, খুনের কথা কি বলছেন? বিশ্বাস করুন, আমি কোন খুনের সঙ্গে জড়িত নই। এমন কি আমার কোন আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতদের মধ্যে কেউ খুন হয়নি।

—আমি জানি সে কথা। আপনি যে বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড কেনেন তাও আমার জানা আছে। কিন্তু ও সমস্ত নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবো না। আমি কিছু জানতে এসেছি আপনার কাছে, জানা হয়ে গেলেই চলে যাব।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এইভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে—

—শুনুন মিঃ ঘোষাল, পুলিশ আসতে পারতো। দেখছেন, আমি একা এসেছি। আমি আপনাকে অ্যাসিওর করছি, আপনার কথা অন্তত কেউ আমার মুখ থেকে জানতে পারবে না।

ঘোষাল বুঝলেন পরিষ্কার ভাবে কথাবার্তা এই ইনভেস্টিগেটর ভদ্রলোকের সঙ্গে না বলে নিলে পুলিশ আসবে। ইঙ্গিতটা ভারি স্পষ্ট। উনি ভয় আর দ্বিধাকে দূরে সরিয়ে রাখারই সিদ্ধান্ত নিলেন।

—বলুন, কি জানতে চান?

—আপনার সুপারিশপত্র নিয়ে যে বিষ্ণু বর্ধনের কাছে গিয়েছিল ঐ লোকটা কে?

—নিমাই দত্ত। আগে আমার কন্সট্রাকশন ফার্মে কাজ করতো। এখন প্রপার্টি ডিলার। আসে মাঝে মধ্যে। আমার বন্ধু-বান্ধবরা ওব সহযোগিতায় খান কয়েক ফ্ল্যাট কিনেছে।

—নিমাই দত্ত থাকে কোথায়?

—চক্রবেড়িয়া রোডে। বাড়ির নম্বর জানা নেই।

—আপনি ওকে সুপারিশপত্র দিলেন কেন?

অসীম ঘোষাল চান্সালারের প্যাকেট আর লাইটার পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরলেন।

—আমি পাইপ ইউজ করি। ধন্যবাদ। ঐ সুপারিশপত্রর বিষয়টা জানতে চাইছিলাম। প্রকৃত তথ্যটা আমাকে জানান।

ঘোষাল সিগারেট ধরিয়ে নিযে বললেন, নিমাই জানতো আমি মাঝে মধ্যে বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে কেনাকাটা করি। একদিন এসে বলল, ওর কিছুটা পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড দরকার। একধরনের মালিশ তৈরি হয় ঐ আইটেম দিয়ে। আমি জানতে চাইলাম, ওর কিছু হয়েছে কিনা? নিমাই বলল, ওর একজন ক্লায়েন্টের দরকার।

—তারপর?

—আমার কাছে তখন ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা সন্দেহজনক মনে হয়নি। আমি একটা চিঠি বিষ্ণু বর্ধনকে দিয়ে দিলাম। এই আর কি।

অসীম ঘোষাল অর্ধেক না পোড়া সিগারেট অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমার কোমরে মাঝে মাঝে ব্যথা চাগাড় দেয। তখন ঐ ওষুধের সঙ্গে ভ্যাসলিন আর মধু মিলিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে মালিশ করাই।

—ব্যথা ছেড়ে যায়?

—বার তিনেক মালিশ করালেই ব্যথার নাম গন্ধ থাকে না।

—এই ফরমুলাটা আপনাকে দিল কে?

—ডাঃ পূর্ণেন্দু বসাক। আমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

বাসব ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়েছিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নিমাই দত্তর পরিবারের আর কাউকে চেনেন?

—না।

—চিঠি নিয়ে যাবার পর দত্ত বোধহয় আর আপনার কাছে আসেনি?

—গতকালই এসেছিল। এখানে ছিল ঘন্টাখানেক।

—কেন এসেছিল? আবার কোন চিঠির দরকার ছিল নাকি?

—না, না সেরকম কিছু নয়। এসেছিল, একটা ফ্ল্যাটের ব্যাপারে। আমার এক বন্ধু ফ্ল্যাট কেনার তালে আছে।

—উদয় চৌধুরীকে আপনি চেনেন?

—কে লোকটা?

—অর্থাৎ চেনেন না। পটাসিমায় অ্যাকোডাইড খাইয়ে কিছুদিন আগে উদয়

চৌধুরীকে খুন করা হয়েছে। সংবাদপত্রে তো প্রচুর লেখা-লেখি হয়েছিল। চোখে পড়েনি?

—মনে পড়ছে না। আমি ব্যস্ত মানুষ। খুঁটিয়ে প্রত্যহ কাগজ পড়ার সময় কই?

একটু থেমে অসীম ঘোষাল আবার বললেন, এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। দেখুন, আমি অন্তত এটুকু জোর গলায় বলতে পারি নিমাইয়ের মত ভীতু এবং দুর্বল লোক আর যাই করুক কাউকে খুন করতে পারে না।

—হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন। তবে কি জানেন, অনেক সময় নিজের অজান্তেই কেউ কাউকে মারাত্মক সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আপনার কিছু সময় নষ্ট করলাম।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

—আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যদি আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন, সেটাই হল বড় কথা।

—তবে একটা বিষয়ে—

—বলুন?

—নিমাই দত্তকে এ সম্পর্কে কিছু বলবেন না। লালবাজারের কর্তাবা এই মামলার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। আপনাকে অবশ্য জড়াবো না। তবে—

—ঠিক আছে। নিমাই কিছুই জানতে পারবে না।

বাসব বিদায় নেবার পর অসীম ঘোষাল দরজার ল্যাচ তুলে দিলেন। এগিয়ে গেলেন ফোন স্ট্যান্ডের দিকে। রিসিভার তুলে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়েল করতে লাগলেন। কয়েকবার রিং হবার পর সাড়া পাওয়া গেল।

—হ্যালো...কে...পুলক...

ওধার থেকে—

—পুলক কথা বলছি...আপনি কে...

—ঘোষাল...নিমাই আছে ওখানে...

—বর্ধমান গেছে...

—এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে...ভারি জরুরী...

—ঠিক আছে স্যার...যখনই ফিরুক...জানিয়ে দেব...

ঘোষাল রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

ওদিকে—

বাসব অসীম ঘোষালের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকাতেই ওর নজর পড়ল একটা ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারের দিকে। ওখানে টেলিফোন থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাসব দোকানের মধ্যে ঢুকল। ওর অনুমান ঠিক।

কাউন্টারে টাকা দিয়ে রিসিভার তুলে নিল।

নম্বর ডায়েল করার পর রিং হতে লাগল। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর

কেউ রিসিভার তুলল ওধারে, হ্যালো..

—উমানাথবাবু আছেন...

—উনি তো বেরিয়েছেন..কে কথা বলছেন...

—বাসব...উদিতবাবু থাকলে ডেকে দিন...

—মিঃ ব্যানার্জি...আমি উদিত কথা বলছি...ফোনে গলা চেনা যায় না...বলুন...

—নিতাই দত্ত...আপনাদের গুদামে সে চাকবি করে...ওর ঠিকানাটা দরকাব ছিল...

—কিছু করেছে নাকি..

—এখনও জানি না কিছু করেছে কিনা...খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে...

—আমি যতদূর জানি লোকটা ভারি শান্ত শিষ্ট...তবে...

—আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন...তবে সন্দেহ অনেক ক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টার...ঠিকানার কথা বলছিলাম. .

—নিশ্চয়...আমি খোঁজ নিয়ে আজই আপনাকে জানিয়ে দেব...

—এই কথাই রইল তাহলে...ছাড়ছি...

বাসব রিসিভার নামিয়ে রাখল।

চৌরঙ্গী টেরেস থেকে হাঙ্গাব ফোর্ড স্ট্রীটেব দূরত্ব খুব বেশি নয়। আবার খুব কাছে নয় যে সে কথাও বলা চলে না। বাসব হেঁটেই বাড়ি ফিরবে স্থিব করল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে চিন্তাব জাল বুনতে বুনতে নিজের আস্তানায় পৌঁছাল মিনিট কুড়ির পরে।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই অবাক হয়ে গেল। শৈবাল এক মনে পেসেন্স খেলে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি ওকে এখানে আশা কবা যায না। বাসব বিপরীত দিকের সোফায় বসে পড়ল।

—কতক্ষণ ডাক্তার?

তাস গুটিয়ে নিতে নিতে শৈবাল বলল, আধ-ঘন্টাটাক হবে! বাহাদুরের মুখে শুনলাম, বহুক্ষণ হল বেরিয়েছো?

—একটা কাজ সেরে আসতে হল। ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। চিন্তা ভাবনায় এরকম নাজেহাল বহুদিন হতে হয়নি।

—কি রকম?

বাসব চৌধুরীদের গুদামে যাওয়া, বিষ্ণু বর্ধন প্রসঙ্গ এবং সব শেষে অসীম ঘোষালের সঙ্গে কথাবার্তা প্রকাবণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে বলল।

—সমস্যাটা কোথায়?

—সমস্যা একটা নয়।

—যেমন—?

বাসব একটু হেসে বসে বলল, নাম্বারিং করে বলতে হচ্ছে দেখছি। যেমন, এক, আড়াই লাখ টাকার কাঠ চুরির কথা উদয় মারা যাবার আগে জানাজানি

হল না কেন? দুই, কয়েক ট্রাক কাঠ গুদাম থেকে বেরিয়ে গেল অথচ ম্যানেজমেন্টের চোখে কেন তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ল না? তিন, দলিল দস্তাবেজ ও হ্যান্ডনোট কি সত্যি চুরি গেছে? চার, যদি ঘটনা তাই হয়, তবে প্রশ্ন উঠছে, উদয় চৌধুরী কিসের স্বার্থে চুরি করেছিল? পাঁচ, হ্যান্ডনোট ও দলিল দস্তাবেজ এখন কোথায় বা কার কাছে আছে? ছয়, গুদামের কর্মচারী নিতাই দত্ত এবং অসীম ঘোষালের পরিচিত নিমাই দত্ত কি একই লোক?

শৈবাল বলল, তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে। নিমাই দত্ত এবং নিতাই দত্ত এক লোক হতে পারে না।

—কি ভাবে বুঝলে?

—১৫ই জানায়ারি উদয় চৌধুরী খুন হয়েছিল আমরা নিশ্চিতভাবে জানি। অথচ সেদিন নিমাই দত্ত কলকাতায় উপস্থিত ছিল না। দুদিন আগেই উদিতের সঙ্গে ভুবনেশ্বর গিয়েছিল। ফিরেছিল দুদিন পরে?

—তোমার যুক্তি অকাট্য আমি স্বীকার করছি ডাক্তার। তবু একটা খিঁচ যথা নিয়মে থেকে যাচ্ছে।

—কি বলতে চাইছো?

—নিতাই দত্তকে তো আমি নিজে দেখেছি। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু বর্ধনের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পেলাম। এর একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকা উচিত।

—আমার মতে এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, উদিত তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে আদপেই নিতাই দত্তকে নিয়ে ভুবনেশ্বর যায় নি। কিংবা নিতাই আর নিমাই এক ব্যক্তি নয়—যমজ ভাই।

বাসব কয়েক সেকেন্ড শৈবালের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর দ্রুত গলায় বলল, যমজ ভাই! মার্ভেলাস! এই সম্ভাবনার কথা মনে আসেনি কেন? ডাক্তার, আমার গ্রে ম্যাটার কি শুকিয়ে যাচ্ছে? তুমি যা বললে, এই ক্ষেত্রে ঐ সম্ভাবনাই একমাত্র বাস্তবমুখী।

—খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।

—তাতো বটেই। নিতাই দত্তর ঠিকানা কালই পেয়ে যাবো। কিন্তু ডাক্তার, আটটা তো বেজে গেল।

—ঘড়ি নিজের কাজ করে চলেছে।

—এনায়েতের তো এসে পড়ার কথা। ওকে আটটার আগেই আসতে বলেছিলাম।

—কোন প্রোগ্রাম আছে নাকি?

—আমরা তিনজন অভিযানে বেরুবো।

বাসবের কথা শেষ হবার পরই এনায়েতের দেখা পাওয়া গেল। মুখে হাসি থাকায় পানের ছোপ ধরা দাঁত অল্প দেখা যাচ্ছে। দুজনকে সেলাম জানিয়ে বলল, একটা চক্করে পড়ে আসতে দেরি হয়ে গেল সাব। কোন অসুবিধা হবে নাতো?

—নটা আন্দাজ ওখানে পৌঁছালেই চলবে। বসো। চা খেয়ে নাও।

আধ ঘন্টাটাক পরে বাসব নিজের ওল্ডস মোবাইল-এ শৈবাল ও এনায়েতকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হল। এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে শিয়ালদার ফ্লাইওভারের একটু এধারে অর্থাৎ এন. আর. সরকার হাসপাতালেব সামনে গাড়ি থামল।

গাড়ি লক করে দিয়ে তিনজন রাস্তা পার হল। দোকানের ঠেলায় ফুটপাথ বলে কিছু নেই। এখনও বেশ ভীড়। এনায়েতই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওরা একটা গলির মধ্যে ঢুকল। গলির অর্ধেকটা পার হবার পর এনায়েত ধার ঘেঁসে থামল।

বলল, এই বাড়িটা সাব।

হলদে রং-এর একতলা বাড়ি। বয়স মোটামুটি ভালই। একটাই দরজা। দু'পাশে দুটো জানলা। বর্তমানে দরজা জানলা সবই বন্ধ। বাসবেব ইসারা পেয়ে এনায়েত এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। কয়েকবার কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে গেল। খোলা পাল্লার ওধাবে এসে দাঁড়িয়েছেন সোমনাথ চৌধুরী। এখন তাঁব পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর ডোবাকাটা লুঙ্গি।

একজন অপরিচিতকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কি চাই?

বাসব এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি চৌধুরীমশাই। কয়েকটা কথা বলতে চাই।

কেউ জানে না এমন একটা জায়গায় এখন তিনি রয়েছেন। বাসব যে এখানে এসে উপস্থিত হতে পাবে কল্পনার অতীত ছিল। সোমনাথ বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না।

বাসব আবার বলল, কথাবার্তা এখানে দাঁড়িয়েই হবে, না ভেতরে যাবার অনুমতি দেবেন।

সোমনাথ কাঁধ ঝাঁকালেন।

নিজেকে বোধ হয় সচেতন করলেন সোমনাথ।

বললেন, আসুন—ভেতরে আসুন।

তিনজন ভেতরে গিয়ে বসল।

মাঝারি সাইজের ঘর। মোরাদাবাদী গড়ানে বেতের চেয়ার দিয়ে সাজান। কেন বোঝা যাচ্ছে না, আলো তেমন জোরাল নয়। হঠাৎ বেকায়দায় পড়লে মানুষ যেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, সোমনাথ চৌধুরীর অবস্থা এখন অনেকটাই তাই।

বসে পড়ার পর বাসব বলল, বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে! আমাকে এখানে আশা করেন নি, কি বলেন?

নিজেকে যথা সম্ভব সামলে নিয়ে সোমনাথ বললেন, একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আপনাকে সত্যি এখানে আশা করিনি।

—আপনার ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা বলার ধরন আমার পছন্দ হয়নি। একজন সহকারীকে তাই আপনার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার এই ঠিকানা খুঁজে বার করতে তার অসুবিধা যে হয়নি দেখতেই পাচ্ছেন।

—এখন আপনি কি চাইছেন?

—গোটাকতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর।

—আপনি যদি আমাকে উদয়ের হত্যাকারী ভেবে থাকেন, ভুল করবেন। ছেলেটা মোটেই ভাল ছিল না, তবু ওকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করতাম। তাছাড়া কিসের স্বার্থে খুন করবো তাকে?

—ধ্যানধারণাটা আমার বিবেচনাবোধের উপর ছেড়ে দিন। আপনার এই গুপ্ত জীবনের কথা উমানাথবাবু বা ওবাড়ির আর কেউ জানেন?

—না।

—ব্যাপারটা খুলে বলবেন?

—এর সঙ্গে হত্যা প্রকারণের কোন সম্পর্ক নেই। এটা নিতান্তই ব্যক্তি জীবনের একটা আলোছায়া।

বাসব মুখে হাসি টেনে বললেন, আলোছায়া! ভারি কাব্যিক উক্তি যাহোক, ব্যাপারটা আমায় খুলে বললেই ভাল হয়।

সোমনাথের মুখে অতিষ্ঠ ভাব ফুটে উঠল।

তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন, আমার জীবনের এই দিকটা জেনে আপনার কি লাভ হবে জানি না। শুনতে যখন চাইছেন, বলছি। বিয়ে করবো না স্থির করে ফেলেছিলাম। কিন্তু বছর পনেরো আগে মহিলাব সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পরই সব কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেল। উনি তখন স্কুলে পড়াতেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হল। বিয়ে করে ফেললাম। কিন্তু দাদাকে এ সম্পর্কে জানাতে সাহস হল না। সেই থেকে আমি দুদিক বজায় রেখে জীবন কাটাচ্ছি। আপনার কাছে অনুরোধ কথাটা যেন জানাজানি না হয়।

—জানাজানি হলে তো কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য আসবে।

—আমি ভারি বেকায়দায় পড়ে যাবো। মুখ দেখানো দুষ্কর হয়ে পড়বে।

—বেশ। অনন্য অবস্থায় না পড়লে আমি এ সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলব না। এখনও আপনার স্ত্রী স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন?

—বছর আটেক হল কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

বাসব এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো।

—দলিল আর হ্যান্ডনোটগুলোর সন্ধান বোধহয় এখনও পাওয়া যায় নি?

—না। চিন্তার বিষয় হয়ে রয়েছে।

—দলিলগুলোর জন্য চিন্তিত হওয়া নিরর্থক। নকল পাওয়া যাবে। হ্যান্ডনোটগুলো ফিরে না পাওয়া গেলে অবশ্যই চিন্তার কথা।

—ওগুলো আর পাওয়া যাবে না।

—উদয় যাকে বা যাদের দিয়েছে তারা কি আর ফেরত দেবে আপনাদের?

—আপনি কি বলতে চাইছেন, উদয় ইন্টারেস্টেড পার্সনদের ওগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যার কাছ থেকে যা পেয়েছে, তাই হাতিয়ে নিয়েছিল?

সোমনাথ বললেন, আমার তাই মনে হয়। ধরুন, যে একলাখ টাকা ধার

নিয়েছে, সে যদি চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজারে হ্যান্ডনোট ফেরত পায় নেবে না কেন? তাছাড়া সুদের ঝামেলা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে।

—আমাদের অনুমান ঠিক হলে, উদয় তো অনেক লাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন, হচ্ছে, টাকাটা গেল কোথায়?

—আমরাও বুঝে উঠতে পারছি না।

বাসব আবার প্রসঙ্গ বদলালো।

—ভাল কথা, আপনাদের গুদামে নিতাই দত্ত নামে একজন কাজ করে। লোকটা কেমন বলতে পারেন?

—নিতাইকে আপনি কি ভাবে চিনলেন?

—গুদামে গিয়েছিলাম। আলাপ হয়েছিল ওখানেই। বললেন না তো লোকটা কেমন?

—খারাপ হলে ওকে রাখা যেত না। গোবেচারা ধরনের লোক।

—ওর একটা ভাই আছে?

—হ্যাঁ।

—তার নাম নিমাই দত্ত?

সোমনাথ সচকিত হলেন।

দ্রুত গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি নিমাইকে চেনেন?

—না। আপনি ভালভাবেই চেনেন মনে হচ্ছে। ইতঃস্তত না করে বলুন, নিমাই কি নিতাইয়ের যমজ ভাই?

—হ্যাঁ। পাশাপাশি দাঁড়ালে বোঝার উপায় নেই, কে নিতাই কে নিমাই!

—নিতাই তো আপনাদের ওখানে কাজ করে। নিমাই কি করে?

—শুনেছি প্রোপার্টি ডিলার।

—এই বাড়িটা তো আপনি কিনেছেন, নাকি ভাড়ায়—

—বছর কয়েক আগে কিনেছি।

—নিমাই প্রোপার্টি ডিলার। সে বোধহয় এই বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল?

—আমার সঙ্গে নিমাই-এর কোন যোগাযোগ নেই।

—ওদের ঠিকানাটা যদি লিখে দেন ভাল হয়। আমি নিমাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সোমনাথ অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বললেন, নিমাই, নিতাইকে নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। আমি এইটুকু বলতে পারি উদয়ের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল না। অফিসিয়াল রেকর্ড দেখে ঠিকানাটা কাল আপনাকে দিয়ে দেব।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

নীরবস্রোতা শৈবাল আর এনায়েতও ওকে অনুসরণ করল।

—চলি এখন—বাসব বলল, তবে একটা হেঁয়ালীর সমাধান হয়ে গেছে বলা চলে।

সোমনাথও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—কাঠ চুরি আর দলিল দস্তাবেজের চুরি—এই দুটো ঘটনাই অনেক আগে জানাজানি হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। তা হয়নি। জানাজানি হল উদয় চৌধুরীব মৃত্যুর পর। দুটো ঘটনার পর্দা ফাঁস আপনিই করলেন। কাজেই ব্যাপারটা আর হেঁয়ালী পর্যায় নেই।

—দেখুন—মানে...

সোমনাথ কথা শেষ করার আগেই ওরা রাস্তায় নেমে পড়েছে।

ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া রোডে বাসব যখন শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছাল তখন বেলা দশটার কাছাকাছি। আজ সকালেই উদিত ফোন করে নিতাই নিমাই-এর ঠিকানাটা জানিয়েছিল। ওরা নম্বর দেখতে দেখতে স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগুচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা বাড়ির সামনে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে, একটা পুলিশ জিপও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কেমন যেন উত্তেজনাকর পরিবেশ।

ওরা দ্রুত এগুলো।

কাছাকাছি পৌঁছে শৈবাল বলল, এই বাড়িটাই তো দেখছি আঠাশের সি।

বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—নিতাই-নিমাই এখানেই থাকে। কোন একটা অঘটন ঘটেছে ডাক্তার। নেপথ্য নায়কের চালটা এবার জবর গোছের হয়েছে মনে হচ্ছে।

উপস্থিত উত্তেজিত লোকেদের একজনকে শৈবাল প্রশ্ন করল, কি হয়েছে এখানে?

—এবাড়ির একজন ভাড়াটে খুন হয়েছে শুনেছি।

এবার ওরা দরজার কাছ বরাবব পৌঁছাল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারল না। দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। ওরা বাধা দিল। ওদের বক্তব্য হল ভেতরে যাবার অনুমতি নেই। বাসব পকেট থেকে নিজের কার্ড বার করে এগিয়ে ধরল।

বলল, কার্ডটা আপনাদের অফিসারকে গিয়ে দিন। মনে হয় ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেতে অসুবিধা হবে না।

কার্ড ভেতরে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরেই তদন্তকারী বেরিয়ে এলেন। সোমেন মল্লিককে দেখে বাসব খুশি হল। শুধু পূর্ব পরিচিত নয়, দুবার একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হওয়ায় বুঝতে অসুবিধা হয়নি লোকটা ভাল।

মল্লিক বললেন, আপনি হঠাৎ এখানে—

—নিমাই দত্ত নামে একটা লোক এই বাড়িতে থাকে—বাসব বলল, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখানকার হালচাল তো অন্য রকম দেখছি।

সোমেন মল্লিক অবাক হয়ে বাসবের দিকে তাকাল।

—কি হল?

—নিমাই দত্ত খুন হয়ে গিয়েছে। সেই সূত্রেই তো আমার এখানে আসা।

এবার বাসবের অবাক হবার পালা।

—কখন ঘটেছে ঘটনাটা?

—আমি বেলা আটটার সময় খবর পেয়ে এখানে এসেছি। রক্ত যে ভাবে

জমাট হয়ে গেছে তাতে মনে হয় দুর্ঘটনা রাত তিনটের আগে কখনই ঘটেনি। উপরে আসুন। দেখলেই বুঝতে পারবেন।

—চলুন—

উপরে উঠতে উঠতে বাসব নিমাই দত্তকে কেন খুঁজছিল বলল। নোংরা সিঁড়ি। দাগ ধরা দু'পাশের দেওয়াল। উপরে উঠেই একটা টানা বারান্দার মুখোমুখি হতে হল। নড়বড়ে লোহার শিক দেওয়া রেলিং। এধারে পর পর ঘর। এই মেস বাড়ির চেহারায় সাবেকি কলকাতার ছাপ রয়ে গেছে যেন। সিঁড়ির মুখ থেকে গজ দশেক দূরের ঘরখানার সামনে উত্তেজিত ভঙ্গীতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ দলে পুলিশের লোকও আছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে, রক্তারক্তি কান্ডটা ঘটেছে ওখানেই।

সোমেন মল্লিককে দেখে সকলে একপাশে সরে গেল। উনি বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সিঙ্গল বেড এর উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে নিমাই দত্ত। চেহারা দেখে কে বলবে লোকটা নিতাই দত্ত নয়। গুলি গলা ভেদ করেছে মনে হয়। বালিশ ও বিছানায় ছড়িয়ে থাকা রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে।

ফটোগ্রাফার নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলা শেষ করেছেন। অন্যান্য করণীয় কাজগুলিও শেষ করা গেছে। বাসব খাটের কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছু দেখল। ঘন্টা সাত-আট আগে যে লোকটা মারা গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় ঘুমন্ত অবস্থাতেই গুলি করে মারা হয়েছে।

মল্লিক প্রশ্ন করলেন, কি রকম দেখছেন?

বাসব বলল, দরজার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ভেঙ্গে ঢুকেছেন। অর্থাৎ হত্যাকারী ঘরে ঢোকার সুযোগ না পেয়ে বারান্দা সংলগ্ন জানলার ওধারে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছে। জানলা আর খাটের মধ্যেকার দূরত্ব হাত-চারেকের বেশি নয়।

—আমারও তাই ধারণা।

—অথচ এই মেস বাড়িতে এত লোক থাকা সত্ত্বেও কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। অর্থাৎ সাইলেন্সার ব্যবহার করা হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বোর্ডারদের মধ্যে কেউ যদি খুন না করে থাকে, তবে বাইরের লোক গভীর রাত্রে ভেতরে এল কিভাবে।

মল্লিক বললেন, এখনও কারুর সঙ্গে কথা হয়নি। কোনরকম ধারণা তাই খাড়া করা যাচ্ছে না। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। তারপর—। আপনি বরং ততক্ষণ—

—আপনার অসুবিধা না হলে আমি মেস-এর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—অসুবিধার কিছু নেই। এই যে, শুনুন—

মল্লিকের আহ্বানে, বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। মোটা শরীর। ভয়ে ভাবনায় মুখ থমথম করছে। কাছাকাছি এসে ঢোক গিললেন।

—ডাকছেন স্যার।

—এই ভদ্রলোক আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইবেন। উত্তর দেবেন ভালভাবে। আমি বডি চালান করে দেবার পর আপনার সঙ্গে কথা বলব। মিঃ ব্যানার্জি, তাহলে—

—ঠিক আছে।

বাসব বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শৈবাল ও মেস ম্যানেজার সঙ্গে আছে।

বাসব বলল, কোথাও বসে কথা বলতে চাই।

—আসুন স্যার। একতলায় অফিস ঘর।

ম্যানেজারের পিছু পিছু ওরা অফিস ঘরে এল। ঘরের রূপরেখা আহামরি কিছু নয়। একটা সেকেলে টেবিল আর খান চারেক চেয়ার—টেবিলের ধারে গোটা কয়েক বাঁধানো খাতা রাখা রয়েছে।

বসার পর বাসব প্রশ্ন করল, ম্যানেজারবাবু, আপনার নাম কি?

—প্রিয়নাথ হাজরা। কি ঝামেলায় পড়লাম বলুন তো? ব্যবসা চলবে না। সব বোর্ডার পালিয়ে যাবে ভয়ে।

—চিন্তা করবেন না। ব্যবসা ঠিক চলবে। কলকাতায় বাস সমস্যা এখন ভয়ঙ্কর। এই মেস বাড়ির মালিক কে?

—আজ্ঞে, আমি—।

—তাই ভয় ঘিরে ধরেছে। কত বোর্ডার আছে এখানে?

হাজরা বললেন, বত্রিশজন। বারটা ঘর আছে।

—হিসাব তো ঠিক মিলছে না। ছত্রিশজন হওয়া উচিত ছিল।

—আসল কথা হল স্যার। দশটা ঘরে তিনজন করে আছেন। বাকী দুটো ঘরে নিমাই দত্ত যিনি খুন হয়েছেন তিনি, আর পুলক সরকার একা, একা ব্যবস্থা করেছিলেন।

নিমাই দত্তর ভাই নিতাই দত্তও তো এখানে থাকেন।

—হ্যাঁ। আগে একই ঘরে থাকতেন দুই ভাই। বছর খানেক হল আলাদা ব্যবস্থা—

—দুজনের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছিল?

—না, স্যার। আর্থিক অবস্থাটা নিমাই দত্ত ইদানিং ফিরিয়ে ফেলে ছিলেন। একদিন এসে বললেন, তিন বেড-এর ঘরে থাকতে পারবো না। আলাদা ব্যবস্থা করুন। পুরো ঘরের ভাড়া দেব।

—পুলক সরকার—উনি কি পুরনো বোর্ডার?

—মাস ছয়েক আগে নিমাইবাবুই ওঁকে এনেছিলেন। ভদ্রলোক একটা পুরো ঘরই ভাড়া নিলেন। তবে গতকাল উনি চলে গেছেন।

বাসব সচকিত হল।

—চলে গেছেন?

—ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন, কানপুর যাচ্ছেন। ওখানে জরুরী সমস্ত কাজ আছে।

বাসব কথার মোড় ঘোরাল।

—নিমাই আর নিতাই যমজ ভাই, নয়কি?

—হ্যাঁ। এরকম চেহারায় মিল বড় একটা দেখা যায় না। এক, এক সময় আমরাই থতিয়ে যেতাম—কে কোন্ জন?

—আমার যতদূর মনে হল, ভাই-এর মৃতদেহের কাছাকাছি নিতাই দত্তকে দেখলাম না।

—এখানে নেই। গত সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর গেছেন। এই দুঃসংবাদ যে করে উনি জানতে পারবেন বুঝতে পারছি না।

—কৃষ্ণনগর গেলেন কেন?

—আমাকে তো বলে গেলেন অফিসের কাজে যেতে হচ্ছে।

—পুলক সরকারের সঙ্গে নিতাই দত্তর কেমন সম্পর্ক ছিল?

—দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হতে তো দেখিনি। পুলকবাবুর সঙ্গে নিতাইবাবুরই যা ভাব ভালবাসা ছিল।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এই মেস বাড়ির সদর দরজা কটায় বন্ধ হয়?

—প্রতিদিন দশটার সময় সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে বাবুরা মাঝে মধ্যে রাত্রের শো সিনেমা যান। তখন ভেজানো থাকে। ওঁরা ফিরে এসে বন্ধ করে দেন।

—গতকাল কেউ নাইট শো সিনেমা গিয়েছিল?

মালিক কাম ম্যানেজার একটু ভেবে নিয়ে বললেন, মানিকবাবু আর তরুণবাবু গিয়েছিলেন। ওঁরা ভারি সিনেমা ভক্ত।

—এর মানে দাঁড়াল, গত রাত্রে অন্তত রাত একটা পর্যন্ত সদর দরজা বন্ধ ছিল না। আপনি কোথায় থাকেন?

—আমি সপরিবারে একতলায় থাকি। এলাকাটায় দরজা বসিয়ে মেস-এর থেকে আলাদা করা আছে।

বাসব চিন্তিত মুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, পুলক সরকারের ঘরে কোন বোর্ডার এসেছে?

—না। ঘরটা তালা বন্ধ করে রেখেছি।

—চাবি নিয়ে চলুন। আমি ঘরটা দেখতে চাই।

মালিক কাম ম্যানেজারের পকেটেই চাবির থোকা ছিল। উনি দোতলায় গিয়ে একটা দরজার তালা খুললেন। জানলা দুটো বন্ধ ছিল। কাজেই আলো জ্বালতে হল। আসবাব বিশেষ নেই। একখানা খাট। ছোট একটা টেবিল আর গোটা দুয়েক চেয়ার। বিস্ময়ের বিষয় টেবিলের উপর পুরানো চেহারার টেলিফোন রয়েছে।

এই সময় ইন্সপেক্টার এসে পড়লেন।

বাসব বলল, টেলিফোন তো অফিস ঘরে থাকা উচিত। বোর্ডারের ঘরে রয়েছে কেন?

—ছিল তো অফিস ঘরেই। পুলকবাবু এখানে আসবার পরই ব্যবস্থাটা পাল্টে গেল।

—কি রকম?

উনি বললেন, ওঁর ঘরে ব্যবস্থা করে দিলে ফোনের দরুণ প্রতি মাসে একশ টাকা দেবেন। আমার দরকার হলে আমিও ফোন করতে পারবো। আমি রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

ইন্সপেক্টার ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু কিছু অসঙ্গতি আছে অনুমান করে নিয়ে বললেন, আপনার বিল তো বেড়ে যাচ্ছিল না। উনি কতবার ফোন করেছেন তার হিসাব তো রাখতে পারেন নি। হয়তো মাঝে মধ্যে ট্রাঙ্ককলও করতেন।

একগাল হেসে মালিক কাম ম্যানেজার বললেন, আমিও এত কাঁচা লোক নই স্যার। তার একটা ব্যবস্থা ছিল।

—কি ব্যবস্থা?

—অফিস রুমে একটা সিস্টেম করা আছে। উনি ফোন কবতে চাইলে আমি সুইচ অন করে দিতাম। ট্রাঙ্ককল্ তো করতেন না। সবই লোকাল। প্রতি কল একটাকা করে চার্জ করতাম।

—ওদিক থেকে কল এলে?

—লাইন দিয়ে দিতাম।

এবার বাসব বলল, আপনাকে তো এই ফোনের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত থাকতে হত?

—একেবারেই নয়। সন্ধ্যাবেলা মাঝে মধ্যে ফোন করতেন। ওধার থেকে অবশ্য প্রতিদিনই ফোন আসতো। তবে ঐ সন্ধ্যাবেলায়।

—উনি কোথায় ফোন করতেন বা কোথা থেকে ফোন আসতো বলতে পারেন?

—তাতো বলতে পারবো না।

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন। ইন্সপেক্টার সাহেব পরে আপনার এজাহার নেবেন। ভাল কথা, আপনার কোন কর্মচাবী আছে?

—রামহরি আছে। বোর্ডারদের ঘরদোর সেই পরিষ্কার করে। ফাইফরমাশ খাটে।

—তাকে দরকার হবে। পাঠিয়ে দিন।

মালিক কাম ম্যানেজার বিদায় নেবার পর বাসব সব কথা বলল ইন্সপেক্টারকে।

—আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন—ইন্সপেক্টার বললেন, পুলক সরকারের রকম সকম আমারও ভাল ঠেকছে না। সমস্যা হল, লোকটাকে এখন পাওয়া যাবে কোথায়?

—এক কাজ করা যেতে পারে। এক্সচেঞ্জে খোঁজ নিন, কয়েক দিনের মধ্যে এই নম্বরে কোথা কোথা থেকে ফোন এসেছে এবং এখান থেকে কোথায় কোথায় ফোন করা হয়েছে। তাহলে আমরা সঠিক পথটা পেয়ে যাব।

—ঠিক বলেছেন। আজই খোঁজ নিচ্ছি। এদিকে তো ভিক্টিমের আত্মীয়স্বজনের

কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। যমজ ভাইও তো উধাও।

—তাকে অবশ্য আপনি পাবেন। শুনলাম অফিসের কাজে বাইরে গেছে। অফিসের ঠিকানাটা আপনাকে দিচ্ছি। কালকেই ফিরে আসবে মনে হয়।

আরো দুচার কথার পর বাসব বলল, রামহরিকে বাজিয়ে দেখলে হয়তো কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। ঐ যে লোকটা আসছে।

রামহরি ভীত সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে উপস্থিত হল। বয়স পঞ্চাশের কিছু উপরেই হবে। বেঁটে-খাটো, আঁট-সাঁট চেহারার লোক। মনে হয় না স্বভাবে বেশ প্যাঁচালো হবে।

হাতজোড় করে বলল, আমাকে ডেকেছেন দারোগাবাবু?

—তোমার ঘাবরাবার কিছু নেই—ইন্সপেক্টার বললেন, গোটা কয়েক প্রশ্ন করবো। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। এধার ওধার করবার চেষ্টা করলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে বলে রাখছি।

রামহরি কোনরকমে বলল, আমি তো কিছু জানি না। নিমাইবাবুর ফাই-ফরমাশও খাটতাম না। উনি তো—

—বেশি কথা বলবে না। যে প্রশ্ন করছি, তার উত্তর দাও। পুলকবাবু কবে এখানকার ঘর ছেড়েছেন?

—কালকে এই রকমই নটা দশটার সময়। আমি তখন অফিস ঘরে ছিলাম।

—ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল?

—উনি টাকা দিলেন। বলছিলেন, কয়েক মাস কলকাতার বাইরে থাকবেন। কি সমস্ত কাজ আছে। আবার ফিরে এলে উঠবেন এখানে।

বাসব বুঝল রামহরির কথাবার্তায় বাঁধুনি আছে।

ইন্সপেক্টার বললেন, তুমি এখানে কতদিন কাজ করছো?

রামহরি মনে মনে হিসাব করে নিয়ে বলল, সাত বছর হয়ে গেছে।

—তুমি রাত্রে থাকো কোথায়?

—সদর দরজার পাশে একটা ছোট ঘর আছে, ওখানেই থাকি।

—নিমাইবাবু আর নিতাইবাবুর মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

—আমি তো ওঁদের কখনো ঝগড়া করতে দেখিনি দারোগাবাবু।

এতক্ষণ পরে বাসব কথা বলল।

—গত রাত্রে কটার সময় শুয়েছিলে তুমি?

—এগারোটা হবে বাবু।

—দুজন তো সিনেমা গিয়েছিলেন। ওঁরা কখন ফিরেছেন, তুমি তাঁহলে জান না?

—আজ্ঞে না। প্রায় রোজই কেউ না কেউ রাত করে ফেরেন। কত জেগে থাকবো?

—তা ঠিক। কিন্তু রামহরি, মানিকবাবু তো অন্যরকম কথা বলছেন।

বাসবের সপাট মিথ্যা কথাটা রামহরির চেহারায় কিছুটা সতর্কতা এনে দিল।

—আজ্ঞে মানিকবাবু—

—যে দুজন গত রাত্রে নাইট শো দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে তো একজন মানিকবাবু। তুমি বলছো, এগারোটার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। অথচ মানিকবাবু বললেন, একটার সময় ওঁরা যখন ফেরেন তখন তুমি জেগেছিলে?

রামহরি কেমন থতিয়ে গেল।

ঢোক গিলে, ইতঃস্তত ভঙ্গীতে বলল, এগারোটার সময় চোখ লেগে গিয়েছিল বাবু। তারপর ওঁরা এলেন তো। শব্দ টব্দ হল, ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল।

—দরজা বন্ধ করল কে?

—আজ্ঞে...মানে...

শোন রামহরি, আমরা অনেক কিছু জেনেছি। সত্যি কথাটা এবার বলো। নইলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

—আমি আর কিছু জানি না বাবু। বিশ্বাস করুন—

বাসব গম্ভীর গলায় বলল, মিঃ মল্লিক, ভাল কথায় কাজ হবে না। এই লোকটা আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। একে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে চলুন। ওখানে ওষুধ পড়লেই পাখী পড়ার মত সত্যি কথাগুলো বলবে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল রামহরি।

ইন্সপেক্টারের পায়ের উপর আছড়ে, কান্না জড়ান গলায় বলল, আমায় থানায় নিয়ে যাবেন না দারোগাবাবু। আমি কিছু করিনি।

মল্লিক বললেন, ন্যাকামি বন্ধ করো। তুমি কিছু করেছো আমরা একবারও বলছি না। যা জানো সেটাই বলো।

—আমি কিছু জানি না।

—জানো কিনা থানাতে গেলেই বোঝা যাবে। বুলাকিলাল—

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কনস্টেবল ছুটে এল।

—এই লোকটাকে হ্যান্ডকাপ পরাও। হিঁচড়ে নিয়ে চল থানায়।

রামহরির কান্না আর অনুনয়ের ভঙ্গী দেখে বাসবের দয়া হচ্ছিল। কিন্তু ওসমস্ত বিকারকে এখন প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ওর অভিজ্ঞ মন বলছে, সঠিক জায়গায় ঘা দেওয়া হয়েছে। রামহরি এমন কিছু নিশ্চয় জানে যা এই তদন্তের পক্ষে সহায়ক।

কান্না ভেজা গলায় রামহরি একই কথা বার বার বলে চলেছে, আমি কিছু জানি না। বিশ্বাস করুন—নিমাইবাবুকে কে খুন করেছে আমি দেখিনি—

মল্লিক ধমকে উঠলেন।

—থামো। তুমি কি ভেবেছো কাঁদতে থাকলেই রেহাই পেয়ে যাবে? যদি বাঁচতে চাও, সত্যি কথা বলো। এত রাত পর্যন্ত কেন জেগে ছিলে তুমি? মানিকবাবুরা ফিরে আসার পর, কে এসেছিল এখানে?

বাসব বলল, কেন অকারণে জেলে পচবে? যা সত্যি তাই বলো। আমরা কথা দিচ্ছি, যাতে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ো তার ব্যবস্থা করবো।

কাঁধে রাখা গামছা দিয়ে নাক মুখ মুছে নিয়ে রামহরি কয়েকবার ঢোক গিলল।

ভারি কাহিল দেখাচ্ছে তাকে। কয়েকবার ঘাড় চুলকে নিয়ে কি বলতে গিয়েও থামল। তারপর মনের মধ্যে জোর আনবার চেষ্টা করল বোধহয়।

—দারোগাবাবু, আমি বড় গরীব—

—বটেই তো। গরীব না হলে মেসের চাকর হবে কেন? ভনিতা করতে হবে না। যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো?

—আমি গরীব মানুষ। লোভে পড়ে বাবু কাজটা করে ফেলেছি। মানিকবাবুরা ফিরে আসবার পর আমি দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম—

—কি হল তারপর?

—পুলকবাবুকে দেখলাম।

—বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছিল?

—না, দারোগাবাবু। উনি ভেতরেই ছিলেন। সদরের দিকে আসতেই দেখা হয়ে গেল। আমি জেগে থাকবো উনি ভাবতে পারেননি। চমকে উঠলেন।

—তোমায় কিছু বলল লোকটা?

—আমিই বললুম, আপনি তো চলে গিয়েছিলেন। আবার কখন এলেন? উনি বললেন, কিছুক্ষণ আগে। শোন রামহরি, আমি এখানে এসেছিলাম বলবে না। এই টাকাটা ধরো।

—কত টাকা দিয়েছিল।

—একশ টাকা। আমি গরীব মানুষ। লোভে পড়ে গেলাম। উনি আরো বললেন, টাকা নিয়েও যদি বেইমানি করো, ভীষণ বিপদে পড়বে।

—তারপর কি হল?

—উনি চলে গেলেন। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ভগবানের দিব্যি খেয়ে বলছি দারোগাবাবু আর কিছু জানি না।

রামহরিকে আর কোন প্রশ্ন করা হল না।

সোমেন মল্লিক বাসবকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক পা সরে গিয়ে চাপা গলায় কি সমস্ত আলোচনা করলেন। বাসবও একটানা কি সমস্ত বলল। মল্লিক আবার সরে এলেন রামহরির দিকে।

বললেন, এখন ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তোমার উপর নজর রাখা হবে। পালাবার চেষ্টা করলে ভগবানও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

আরো মিনিট দশেক পরে বাসব মেসবাড়ি থেকে শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। তখনও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বহুলোক নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে। সদরের কাছাকাছি পৌঁছাবার পর ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থলের নির্দেশ দিয়ে দুজনে বসল ভেতরে।

বাসব প্রশ্ন করল, কি বুঝলে ডাক্তার?

—পুলক সরকার কাণ্ডটা বাধিয়েছে সন্দেহ নেই—শৈবাল বলল, তবে নিমাইকে খুন করার কারণ কি বুঝতে পাচ্ছি না।

—আমিও বুঝতে পারছি না। মূল ঘটনার সঙ্গে এই খুনের কোন সম্পর্ক

আছে কিনা, তাও আঁচ করা যাচ্ছে না। অনেক ভাবতে হবে।

—পুলক সরকার তো সকালে মেস ছেড়ে চলে গিয়েছিল। রাত্রে কি ভাবে ঢুকলো?

—পুলক সরকারের অজানা ছিল না, মেসবাড়ির সদর দরজা বোর্ডারদের কল্যাণে অনেক রাত পর্যন্ত শুধুমাত্র ভেজানো থাকে। সকালেই সে প্ল্যান অনুসারে মেস ছেড়ে দিয়েছিল। ফিরে আসে বেশ রাত্রে। মনে হয় রামহরি তখন শোবার ব্যবস্থা করছিল নিজের ঘরে। সে পুলককে লক্ষ্য করেনি। পুলক উপরে গিয়ে জানলার এধারে দাঁড়িয়ে সাইলেন্সারের সাহায্যে নিমাইয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলে। কিন্তু ফেরার সময় কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। সিনেমাপার্টি ফিরে আসার দরুণ ওকে কোন অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে পড়তে হয়। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার মুখেই দেখা হয়ে যায় রামহরির সঙ্গে।

—লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে পুলক সরকারকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয় কি?

—একটা সূত্র হাতে রয়েছে। টেলিফোন। পুলক কাকে ফোন করতো—তাকে কারা ফোন করতো, এটা জানা গেলেই, পরিস্থিতি গ্রিপের মধ্যে এসে যাবে মনে হয়। মল্লিক আজই খোঁজখবর নেবেন।

—তুমি এখন কি করবে?

—আজ সারাটা দুপুর চিন্তা-ভাবনায় কাটিয়ে দেব। আর অফিসে নয়, বিকেলে লোকেন বাগচীর বাড়ি পৌঁছোবো। কর্তার সঙ্গে তো কথা বললাম, এবার গিন্নীকে বাজিয়ে দেখতে হবে। জানি না কোন সুফল পাওয়া যাবে কিনা। তবু যেতে পারে।

আর বিষে কোন কথা হল না।

বেলা চারটের সময় ইন্সপেক্টার মল্লিক এলেন।

বাসব তখন ক্রিমিনাল ইন্টারন্যাশনাল-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। বাসবের দিকে তাকিয়ে মল্লিক হাসলেন। তাঁকে কিছুটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। অর্থাৎ কাজে লাগে এমন কিছু সংবাদ উনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। অনায়াস ভঙ্গীতে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টার।

তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বললেন, পুলক সরকার মেসবাড়ি থেকে যে বার কতক ফোন করেছে তা একই নম্বরে।

—পুলককে কারা কারা ফোন করেছিল?

—পুলককে একই লোক পাঁচবার ফোন করেছে।

—লোকটা কে? ঠিকানা পেয়েছেন নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। চৌরঙ্গী টেরেসে থাকে। লোকটার নাম অসীম ঘোষাল। আজ রাত্রেই লোকটাকে ঘিরবো। আপনি সঙ্গে থাকবেন?

বাসব চমৎকৃত হল।

এই তাহলে ব্যাপার!

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপত্তি নেই। লোকটাকে আমি চিনি।

মহা আশ্চর্য হয়ে মল্লিক বললেন, চেনেন। বলেন কি?

—আমার হাতে বর্তমানে যে কেস রয়েছে, তারই তদন্তের সূত্রে ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল লোকটা ঘোড়েল? আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে।

—কি বলুন তো?

—সার্চ-ওয়ারেন্ট সঙ্গে নেবেন। আমরা ওর ফ্ল্যাটে খানা-তল্লাশ আরম্ভ করলে ঝামেলা খাড়া করতে পারে। আর আমার মতে খানা-তল্লাশটা জরুরী।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চিন্তিত গলায় মল্লিক বললেন, ঠিকই বললেন; তবে এই অসময়ে সার্চ ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করা একটু মুশকিল হবে। দেখি—

আরো দু'চার কথার পর উনি বিদায় নিলেন।

রাত এখন একটা।

অসীম ঘোষাল মিনিট পনেরো আগে নিজের আস্তানায় ফিরেছেন। বিশেষ কাজে দুর্গাপুর গিয়েছিলেন। তখন ভাবেননি ফিরতে এত রাত হয়ে যাবে। ফ্ল্যাটে পুলক ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরিবারের সদস্যরা গতকাল দেশের বাড়িতে গেছে।

বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিলেন ঘোষাল। তারপর ড্রইংরুমে এসে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। পুলক জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান ছিল। সিগারেটের ছোট হয়ে যাওয়া টুকরোটা এবার ফেলে দিয়ে বসল এসে মুখোমুখি। ওকে দেখে একেবারেই মনে হয় না, দিন দুয়েক আগে গুলি চালিয়ে একটা লোককে খুন করেছে।

ঘোষাল বললেন, কালকেই পার্টিদের কাছে থেকে টাকা পাওয়া যাবে। সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে। তারপরই তুমি কলকাতা থেকে কেটে পড়বে। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছো?

পুলক বলল, আমি রাজৌরি চলে যাব। ওখানে আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধু আছে। ওর সঙ্গে ঠিকেদারী করবো স্থির হয়ে আছে।

—নিজের নামটা পাল্টে ফেলো। জায়গাটা কোথায়?

—উত্তরপ্রদেশে। একটা কথা বলছিলাম—

—বলো।

—নিমাইয়ের মত একটা বিরক্তিকর চরিত্রকে সরিয়ে দিয়েছি। লোকটা বেঁচে থাকলে আমরা নিশ্চিত ভাবে বিপদে পড়তাম। ওর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবার কথা ছিল। টাকাটা—

—তুমি পাবে। ওর বেঁচে থাকাটা ঠিক হত না। স্বীকার করতেই হবে, কাজটা তুমি ভারি পরিষ্কার হাতে করেছো।

ঠিক এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

ঘোষাল সচকিত হলেন। পুলকও।

এত রাত্রে কে এল?

বেল বিরতি দিয়ে দিয়ে চলেছে।

ঘোষাল ভাবতে লাগলেন, এত সাহস কার—এই ভাবে মাঝরাত্রে বিরক্ত করছে? অতিষ্ঠ ভঙ্গী নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠলেন। ছিটকিনি খুলে, দরজার একটা পাল্লা সরাতেই অবাক হয়ে গেলেন। বাসব দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘোষাল এবার বিরক্ত হলেন।

তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, মাঝরাত্রে এ কি ধরনের রসিকতা! আপনি আমার পিছনে লেগে আছেন কেন বলুন তো? এই রকম চলতে থাকলে আমি কিন্তু পুলিশকে ইনফর্ম করতে বাধ্য হব।

বাসব শান্ত গলায় বলল, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। পুলিশ সঙ্গেই আছে। ইন্সপেক্টার, ঘোষালসাহেব আপনাদের জন্য বড়ই কাতর হয়ে পড়েছেন। কি বলতে চান শুনে নিন।

সোমেন মল্লিক এবার চারজন সহযোগিকে সঙ্গে নিয়ে দেখা দিলেন। ঘরে প্রবেশ করলেন সকলকে নিয়ে। অসীম ঘোষাল এতটা আশা করেন নি। আশঙ্কা আর ভয় ওঁকে জাপ্টে ধরল। বলা বাহুল্য পুলক সরকার পরিস্থিতি বুঝেই ড্রইংরুম থেকে অদৃশ্য হয়েছে। ঘোষাল নিজেকে স্বাভাবিক করে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, আপনারা এই সময়—ব্যাপারটা কি?

মল্লিক বললেন, নিমাই দত্ত খুন হয়েছে। এখন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চললেই আপনার মঙ্গল।

—কে নিমাই দত্ত? আমি তো—

—ন্যাকামি করবেন না মশাই। যা জানতে চাইছি তার সঠিক উত্তর দিন। আপনার সাকরেদ পুলক সরকার কোথায়?

বিস্ময়ের সুরে ঘোষাল বললেন, পুলক! সে আমার কর্মচারী। এই সময় তো তার এখানে থাকার কথা নয়। মিথ্যার জাল কিছু করছে নাকি?

—মিথ্যার জাল বুনে কোন লাভ নেই। আপনি পরিষ্কার করে কিছু বলবেন না বুঝতে পারছি। চুপচাপ সোফায় গিয়ে বসুন। আপনার ফ্ল্যাটটা আমরা এখনই সার্চ করবো।

ঘোষাল লাফিয়ে উঠলেন।

—সার্চ করবেন মানে? বেআইনি ভাবে কোন কাজ আপনি করতে পারেন না। জোর করে যদি করতে যান, আমি হৈ-হল্লা করে লোক জড় করবো। তখন ঠেলাটা বুঝবেন।

—যত ইচ্ছে লোক জোগাড় করুন। ঠেলা সামলাবার সাধ্য আমাদের আছে। এই যে সার্চ ওয়ারেন্ট।

কথা শেষ করেই ইন্সপেক্টার ওয়ারেন্টটা মেলে ধরলেন।

ঘোষাল থতিয়ে গেলেন। এবার ভয় তাঁকে সাপটে ধরল। বুঝলেন ভাবি বিপাকে পড়ে গেছেন। সময় সময় অহেতুক আত্মপ্রত্যয় যে মানুষকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যায় এখন তিনি তার করুণ দৃষ্টান্ত। এখন বুঝছেন, আরো সাবধানতা মেনেই তাঁর পা ফেলা উচিত ছিল।

—ফ্ল্যাটে এখন আর কেউ আছে, না আপনি একলা আছেন?

ঘোষাল ঢোক গিলে ইন্সপেক্টারের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাট ফাঁকা রেখে যেতে পারি না তো। একজন কর্মচারীকে রেখে গিয়েছিলাম।

—দত্ত, পাশের ঘরে যে লোকটা আছে তাকে এখানে নিয়ে এস। জানা দরকার লোকটা পুলক সরকার কিনা। বলাই, জীপে মেস-এর চাকরটা বসে আছে। ওকে ওপরে নিয়ে এস।

দুজনে দুদিকে ছুটল।

দশ মিনিটের মধ্যেই সনাক্তকরণ হয়ে গেল। পুলক সরকারকে চিনে নিতে বামহরির কোন অসুবিধা হল না। দুজনকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হল। ঘোষাল অবশ্য অনেক আপত্তি করলেন। উঁচু মহলে তাঁর কি রকম প্রভাব তার উল্লেখ রাখলেন। ইন্সপেক্টার এ সমস্ত গ্রাহ্য করলেন না। শুধু জানিয়ে দিলেন, তাঁদের বক্তব্য আদালতে পেশ করার সুযোগ অবশ্যই থাকছে।

এরপর সার্চের কাজ আরম্ভ হল।

পনেরোশ স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্চ করা হল। সময় লাগল প্রায় আড়াই ঘন্টা। উসখুস করলেও ঘোষাল বাধা দিতে পারছিলেন না। পুলক ভয়ে ভাবনায় মিইয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফল অবশ্য ভালই পাওয়া গেছে। থার্টি সিক্স বোর-এর রিভলভারটা সাইলেন্সার সমেত পাওয়া গেছে স্টিল আলমারির মধ্যে।

পাওয়ার ক্ষেত্রে এখানেই সীমিত হয়ে যায় নি। ফাইল বন্দী অবস্থায় আটটা হ্যান্ডনোট পাওয়া গেল। এই সমস্ত হ্যান্ডনোটে উমানাথ চৌধুরী বিভিন্ন ব্যক্তিকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার দিয়েছেন। বাসব এতটা আশা করেনি। এখন ওর কাজ কিছুটা সহজ হয়ে এল।

ইন্সপেক্টার এ সম্পর্কে কিছু জানেন না। এটাই স্বাভাবিক। বাসব তঁকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা মোটামুটি বলল। তারপর অনুরোধ জানাল, হ্যান্ডনোটগুলো এই কেস-এ নথিভুক্ত না করতে। প্রয়োজন পড়লে লালবাজার থেকে এ সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাবে। একটু ইতঃস্তত করে ইন্সপেক্টার রাজী হলেন।

এবার দুজনে এসে দাঁড়ালেন অসীম ঘোষালের সামনে।

বাসব প্রশ্ন করল, এই হ্যান্ডনোটগুলো কোথা থেকে পেলেন?

ঘোষাল কোন উত্তর দিলেন না।

—চুপ করে থেকে লাভ নেই। উত্তর দিন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হোক।

—আমি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলবো না।

ঘোষালের উত্তর শুনে ইন্সপেক্টার গম্ভীর গলায় বললেন, উকিলের ছাতায় মাথা রক্ষা করতে পারবেন না। কোর্ট থেকে আপনাদের আমি রিমাণ্ডে নেব। তখন মুখ খুলতেই হবে।

তারপর বাসবের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, মহাপ্রভুদের তাহলে চালান করে দেওয়া যাক। পরে আপনার সঙ্গে বসে ভালভাবে আলাপ আলোচনা করে নেওয়া যাবে।

বাসব সম্মতি জানাল।

বাসব পরের দিন রিপন স্ট্রীটের সেই বার-এ গিয়ে উপস্থিত হল। খোঁজ খবর নিযে জানা গেল, উদয় চৌধুরীকে এঁরা বিলক্ষণ চিনতেন। সে এই বার-এব নিয়মিত গ্রাহক ছিল। খাতাপত্র ঘেঁটে জানা গেল ১৬ই জানুয়ারী সে শেষবার এখানে এসেছিল। তারিখ জানাবার কারণ হল, সেদিন পুরো বিল উদয় পেমেন্ট করেনি। বাকী টাকাটা খাতায় নোট করে রাখা হয়েছিল। পুরানো গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এরকম হয়েই থাকে। পরে বাড়ির ঠিকানায় বিল পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পেমেন্ট পাওয়া যায় নি।

মধ্যবযস্ক বার-এর ম্যানেজার বেশ স্মার্ট দর্শন। সাইমন হিসাবেই তিনি বিখ্যাত। প্রকৃত নাম সাইমন বিশ্বাস। ওঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এই গোয়েন্দা ভদ্রলোকের সঙ্গে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে কথা না বললে পুলিশ আসবে। এই ব্যবসার পক্ষে তা মোটেই স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

বাসব বলল, বাকী টাকার বিল করে চৌধুরীদের ওখানে পাঠিয়েছেন?

সাইমন বললেন, দিন পাঁচেক হল। টাকাটা অবশ্য পাওযা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে অন্যের দায় কেউ নিতে চায় না। তবু বিলটা পাঠিয়ে দিলাম।

—শেয যেদিন আপনি উদয় চৌধুরীকে দেখেন, সেদিনের কথা আপনার মনে আছে?

—চৌধুবী আর দশজনের মত ছিলেন না। বার-এ এলেই হৈ-হল্লা করতেন। সেদিন তো একজন বেয়ারাকে চড় মেরে বসেছিলেন। তবে মোটা টিপস দিতেন বলে কেউ ওঁর দুর্ব্যবহার গায়ে মাখত না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়েছিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, চড় মারার ব্যাপারটা কি?

সাইমন বললেন, দুপুরের দিকে এসেছিলেন। তখন বার-এ লোকজন কম। বসলেন গিয়ে কোণের দিকে একটা টেবিলে। হাঁক ডাক করলেন বেয়ারাকে। নাজামের ওঁর কাছে পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছিল—এই হল অপরাধ। এক চড় কসিয়ে দিলেন নাজামের গালে।

—নাজাম বলতে আপনি বেয়ারাকে মিন করছেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর কি হল?

—ব্যাপারটা হয়তো আরো অনেক দূর গড়াত, কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি মাঝখানে পড়ে সমস্ত কিছু মিটিয়ে দিলেন। নাজামকে কুড়িটা টাকা দিয়ে ওখান থেকে বিদায় করলেন।

বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—উদয় সেদিন তাহলে একলা আসেনি?

—না। সঙ্গে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ছিলেন।

—আপনি তাঁকে চেনেন না?

—না। সেদিনই প্রথম বার দেখলাম।

—উনিও কি উদয়ের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করেছিলেন?

একটু ভেবে নিয়ে সাইমন বললেন, না। আমি অন্য একজন বেয়ারাকে ঐ টেবিলে পাঠিয়ে ছিলাম। অর্ডার মত সার্ভ হবাব পর ভদ্রলোক চলে গিয়েছিলেন।

—উদয় কি একবারও নিজের চেয়ার থেকে উঠেছিল?

—আমার যতদূর মনে পড়ছে উনি একবার বেসিনের কাছে গিয়েছিলেন।

—কাছে কোন ব্রিফকেস বা ঐ জাতীয় কিছু ছিল?

—না।

—এরপর কি হল বলুন?

সাইমন আবার চিন্তা ভাবনা করে নিয়ে বললেন, আর বিশেষ কিছু হয়নি। আধ ঘণ্টাটাক পরে উদয় চৌধুরী চলে গিয়েছিলেন।

—বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, নয়কি?

—হ্যাঁ। আমি কাউন্টার থেকে লক্ষ্য করছিলাম।

—ধন্যবাদ মিঃ বিশ্বাস! অনেক কথা জানা গেল। ভবিষ্যতে আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে। ভাল কথা, আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?

—বছর সাতেক হল। তবে চাকরি বোধহয় আর থাকবে না।

—কেন?

—মালিক বার বিক্রী করে দেবার কথা ভাবছেন। নতুন মালিকরা কি আমাকে রাখবেন?

—এরকম নাও হতে পারে। আপনি অভিজ্ঞ লোক। আচ্ছা চলি—

বাসব ওখান থেকে সোজা চেতলায় পৌঁছাল।

সঙ্গে ওল্ডস মোবাইল থাকায় কোন অসুবিধা হয়নি। নির্দিষ্ট রাস্তায় পৌঁছে সহজেই বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল। ড্রেসিং গাউন শোভিত লোকেন বাগচী দরজা খুললেন। বাসবকে দেখে চমকে উঠলেন। এখন কি করা উচিত বা কি বলা উচিত ভেবে পেলেন না।

বাসবই সমস্যার সমাধান করল।

বলল, সহাস্যে, অতিথি দরজার সামনে অপেক্ষা করছে মিঃ বাগচী। তাকে সাদরে না হোক, অনিচ্ছার সঙ্গেই ভেতরে যাবার অনুমতি দিন।

থতমত খেয়ে বাগচী বললেন, নিশ্চয়—নিশ্চয়, আসুন—

বাসব ভেতরে গিয়ে বসল।

আধুনিক কায়দায় সাজানো ঘর। লোকেন বাগচী বুঝতে পারছেন না, গোয়েন্দা প্রবরের এখানে আগমনের হেতু। কাজেই বিব্রত ভঙ্গী নিয়ে বারংবার তাকাচ্ছেন এধার ওধার। বাসব বুঝতে পারল, অফিসে উনি যতটা কড়া, বাড়িতে তার চেয়ে বেশি লেজ গুটিয়ে থাকতে অভ্যস্ত।

বাসব বলল, আমি আসায় আপনি কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে?

—না, না তেমন কিছু নয়।

—ভাল কথা। আপনার স্ত্রীকে খবর পাঠান। তদন্তের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সচকিত ভঙ্গীতে বাগচী বললেন, আমি বারবার আপনাকে বলেছি এর চেয়ে বেশি আমরা কিছু জানি না। ওঁকে ডেকে কোন লাভ হবে না।

—লাভক্ষতির হিসাবটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আর সময় নষ্ট করবেন না। দুচার কথা ওঁর কাছ থেকে জেনে নিতে চাই। ওঁকে তো এখানে ডেকে আনুন।

—আপনি বুঝতে পারছেন না। আমার স্ত্রী এ সমস্ত পছন্দ করেন না। উনি হয়তো—

—আসতে চাইবেন না। এই কথাই বলতে চাইছেন তো? এই অসহযোগিতা কিন্তু আপনাদের বেশ অস্বস্তিতে ফেলবে মিঃ বাগচী। কিছু মনে করবেন না, ফোন ব্যবহার করছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে লালবাজারের সঙ্গে কথা বলে নেওয়াই ভাল।

বাসব ফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

—দাঁড়ান—

বামা কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আদেশ, সোফায় এসে বসুন।

বাসব ঘুরে দাঁড়াল।

ঊর্মিলা বাগচী ঘরে প্রবেশ করেছেন। ভারি চেহারার দশাসই মহিলা। কোঁচকানো ভ্রূ, গোল মাংসল মুখের দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কড়া সুরে নিজের ধাতকে ইনি বেঁধে রেখেছেন। গজেন্দ্র গমনে এগিয়ে মহিলা একটা কোচ অধিকার করলেন।

বেশ বিরক্তির সুরে বললেন, আপনি আমার স্বামীকে বিরক্ত করছিলেন কেন? উনি কোনরকম সাত পাঁচে থাকুন আমি পছন্দ করি না।

বাসব বলল, আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

—কেন আপনি কথা বলতে চাইবেন? আমার ভাই খুন হয়েছে, দুঃখ আর আক্ষেপের সীমা নেই। তারপর এই ধরনের জুলুমের মানে কি? খুনের ব্যাপারে আমাদের তো কোন কিছুই জানবার কথা নয়।

—আমি তথাকথিত আসামী পক্ষ থেকে এই তদন্তে নিযুক্ত হয়েছি, আপনার

একথা অজানা নয়। আপনার বাবা, কাকা এবং ভাইরা আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন। আপনার স্বামীর সঙ্গেও কথা বলেছি। এক্ষেত্রে—

মহিলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

—ক্ষেত্র আবার কি? বরং আপনি আমাদের বাড়িতে চড়াও হয়ে কুরুক্ষেত্র বাধাবার চেষ্টা করছেন।

বাসব শান্ত গলায় বলল, আমি যে প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, পুলিশের তা জানা নেই। আপনার অসহযোগিতার মনোভাব দেখে আমার এখন মনে হচ্ছে, লালবাজার থেকে কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ভাল হত। কুরুক্ষেত্র কাকে বলে সহজেই বুঝতে পারতেন।

দ্রুত গলায় বাগচী বললেন, আর ঝামেলা বাড়িও না। উনি কি জানতে চান শোনো না। তারপর—

মহিলা দাবড়ে উঠলেন।

—তুমি থামো। সবটাতে নাক গলানো একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কার্টসি—ম্যানার, এ সমস্ত মনে রাখার চেষ্টা করো।

এর পর মহিলা গলা একটু নামালেন।

বাসবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—না। আপনি যাতে ঝামেলায় না পড়েন, সে কথাই বোঝাবার চেষ্টা করছি।

—আমিও ঝামেলা পছন্দ করি না। উদয়ের খুন হওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না ঐ সম্পর্কে আপনি কি জানতে চান?

বাসব বুঝলো ওষুধ ধরেছে।

আগেকার মতই শান্ত গলায় বলল, গুটিকয়েক অতি সাধারণ প্রশ্ন আমার আছে। আমি সঠিক উত্তর পেলেই খুশি।

—বলুন?

—আমি জানি, দুর্ঘটনার দিন দুপুরে আপনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। আপনার বাপের বাড়ির লোকেরা এই কথা বলেছেন।

—গিয়েছিলাম।

—আপনি নিজের চকলেট রং-এর ফিয়েট চড়ে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন সন্ধ্যার মুখে।

—হ্যাঁ।

—আপনি নিজের গাড়ি সেদিন কাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন?

—কাউকে না।

বাসব গলায় জোর দিয়ে বলল, তা কিভাবে সম্ভব? আমরা জানি, সেদিন বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের সময় আপনার গাড়ি রিপন স্ট্রীটের একটা বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

মহিলা আঁতকে উঠলেন।

—বার-এর সামনে! হতেই পারে না।

—ঘটনাটা তাই মিসেস বাগচী। প্রমাণ হাতে না থাকলে জোর দিয়ে কিছু বলতাম না।

—তা কি ভাবে সম্ভব? আমার গাড়িতো সারাক্ষণ বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে পার্ক করা ছিল।

—ছিল না। আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি। এবাব আপনি, সেদিন নিজের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

—অ্যাক্টিভিটি! তেমন কিছুই নয়। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, আমার ভাই-এর বৌ ভি. সি. আর.-এ ফ্লিম দেখছে। আমিও বসে পড়লাম। পাঁচটা পর্যন্ত দুটো ক্যাসেট দেখেছি। তারপর চা-টা খেয়ে ফিরে এসেছি।

—বাড়িতে তখন পুরুষ কে ছিল?

—কাকা আর দুই-ভাই কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাবা ছিলেন নিজের ঘরে। উদয়ও ছিল তখন।

—উদয়বাবু নিজের ঘরে ছিলেন?

—না। বাবার সঙ্গে কথা বলছিল। আমি ভেতর বাড়িতে যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—তখন কি উদয়বাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল?

—আমার যতদূর মনে পড়ছে, সে ইতস্তত ভঙ্গী নিয়ে কথা বলছিল।

—উনি বাড়ি থে॰ে বেরিয়ে ছিলেন কটায়?

ভদ্রমহিলা একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেও, যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে বললেন, লক্ষ্য করিনি। আমি তো ওধারে সিনেমা দেখছিলাম।

—গাড়ির চাবিটা কি সারাক্ষণ আপনার কাছেই ছিল?

—না। ড্যাশবোর্ডে আটকে রেখেই আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছিলাম।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

—ধন্যবাদ। আপনাকে কিছুক্ষণ বিবক্ত করলাম। আমি অবশ্য তদন্তের ব্যাপারে কিছুটা লাভবানই হয়েছি। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। চলি।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

বাগচী দম্পতি 'চা খেয়ে যান' ধরনের ভদ্রতা দেখালেন না। দুজনেই নির্বিকাব মুখে তাকিয়ে রইলেন। কিছুটা স্বস্তিবোধ কবছেন বোধহয়। বাসব ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাডি ফিরে এল। বিশেষ এক চিন্তা ওকে এখন উতলা করে রেখেছে।

পাইপ ধরিয়ে সবে সোফায় বসেছে, বাহাদুর এক কাপ কফি নিয়ে এসে উপস্থিত হল। ওর বিবেচনাবোধ সব সময় প্রশংসাযোগ্য। কফির কাপ সেন্টার টপের উপর রেখে জানাল, লালবাজার থেকে কিছুক্ষণ আগে সামন্তসাহেব ফোন করেছিলেন।

কয়েক চুমুকে বাসব পেয়ালা শেষ করে ফোন স্ট্যান্ডের কাছে গেল। কয়েকবার

চেষ্টা করার পর লাইনটা পাওয়া গেল। কলকাতার দূরভাষের যা বৈশিষ্ট্য আর কি! সামন্ত দপ্তরেই ছিলেন।

বাসব ঃ খবর পেলাম, আপনি আমায় খুঁজছিলেন?

সামন্ত ঃ দিন দুয়েক চুপচাপ আছেন, ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। অসীম ঘোষাল আর পুলক সরকারকে কোর্টে চালান করা হয়েছিল। রিমাণ্ড পাওয়া গেছে। জেরা চলছে।

বাসব ঃ নতুন কোন তথ্য পেলেন?

সামন্ত ঃ ঘোষাল ঘোড়েল লোক। মচকাচ্ছে না।

বাসব ঃ পুলক সরকার—

সামন্ত ঃ লোকটা ভয় পেয়ে স্বীকার করেছে, নিমাই দত্ত ওর হাতেই মারা পড়েছে। কিন্তু কেন মেরেছে সে কথা এখনও জানা যায় নি। থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ করার কথা ভাবছি। তখন হয়তো জানা যেতে পারে উদয় চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

বাসব ঃ আমার মনে হয়, উদয় চৌধুরীর মৃত্যুর সঙ্গে এদের জড়ান নিরর্থক। যে অপরাধে ধরা পড়েছে, ওদের শাস্তি পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এখন আমাদের জানতে হবে, নিমাই দত্ত কার হয়ে ভায়া অসীম বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহ করতে গিয়েছিল।

সামন্ত ঃ আপনি বলতে চাইছেন, অসীম ঘোষাল বা পুলক সরকার জানে না সেই লোকটা কে?

বাসব ঃ আমার তো তাই মনে হয়। তবে এই সমস্যার সমাধান বোধ হয় হয়ে যাবে। আমার মনের মধ্যে হত্যাকারী ক্রমেই আকার নিতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য এখনও আমি নিশ্চিত নই। পরিস্থিতিকে আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।

সামন্ত ঃ অর্থাৎ এখনই আপনি খুলে কিছু বলবেন না। ঠিক আছে। আমিও ধৈর্য ধরে থাকতে পারি।

আরো দুচার কথার পর দুজনের টেলিফোন বার্তা শেষ হল। বাসব আবার সোফায় এসে বসল। ঘোরাল চিন্তা ওকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। অবশ্য উর্মিলা বাগচীর সঙ্গে কথা বলে একটা সূত্র পেয়েছে। তবে সেই সূত্রের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় কিনা সেটা হল এখন বড় প্রশ্ন।

ঘণ্টাখানেক চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দেবার পর বাসব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সমাধানের কূলে অবশ্য পৌঁছাতে পারেনি। তবে একটা বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হয়েছে—নিতাই দত্তকে আরেক বার নেড়ে চেড়ে দেখা দরকার।

এই সময় তাকে কার্যক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। তার হাবভাব আর কথাবার্তা শুনে এইটুকু বুঝতে পারা গেছে, হৈ হৈ করে এধার ওধার আড্ডা মেরে বেড়াবার লোক সে নয়। সুতরাং এখন তাকে মেস বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

শৈবাল এসে পড়লে ভাল হত। দুজনে একসঙ্গে রওয়ানা দেওয়া যেত। কিন্তু

এখন ও যখন এসে পড়েনি তখন কোন কাজে আজ আটকে পড়ার দরুণ আর আসবে না। বাসব গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করল।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে আধঘণ্টার বেশি সময় লাগল না। মেস বাড়িটাকে ভারি নিঝুম দেখাচ্ছে। ভেতরে প্রবেশ করার পর বাসব অফিস ঘরের দরজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। মালিক কাম ম্যানেজার একাগ্রচিত্তে লেখালিখির কাজ করছিলেন

জুতোর শব্দে মুখ তুলে চাইলেন। ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। বাসব যে আবার এখানে আসবে ভাবতেই পারেন নি। আবার কি ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় কে জানে। কোনরকমে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বাসব ঘরে প্রবেশ করে বলল, আবার আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম। খবর সব ভাল তো?

হতাশ ভঙ্গীতে ম্যানেজার বললেন, ভাল খবর কিছু নেই। আমার মেস বাড়ির বেশ বদনাম হয়ে গেছে। দুজন বোর্ডার তো পড়ি কি মরি করে পালাচ্ছেন

—এসব সাময়িক সমস্যা। কিছুদিন যাক, দেখবেন আবার সব ঠিক হয়ে গেছে ভাল কথা, নিতাইবাবু আছেন নাকি?

—ঘণ্টা দুয়েক হল ফিরেছেন। ডেকে পাঠাবো?

—দরকার নেই। আমি যাচ্ছি ওঁর কাছে।

বাসব কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ঘর তো চেনাই ছিল। সিঁড়ি পেরিয়ে করাঘাত করল দরজায়। মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজা খুলে গেল দেখা পাওয়া গেল লুঙ্গি গেঞ্জি পরা শীর্ণকায় নিতাই দত্তর। লোকটা স্বাভাবিক কারণে এখানে বাসবকে কখনই আশা করেনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে ম্লান গলায় বলল, আপনি আসবেন স্যার ভাবতেই পারিনি। আসুন—ভেতরে আসুন।

বাসব ঘরের একমাত্র চেয়ারে গিয়ে বসল।

বাসব স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি কাজের জায়গায় থাকলে এখানে আসতাম না। কয়েকটা কথা ছিল। আমি জানি আপনার মনের অবস্থা এখন ভাল নয় তবে—

—আপনি কি বলতে চাইছেন আমি জানি না। তবু বলুন স্যার। মনের দিক থেকে আমি ঠিক আছি। নিমাই যে এইভাবে মারা পড়বে আগেই আঁচ করেছিলাম

—কি ভাবে?

কয়েক বছর ধরে ও খুব খারাপ রাস্তা ধরেছিল। অথচ আগে কি ভালই না ছিল।

—ওকে আপনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভাল রাস্তায় আনবার চেষ্টা করেন নি কেন?

নিতাই দত্তর মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল।

—অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। একদিন তো আমাকে চড় মেরে বসল। তারপর—

—তারপর কি হল?

—এই ঘরেই আমরা দুজন থাকতাম। চড় মারার ঘটনার পব আলাদা ঘর নিয়ে থাকতে লাগল। এমন কি আমার সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ কবে দিল।

—নিমাই দত্তর রুম মেট পুলক সরকারকে চিনতেন?

—না। ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে শুধু লোকটার নাম জানতে পেরেছিলাম।

—অসীম ঘোষালকে চেনেন?

—না স্যাব। ঐ নামের কাউকে চিনি না। আগেও বলেছি।

—আপনার ভাই তো প্রপার্টি ডিলার ছিলেন শুনেছি। তার আগে কি করতেন?

নিতাই দত্ত বিছানার উপর বসে পড়ে বলল, আমি দেশ থেকে আগেই চলে এসেছিলাম স্যার। ও এল বছর দুয়েক পরে। কাছেই থাকতো আমার।

—এই ঘবে?

—হ্যাঁ। নিজেদের কম্পানিতে ওকে ঢোকাবাব চেষ্টা কবলাম। কিন্তু বাবুরা বাজী হলেন না। বললেন, চেহারা একই রকম। কাজে অসুবিধা হবে।

চাকরি না দেবার হাস্যকর অজুহাতেব কথা শুনে বাসব অবাক হয়ে গেল। মানতেই হবে, কত বিচিত্র ধরনের লোক ছড়িয়ে আছে চারিধাবে।

—তারপর কি হল?

—তারপর স্যার ও নিজের চেষ্টাতেই এক কনট্রাক্টরের ওখানে কাজ জোগাড় করে ফেলল। বছব দুয়েক কাজ কবেছিল। তাবপব শুনলাম প্রপার্টি ডিলাব হয়ে গেছে। ইদানিং বেশ মোটা রোজগাব করতো।

বাসব এবাব প্রসঙ্গ পরিবর্তন কবল।

—আপনি বোধহয় শুনেছেন, নিমাই-এর হত্যাকাবী ধরা পড়েছে। আরো একটা লোক সঙ্গে আছে। দুজনেরই শাস্তি হবে। এবাব যা জানতে চাইবো ভেবে চিন্তে উত্তর দেবেন।

—বলুন?

—আপনার ভাইয়ের চৌধুরীদের বাড়িতে বা গুদামে যাতাযাত ছিল?

—চাকরির ব্যাপারে বেশ কয়েকবাব গিয়েছিল।

—ইদানিং—

—এদিকের ব্যাপার আমি বলতে পারবো না স্যাব। তবে এধাবেও নাকি একদিন গিয়েছিল।

—কবে?

নিতাই মনে মনে হিসাব করে বলল, আমাব যতদূর মনে পড়ছে ডিসেম্বর মাসে।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল?

—না স্যার। আমি তো গুদামে কাজ কবি। উদিতবাবু কি কাজে গুদামে এসেছিলেন। বললেন, তোমাব ভাইকে দেখলাম বাড়িতে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি।

—হুঁ।

—নিমাই কার কাছে যাতায়াত করতো ও বাড়িতে?

—বড়বাবু আর ছোটবাবুর কাছে। চাকরী দেবার মালিক তো স্যার ওঁরাই।

—সেদিন—মানে ডিসেম্বর মাসে নিমাই কেন ওবাড়িতে গিয়েছিল বলতে পারেন?

—জানি না স্যার। আপনাকে তো আগেই বললাম, নিমাইয়ের সঙ্গে এধারে আমার সম্পর্ক ভাল ছিল না।

—হুঁ। পুলিশ এসেছিল আপনার কাছে?

—এসেছিল। অনেক জেরা টেরা করলো। তারপর নিমাইয়ের জিনিযপত্রগুলো আমায় দিয়ে গেল।

—সেগুলো কি?

—আধ ময়লা কিছু জামাকাপড়, বিছানা আর বড় সাইজের একটা ট্রাঙ্ক।

—ট্রাঙ্কের মধ্যে কি ছিল?

—কিছু ধোয়া জামা কাপড়। দুটো অশ্লীল ছবিওয়ালা বই। গোটা কতক ডায়েরী। আর—টাকা ছিল।

—কত টাকা?

—মিথ্যে কথা বলবো না স্যার। পাঁচ হাজার আটশো টাকা ছিল। টাকাটা আমাব অনেক কাজে আসবে।

—নিমাই মবে গিয়ে আপনার উপকার করে গেছে বলুন। আমি ট্রাঙ্কটা একবাব দেখতে পারি?

—দেখুন না। আমি বার করে দিচ্ছি।

—নিতাই খাটের তলা থেকে ট্রাঙ্কটা টেনে বার করল। বেশ বড় সাইজের। কালো রং কবা। এখন তালা লাগানো নেই। বাসব ডালা তুলে ভেতরটা দেখতে লাগলো। টাকাটা অবশ্য এখন এর মধ্যে নেই। বাসব জামা কাপড় অশ্লীল বই দুটো নাড়াচাড়া না করে দুটো ডায়েরী আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক তুলে নিল।

এই সময় তাব চোখ পড়ল লাল রং-এর রেক্সিনে মোড়া একটা ব্যাঙ্ক বুকের উপর। বাসব তুলে নিল। পাতা উল্টে বুঝতে পারা গেল, উত্তর কলকাতার স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় নিমাই দত্তর নামে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা জমা রয়েছে। পাস্ বইটা নিতাইকে দিল বাসব।

—এটা যত্ন করে রেখে দিন। অনেক টাকা জমা রয়েছে। ব্যাঙ্কে ভালভাবে তদ্বির করতে পারলে টাকাটা পেয়ে যাবেন।

নিতাই দত্তর মুখে আলো ঝলসে উঠল।

আমি তো স্যার খেয়ালই করিনি। টাকাটা পেয়ে গেলে কি উপকার যে হবে বলার নয়।

—আমি এবার যাব। ডায়েরীগুলো নিয়ে যাচ্ছি। কোন অসুবিধা হবেন নাতো?

—কি যে বলেন স্যার। আমার কোন্ কাজে আসবে? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে

যান। একটু বসুন স্যার। চা আনাই।

—অনর্থক ব্যস্ত হবেন না। আমি চলি।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাসব নিমাই দত্তর ডায়েরী আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক নিয়ে বসল। দুবছরের দুটো ডায়েরী। ধারাবাহিকতা নেই। খাপছাড়া ভাবে লেখা, বেশির ভাগই টাকা পয়সার হিসাব। এমন একটা লাইনও পাওয়া গেল না যাতে তদন্ত কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।

ডায়েরী দুটো রেখে বাসব এবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা তুলে নিল। কয়েক পাতা ওল্টাতেই বোঝা গেল, কার সঙ্গে দেখা করতে হবে তারই উল্লেখ রয়েছে। তবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। অর্থাৎ অমুক তারিখে কার সঙ্গে নিমাই দত্ত দেখা করবে তার নাম উল্লেখ নেই। শুধু একটা ইংরাজী অক্ষর বসানো। যেমন—১৬ই মার্চ সকাল সাড়ে আটটা—'আর' বা 'এন'।

বাসবের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

এ এক ধরনের সতর্কতা। নিমাই দত্ত এমন কিছু কাজ নিশ্চয় করতো যাতে সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অক্ষরগুলো কোন লোকের নামের প্রথম অক্ষর হতে পারে, আবার উপাধির প্রথম অক্ষর হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে নামের প্রথম অক্ষর হওয়াটাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত।

বাসব পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এমন এক জায়গায় এসে থামল, যেখানে ডিসেম্বর মাসের সাক্ষাৎকারের উল্লেখ রয়েছে। খুব বেশি নয় .তিনজনের সঙ্গে নিমাই দত্ত নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে দেখা করেছিল। সাক্ষাৎকারের লিস্ট নিম্নরূপ—

১। ২৪শে ডিসেম্বর বেলা দুটো—"সিবি"।

২। ২৭শে ডিসেম্বর বেলা দশটা—"এ"।

৩। ৩০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটা—"বি"।

বাসবের কপালে রেখা পড়ল। চিন্তার অতলে তলিয়ে রইল কিছুক্ষণ। "সিবি" লোকটা কে হতে পারে? চৌধুরী বাড়িরই কেউ। কারণ ডিসেম্বর মাসেই উদিত নিমাই দত্তকে তাদের বাড়িতে দেখেছিল। "সি" নিশ্চয় "চৌধুরী। কিন্তু "বি"? ঐ বাড়িতে "বি" অক্ষর দিয়ে তো কারুর নাম আরম্ভ হয়নি। তাছাড়া দুটো অক্ষর কেন?

যদি সরলভাবে ব্যাপারটাকে নেওয়া যায় তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে চৌধুরী বাড়ির "সিবি" নামে একজন নিমাই দত্তকে ২৪শে ডিসেম্বর ডেকে পাঠায়। এবং মোটা টাকার বিনিময়ে পটাসিয়াম অ্যাকোডাইড এনে দেবার প্রস্তাব রাখে। দত্ত রাজী হয়ে যায়। কারণ তার ঘাঁতঘোঁত জানা ছিল। এর পর সে "এ" অর্থাৎ অসীম ঘোষালের কাছে গিয়ে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করে। এবং "বি" অর্থাৎ বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে মালটা সংগ্রহ করে আনে।

বাসব আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করল। ৩১শে ডিসেম্বরের পাতার পর কয়েক পাতা রয়েছে ঠিকানা লেখার জন্য। ঐ পাতাগুলিতে

কয়েক মাসের সাক্ষাৎকারের বিবরণ রয়েছে। জানুয়ারি মাসে নিমাই দত্ত সাতজনের সঙ্গে দেখা করেছে তার মধ্যে একজন "সিবি"।

উল্লেখ এই ভাবে রয়েছে—২রা জানুযারি বেলা তিনটে, প্যাগোডার পূর্বদিকে—"সিবি"।

প্যাগোডা! কলকাতায় প্যাগোডা আছে একটাই। তার অবস্থান ইডেন গার্ডেনে। পরবর্তী চিত্রটা বাসব চিন্তার সাহায্যে মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলল। নিমাই দত্ত আর বোধহয় চৌধুরী বাড়িতে যায়নি। গেলে কেউ না কেউ দেখতে পেতো। "সিবি" তাকে হয়তো বলেছিল, এখানে আসবে না। মাল সংগ্রহ হয়ে গেলে ফোনে জানাবে।

৩০শে ডিসেম্বর বিষ্ণু বর্ধনের কাছ থেকে মাল সংগ্রহ করতে কোন অসুবিধা হয়নি নিমাই দত্তর। তারপর যে "সিবি" কে ফোন করে। "সিবি" তাকে জানায় ২রা জানুযারী বেলা তিনটের সময় ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার সামনে উপস্থিত হতে। বলা বাহুল্য পটাসিয়াম অ্যাকোডাইড ঐ সময়ই হস্তান্তরিত হয়।

তবু বড় ধরনের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিষ্ণু বর্ধন তবে কেন বলেছিল, নিমাই দত্তর সঙ্গে একজন লোক ছিল। এবং চকলেট রং-এর প্রিমিযারে চড়ে এসেছিল?

"সিবি" লোকটা কে? এ প্রশ্নটা আরো বড় ধরনের।

চিন্তা ভাবনায় বাসরের মন গরম হয়ে উঠল। সমস্ত শরীর ঘামে জবজবে হয়ে উঠেছে। এগিয়ে গিয়ে এয়ারকুলারের নব ঘোরাল। ঠাণ্ডা আমেজে ভরে উঠল ঘর। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাল। ক্রমে পাঁশুটে রং-এর ধোঁয়ার সঙ্গে চিন্তা একাকার হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো গেল না।

গুদামের অফিস ঘরে সোমনাথ চৌধুরী কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে। বাসব আচমকা তাঁর গুপ্তজীবন ছত্রখান করে দেওয়ায় মনের দিক থেকে একেবারেই ভাল নেই। বরং কিছুটা শঙ্কিত হয়ে রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটাই হল আশঙ্কার কারণ।

নিতাই দত্ত ঘরে প্রবেশ করল।

সোমনাথ মুখ তুলে বললেন, আজ তোমার আসতে এত দেরি হল? তোমার মন-মেজাজ ভাল নেই জানি। তবু ডিউটিটা সময় মত করো। ট্রাক দুটো এখনও অনলোড হয়নি।

কিন্তু ভঙ্গীতে নিতাই দত্ত বলল, শরীর ভাল ছিল না ছোটবাবু। আসতে তাই দেরি হয়ে গেল। মাল নামানো হচ্ছে। এদিকে—

—কি হয়েছে?

—কাল গোয়েন্দাবাবু আমার কাছে গিয়েছিলেন।

সোমনাথ সোজা হয়ে বসলেন।

ভারি গলায় বললেন, লোকটা তো জ্বালিয়ে খাচ্ছে। আমার সম্পর্কে কিছু

জিজ্ঞেসবাদ করছিল নাকি?

—আপনার সম্পর্কে কোন কথা হয়নি।

—চেপে যাবে না, ঠিক করে বলো?

—বিশ্বাস করুন ছোটবাবু। কোন কথা হয়নি। উনি—

এরপর নিতাই দত্ত বাসবের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল সমস্ত খুঁটিয়ে বলল। ওর যে একটা ভয়, ভয় ভাব রয়েছে একথাও জানাল।

মিনিট খানেক গুম হয়ে রইলেন সোমনাথ।

তারপর—

—দত্ত—

—আজ্ঞে—।

—তুমি আমার কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছো।

—আজ্ঞে, তা পেয়েছি।

—তুমি আমাকে সাহায্য করেছো বলে যে টাকাটা দিয়েছি তা নয়, তুমি মুখ বন্ধ করে থাকবে এটাই আসল কথা।

—আমি কাউকে কিছু বলিনি ছোটবাবু।

—পুলিশের ভয় দেখালেও এ সম্পর্কে তুমি মুখ খুলবে না। তোমার ভাইকে কে মেরেছে আমি জানি না। তবে আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো।

কাঁপা গলায় নিতাই দত্ত বলল, প্রাণ থাকতে আমি কাউকে কিছু বলবো না। তবে ছোটবাবু, আমি জানতে পেরেছি আমার ভাইকে কে মেরেছে।

—লোকটা কে?

—ওর রুমমেট ছিল— পুলক সরকার।

ওদিকে—

গুদাম কম্পাউন্ডের গেটের সামনে উমানাথ গাড়ি থেকে নামলেন। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। এই কদিনেই বয়সের ভার আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। ছেলে যত খারাপই হোক, তার এই ভাবে মৃত্যু বোধ হয় কোন বাপেরই কাম্য হওয়া উচিত নয়।

ওকে দেখেই চতুর্দিকে ত্রস্ত ভাব এল। সকলে যে যার কাজে আরো মনযোগী হবার ভান করতে লাগল। উমানাথ কয়েক পা এগিয়ে এসে থামলেন। অনেকদিন পরে এখানে এসেছেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এগুলেন আবার। থামলেন অফিস ঘরের দরজার সামনে।

ঘরে তখন সোমনাথ আর নিতাই দত্তর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। ওঁকে দেখেই দুজনের চমকাবার পালা। সোমনাথ তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে পড়ে এগিয়ে এলেন। নিতাই দত্ত নার্ভাস ভঙ্গীতে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমনাথ বললেন, তুমি যে আসবে সকালে তো কিছু বলনি।

উমানাথ এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিয়ে বললেন, সকালে কোন প্ল্যান ছিল না। কিছুক্ষণ আগে স্থির করলাম এখানে আসা দরকার। ব্যবসাটা তো বিশৃঙ্খলার

বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে।

—তেমন তো কিছু নয়। সমস্ত ঠিকঠাকই চলছে।

—তাই তুমি মনে করো? ভাল কথা, দত্ত এখানে কি করছে?

—কাজের ব্যাপারে এখানে ডেকেছিলাম। দত্ত, তুমি এখন যাও। পরে ঐ কনসাইনমেন্ট সম্পর্কে কথা হবে।

নিতাই দত্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ওর গমন পথের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে উমানাথ বললেন, তুমি বলছো সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে?

—আমি নিশ্চিত হয়েই তোমাকে বলছি।

—আড়াই লাখ টাকার কাঠ চুরিটাকেও তুমি ঠিকঠাকের মধ্যেই ধরছো বোধহয়? প্রথমে আমি ব্যাপারটাকে উদয়ের অপকর্ম বলে বিশ্বাস করে ছিলাম। পরে চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম ব্যাপারটা তা নয়।

—তা কি করে সম্ভব। আমি তো—

—শোন সোমনাথ, এতবড় ঘটনা উদয়ের পক্ষে তখনই সামাল দেওয়া সম্ভব, যখন গুদামের কয়েকজনের সহযোগিতা সে না পেয়েছে। তাছাড়া সে গুদামের চাবি পেল কোথা থেকে?

—তুমি কি বলতে চাইছো দাদা?

—আজ আমি কিছু স্পষ্ট কথাই বলতে চাইছি। উদয় মারা যাবার আগে ঘটনাটা ঘটেছে। তখন আমায় জানাওনি কেন? আমি রেগে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব বলে? তুমি তাহলে জানতে উদয় মারা যাচ্ছে, তারপর সমস্ত কিছু আমায় বললেই চলবে! কি বলো?

মহা বিচলিত সোমনাথ বললেন, এ সমস্ত কি বলছো? উদয় খুন হবে আমি কিভাবে জানবো?

—তবে আগে বলনি কেন? আড়াই লক্ষ টাকা ছেলেখেলা নয়। এখন আমি বিশ্বাস করি কাঠ পাচারের কাজ উদয় করেনি। ছেলেটা চরিত্রহীন ছিল, মদ খেতো — কিন্তু ওর মধ্যে ক্ষুদ্রতা ছিল না।

—তুমি কি বলতে চাইছো—

—হ্যাঁ। কাজটা তোমার।

—শেষটা আমায় চোর বললে—

—বলতে বাধ্য হলাম। নিতাই দত্তর মতই এখানকার কয়েকজন তোমায় সহযোগিতা করেছে আমি বুঝতে পেরেছি। আরো কত গোলমাল বাধিয়ে বসে আছো, তার খোঁজ-খবরও আমি নেবো।

সোমনাথ নিজেকে কোনরকমে সামলালেন।

বললেন দ্রুত গলায়, তুমি অনুমানের উপর নির্ভর করে আমায় চোর বলতে পার না। কোন প্রমাণ নেই তোমার হাতে।

উমানাথ হাসলেন।

চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, এ সমস্ত কথা তোমাকে বলতে আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু বাস্তবকে কতদিন চোখঠারা যায়? কি বলছিলে, আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই?

উনি থামলেন।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ঘন্টা আড়াই আগে বসন্ত সমাদ্দার আমার কাছে এসেছিল।

সোমনাথ চমকালেন।

—লোকটার সঙ্গে বহু আগে আমাদের কারবার ছিল তাই না? ওর ভাইপো নবীনকে তুমি মালটা বেচেছো। খুড়ো ভাইপোর মধ্যেকার সম্পর্ক এখন ভাল নয়। বসন্ত তাই খবরটা আমায় দিয়ে গেল।

সোমনাথ ঘামতে লাগলেন।

—চুপ করে থেকো না। কিছু বলো!

—আমি—আমি—আমাকে ক্ষমা করো দাদা—

সোমনাথের কথা আটকে যেতে লাগলো।

উমানাথ বললেন, জোচ্চোর, বেইমানকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। তোমার কোন অভাব আমি রাখিনি, তারপরও—! এখন আমার ধারণা হচ্ছে উদয় নয় হ্যান্ডনোটগুলো তুমি চুরি করেছো। লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি তুমি করেছো। আর নয়—

—দাদা, আমি বলছিলাম—

—অনুরোধ করার অধিকার তুমি হারিয়েছো। আমি জানতে চাই, এই ব্যবসাটা কার?

—তোমার—

—বসতবাড়ি?

—তোমার—

—ব্যবসা বা বাড়ির সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক রইলো না। বিকেলের মধ্যেই নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।

সোমনাথ ভেঙ্গে পড়লেন।

এ তুমি কি বলছো? আমি কোথায় যাবো? তোমার সহযোগিতা না পেলে আমার চলবে কিভাবে?

—জাহান্নামে যাও। আমার সহযোগিতার দরকারটা কি? কয়েক লক্ষ টাকা তো হাতিয়ে বসে আছো। আর কোন কথা নয়। তুমি যেতে পারো। আই সে গেট আউট—

সোমনাথ কিছু বলতে গিয়েও থামলেন, তারপর ঘাড় হেঁট করে মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উমানাথ বিমর্ষ ভঙ্গীতে এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে। ভাই হলেও সোমনাথকে উনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। অপর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। স্বচ্ছন্দে রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু লোভ

আর স্বার্থপরতা ওকে অমানুষ করে তুলেছে। কাজেই ওঁকে অনিচ্ছার সঙ্গেই এই নির্মম নির্ণয় নিতে হল।

উমানাথ বাড়ি ফিরলেন বিকেল পাঁচটার কিছু পরে।

উদিত আর উজ্জ্বল ফিরেছিল কিছুক্ষণ আগেই। উর্মিলার সাপ্তাহিক বাপের বাড়ি ভিজিটের আজ আবার দিন। সোমনাথ বহুক্ষণ আগে এসে, লরি বোঝাই করে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন।

চাকরদের মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনেছে তিন ভাইবোন। ভারি রহস্যজনক ঘটনা। তিনজনের মধ্যে ঐ নিয়েই গবেষণা চলেছে। চাকরদের অনেক জেরা করেও নতুন কিছু জানতে পারেনি। এই সময় উমানাথকে ফিরে আসতে দেখা গেল। বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাঁকে।

বারান্দায় তিন ছেলেমেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থামলেন। নিজের অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে ডান হাতের আঙ্গুল চালিয়ে বিলি কাটলেন। তারপর মন্থর পায়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে। তিনজনে মুখ চাওযা চাওযি করলে। বিশেষ কিছু নিশ্চয় ঘটেছে।

উর্মিলা আগুয়ান হল। দুই ভাই অনুসরণ করল দিদিকে। উমানাথ তখন ডিভানের উপর গা এলিয়ে দিয়েছেন। চান্সেলারের প্যাকেট আর দেশলাই ওঁর হাতে। নিয়মিত সিগারেট খান না। মাঝে মাধ্যে এক আধটা ধরান। উর্মিলা ডিভানের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

প্রশ্ন করলেন, তোমার কি হয়েছে বাবা?

উমানাথ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, কিছু হয়নি তো।

—চেহারা দেখেতো খুব ভাল ঠেকছে না। শরীর খারাপ—

—শরীর ভালই আছে। মনেব দিক থেকে একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি। বাধ্য হয়েই আজ একটা অপ্রিয় কাজ আমায় করতে হয়েছে।

উদিত বলল, এদিকে শুনলাম কাকা নিজেব মালপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে গেছেন।

—চলে গেছে তাহলে! ভাল।

—মনে হচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। তুমি কি কিছু—

—হ্যাঁ—ভারি নিশ্বাস ফেলে উমানাথ বললেন, আমিই তাকে বাড়ি থেকে যেতে বলেছি। শুধু তাই নয়, এ জীবনে তাব সঙ্গে আমাব আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

তিন ভাইবোন দারুণ ভাবে সচকিত।

কোনরকমে উদিত বলল, ব্যাপারটা কি? তুমি হঠাৎ—

—আমার বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি। আমি প্রমাণ পেয়েছি, গুদাম থেকে কাঠ সোমনাথই চুরি করেছে। এছাড়া আমার বিশ্বাস হ্যান্ডনোটগুলো ও হাতিয়েছে। ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে এখন আমার ভাল লাগছে না।

উজ্জ্বল—

—বাবা —

—শ্রীনাথকে বলো আমাদের সকলের জন্য এইখানে চা দিয়ে যাবে।

উজ্জ্বল ঘব থেকে বেরিয়ে গেল।

ঊর্মিলা বুঝলেন ঐ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উমানাথ মনের দিক থেকে এখন ভারি চাপেব মধ্যে রয়েছেন। প্রসঙ্গান্তবে যাওয়াই ভাল। উদিতও পরিস্থিতি বুঝে ঐ প্রসঙ্গের কোন কথা তুলল না।

ঊর্মিলা বললেন, গোয়েন্দা ভদ্রলোক আমার কাছে গিয়েছিলেন। আমাকে অতিষ্ঠ কবে তুলেছিলেন নানা ধরনের প্রশ্ন করে। তোমার জামাইকেও অফিসে গিয়ে ধরেছিলেন। এই ভাবে চলতে পারে না।

উমানাথ বললেন, এত অল্পে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠো তোমবা! উনি তদন্তেব ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। সকলকেই বাজিয়ে দেখবেন। পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জেরা করতো, তার চেয়ে তো ভাল।

বাপের কথায় ঊর্মিলার উৎসাহ নিভে গেল।

—তা ঠিক। তবে—

চা এসে পড়ল।

বত্না ট্রে নিয়ে এসেছিল। পরিবেশ কবল সকলকে।

উদিত পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল, তোমার কাছ থেকে কি জানতে চাইছিলেন?

ঊর্মিলা বললেন, ওর মূল আগ্রহ ছিল আমার গাড়িটাকে নিয়ে। উদয় মারা যাবার দুপুরে আমি এখানে এসেছিলাম। এখানে আসবার পর গাড়িটা আমি কাউকে দিয়েছিলাম কিনা—এটাই উনি নানা ভাবে আমার কাছ থেকে জানতে চাইছিলেন।

উজ্জ্বল ফিরে এসেছিল। বলে উঠল, মেজদার মৃত্যুব সঙ্গে তোমাব গাড়ির কি সম্পর্ক?

—আমি জানি না। যত বলছি, সেদিন আমার কাছ থেকে কেউ গাড়ি চায়নি, উনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না।

—আজব ব্যাপার।

—মোটেই তা নয়—উমানাথ বললেন, তোমাদের স্বীকার করতেই হয ভদ্রলোক প্রতিভাবান। নিজের লাইনে একজন অথরিটি বিশেষ। অকাবণে প্রশ্ন করেননি। নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। থাক, এ সমস্ত কথা। এবাব কিন্তু কাজের বিষয বলি।

সকলে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

—উদিত—

—বাবা—

—কাল থেকে গুদামের সমস্ত দায়িত্ব তোমার। নিয়মিত বেলা সাড়ে দশটাব সময ওখানে পৌঁছে গিয়ে কাজ আরম্ভ করবে।

—কাকা কি ওখানেও যাবেন না?

—বললাম তো এ জীবনে ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। যা গুছিয়েছে তা পুরণ হতে কত সময় লাগবে ঈশ্বর জানেন। ভাল কথা, নিতাইকে বরখাস্ত করেছি। একটা করিতকর্মা লোক পাওয়া যায় কিনা দেখো।

উজ্জ্বল অবাক হয়ে বলল, নিতাইবাবু কি করলেন?

—তোমার কাকার দোসর। তুমি যদি অন্যত্র চাকরি না করতে ভালই হত। দুই ভাই মিলে ব্যবসাটা আরো জমিয়ে তুলতে পারতে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার উপর তোমাদের আর নির্ভর করা উচিত নয়।

—তুমি বললে কালই আমি চাকরি ছেড়ে দিতে পারি।

—তোমার চাকবির কত দিন হল?

—আর দ্'মাস পরে পাঁচ বছর হয়ে যাবে।

কয়েক চুমুক উমানাথ পেয়ালা শেষ কবে বললেন, দেখি ভেবে। তোমাকে কয়েক দিনের মধ্যেই বলবো।

এই সময ভৃত্য এসে বাসবের আগমন সংবাদ জানালো। ঘরে উপস্থিত কেউই এই সময় ওকে এখানে প্রত্যাশা করেনি। উমানাথ ওকে এখানেই নিয়ে আসবাব কথা বললেন। বাসব আর শৈবাল তখন ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিল। উজ্জ্বল ওদের সঙ্গে করে নিয়ে এল।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বাসব বলল, সকলেই উপস্থিত রয়েছেন দেখছি। বিশেষ কোন আলোচনা হচ্ছিল বোধহয়। এই সময় আমাদের এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।

উমানাথ বললে, তেমন কিছু নয। বসুন।

রত্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বসে পড়ার পব বাসব বলল, সোমনাথবাবুকে দেখছি না? উনি এখনও ফিরে আসেননি বোধহয়?

ঘরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে এল।

শেষে উমানাথ গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, এবাড়িতে ও আর কখনও আসবে না। কাঠ চুবিব ব্যাপারে জড়িত। আমি ওব সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেছি।

বাসব চমৎকৃত হল। উনি তাহলে প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছেন। শুধু আঁচ করেছেন না, কোন প্রমাণ পেয়েছেন? অবশ্য ও প্রসঙ্গের জের বর্তমানে আর না টানাই বাঞ্ছনীয মনে করলেন।

বাসব প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

—নিমাই দত্তর হত্যাকারী ধরা পড়েছে।

উদিত বলল, কই, নিতাইবাবু তো আমাদের কিছু বলেন নি। লোকটা কে?

—কলকাঠি নেড়েছে অসীম ঘোষাল বলে একটা লোক। হাতে কলমে কাজ সেরেছে নিমাই দত্তর রুমমেট পুলক সরকার। দুজনকেই পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। অসীম ঘোষালকে আপনারা চেনেন নাকি?

জানা গেল কেউ চেনেন না।

রত্না দু-কাপ চা করে আনলো।

বাসব কাপ তুলে নিযে বলল, এবার বলতে হচ্ছে এই অসময়ে আমি এখানে কেন এলাম। মিঃ চৌধুরী, আপনি বোধহয় এখনও হারিয়ে যাওয়া দলিল আর হ্যান্ডনোটগুলোর কোন সন্ধান পাননি?

উমানাথ বললেন, না। তবে এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই ব্যাপারেও সোমনাথের কোন কারসাজি আছে।

—সন্দেহের কারণ?

—আলমারির চাবিটা আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিযেছিল। আসলে হারায়নি—সোমনাথ সরিয়েছিল। উদয় একাজ করতেই পারে না। কারণ তাব কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। এছাড়া সোমনাথের কাছে ঐ আলমারিব আরেকটা চাবি থাকতো।

উজ্জ্বল বলল, তাহলে তোমার চাবিটা কাকার সবিয়ে লাভ কি? নিজের চাবি দিয়েই তো উনি ওগুলো সরিয়ে ফেলতে পাবতেন?

উমানাথ ধমকে উঠলেন।

—বোকার মত কথা বলো না। আমার চাবিটা না সরালে ওব উপব ডায়রেক্ট সন্দেহ পড়তো। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপানো যেত না। আমি এখন বিশ্বাস করি, কাঠ চুবি আব দলিল দস্তাবেজ চুরি—দুটো ঘটনাই ঘটেছে উদযেব মাবা যাবাব পব।

উদিত বলল, বাবা ঠিকই বলছেন, উদয় তো আব প্রতিবাদ করতে আসবে না। ও মারা যাওযায কাকা সুযোগ দুটো নিয়েছেন।

এবার উর্মিলা বলে উঠলেন, এমন তো হয়নি, কাকা উদযকে সবিয়ে দিয়েছেন? তোমাদের কথা শুনে আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

উমানাথ দ্রুত গলায় বললেন, না। কখনই সম্ভব নয়। সোমনাথেব নার্ভে এত জোর নেই। এ সম্পর্কে আপনার কি মত মিঃ ব্যানার্জি?

বাসব নড়ে চড়ে বসল।

—ও প্রসঙ্গ নিয়ে এখন আলোচনা না বাড়ানোই ভাল। আমি যে জন্য এখানে এলাম, এবার সে কথাই বলতে চাই। দলিল দস্তাবেজ আর হ্যান্ডনোটের কথা।

—বলুন!

—দলি দস্তাবেজের নকল আপনি রেজিস্ট্রী অফিস থেকে পেয়ে যাবেন। ও নিয়ে চিন্তাব কিছু নেই। এগুলো দেখুন তো—

বাসব পকেট থেকে বেশ কয়েকটা জুডিশিযাল স্ট্যাম্প-পেপাব বেব করে এগিয়ে ধরল। উমানাথ ওগুলো নিলেন। তাবপর হতবাক হয়ে গেলেন। এক নজরেই বুঝতে পেরেছিলেন, ওগুলো চুরি যাওয়া হ্যান্ডনোট। আর সকলে ঝুঁকে পড়েছিল ওঁর উপর। সকলেবই অবাক হবার পালা।

—ঠিক আছে তো? ভাল করে দেখে নিন।

উমানাথ অসংলগ্ন গলায় বললেন, আপনি—আপনি তো মিরাক্ল করেছেন মিঃ ব্যানার্জি। আপনি আমার বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিলেন। কিভাবে

কৃতজ্ঞতা জানাবো বুঝতে পারছি না।

—কাজটা আমার ডিউটির মধ্যেই ছিল। কৃতজ্ঞতার কোন প্রশ্ন নেই।

উদিত বলল, বাবা, আমরাও তো এঁকে নিযুক্ত করতে পারি উদয়ের মার্ডার কেস-এ। আমাদেবই তো সবচেয়ে আগে জানা দরকার ওকে কে খুন করেছে?

উনামাথ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। অনেক আগেই এঁর সঙ্গে কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল। মিঃ ব্যানার্জি, আপনি—

—ঠিক আছে। এখন আমরা চলি।

—যাবেন কি? বসুন। কোথা থেকে পেলেন হ্যান্ডনোটগুলো? সোমনাথ কি—

—না, ওঁব কাছ থেকে নয়। তবে এগুলো যে উনি সাপ্লাই করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু আগে অসীম ঘোষালের উল্লেখ করেছিলাম। আমি তার ফ্ল্যাট থেকে ওগুলো পেয়েছি। এনিয়ে আর এগুবেন না। ব্যাপারটা মিটে গেছে ধরে নিতে হবে।

উমানাথ হঠাৎ ডিভানের উপর থেকে উঠে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন।

ঊর্মিলা কিছুটা কিন্তু ভাব নিয়ে বললেন, সেদিন আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। ক্ষমা চাইছি।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, আপনি মিথ্যা সঙ্কোচ করছেন। আমার যা পেশা তাতে নানা ধরনের কথা শুনতে হয়। বিচিত্র সমস্ত ব্যবহারেব মুখোমুখি হতে হয। গা সওয়া হয়ে গেছে।

উজ্জ্বল বলল, কাকা অসীম ঘোষালকে হ্যান্ডনোটগুলো দিতে গেলেন কেন?

—উনি বোধহয় ডায়রেক্ট ঘোষালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নি। নিমাই দত্ত আড়কাঠির কাজ করেছে। বড়রকম আর্থিক স্বার্থ ছিল এতো বুঝতেই পাবা যাচ্ছে।

উদিত বলল, ঘাতকদেব অর্ধেক দামে হ্যান্ডনোটগুলো অসীম ঘোযালেব সহযোগিতায় দিয়ে দেবার পরিকল্পনা কাকা বোধহয় করেছিলেন।

—আসল কথাটা কি জানেন, আপনাদের কাকা নিমাই এবং নিতাই, দুজনকে আলাদা, আলাদা ভাবে খেলিয়েছেন।

উমানাথ ফিরে এলেন। বসলেন নিজের জায়গায়।

একটা চেক এগিয়ে ধরে বললেন, আপনি যখন আমাদের পক্ষ থেকে তদন্ত ভার নিলেন তখন এই আগাম মূল্যটুকু নিতেই হবে।

বাসব বিব্রত ভঙ্গীতে বলল, আমি সান্যালদের হয়ে কাজে নেমেছি। আপনাদেব জন্য বাড়তি খাটুনি তো খাটতে হবে না। আর্থিক দায়িত্বটা ওঁদেরই।

—তা হয় না মিঃ ব্যানার্জি। আমাদের জন্য পরিশ্রম করেন নি কে বলল? বহু লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এ এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত। আপত্তি করবেন না। এ অনুরোধ শুধু আমার একার নয়—বাড়ির সকলের।

—বেশ।

বাসব চেকটা নিল।

উজ্জ্বল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাব আগেই টেলিফোন ঝনঝনিয়ে উঠল। উমানাথ

যে সোফায় বসেছিলেন, তার পাশের একটা নীচু টেবিলের উপর ফোন রাখা ছিল। উদিত একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো—আমি উদিত চৌধুরী—আপনি কাকে চাইছেন—হ্যাঁ—আছেন, দিচ্ছি ওঁকে—

রিসিভার এগিয়ে ধরে উদিত বলল, বাবা, তোমার ফোন—

এবার সকলে এক তরফা কথা শুনে যেতে লাগল।

—হ্যালো—উমানাথ চৌধুরী কথা বলছি—

—এই নামের কাউকে তো আমি চিনি না—আপনি যা বলতে চান তাড়াতাড়ি বলুন—

—

—আচ্ছা—এবার মনে পড়েছে—কি ব্যাপার বলুন তো—

—হুঁ—কথাটা জানাজানি হোক আমি চাই না—কিভাবে সামলানো যায় বলুন শুনি—

—

—ঠিক আছে—ঐ সময় দেখা হবে—

—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বোঝাপড়া হয়ে যাবে—ছাড়ছি

উমানাথ রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, বসন্ত জোয়াদ্দারের ভাইপো ফোন করছিল। বিশ্রী ব্যাপার।

বিস্ময়ের সুরে উদিত প্রশ্ন করল, লোকটা কে?

—বহু আগে বসন্ত আমাদের সঙ্গে কারবার করতো। ওর ভাইপো নবীনকে সোমনাথ চুরি করা কাঠ বিক্রী করেছে। যে কোন কারণেই হোক, নবীন ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। লগগুলো ফিরিয়ে দিতে চায়।

—কিন্তু বাবা, টাকা পেমেন্ট করে মালটা ফেরত নিতে হবে। এর মানে হল, একই লট আমরা দুবার কিনছি। এতো বিশাল ক্ষতি।

—তুমি কি মনে করো এই সামান্য কথাটা আমি বুঝতে পারিনি? কথা বলতে চায়, বলে নেবো। পরে পুলিশী ব্যবস্থা তো আছেই।

বাসব আর শৈবাল এবার বিদায় নিল।

ওল্ডস মোবাইলকে সচল করার পর বাসব বলল, ফাঁকতালে কিছু টাকা পাওয়া গেল।

শৈবাল মুখে হাসি টেনে বলল, এত বড় উপকার তুমি করলে। চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা কিছু আছে। সে যাক, সোমনাথ চৌধুরী বেশ বিপাকে পড়ে গেলেন, কি বলো?

—আরো বিপাকে পড়বেন।

—কি ভাবে?

—উদিত আর উজ্জ্বল ওঁকে ছাড়বে না। যেভাবেই হোক কাঠের দাম ওঁর

কাছ থেকে আদায় করে ছাড়বে।

—কিন্তু ওরা সোমনাথবাবুর ঠিকানাটা জানবে কিভাবে?

—তোমার প্রশ্নটা 'ইয়ে' ধরনের হয়ে গেল না? কেন, ঠিকানাটা আমি বলে দিতে পারি না? ওদের কাছে ব্যাপারটা আরো চমকপ্রদ হয়ে উঠবে। তবে এখনই কিছু বলবো না। ডাক্তার—

—বলো—

—তুমি স্টিয়ারিং সামলাও। অনেকক্ষণ পাইপ ধরাইনি।

কথা শেষ করেই ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বাসব গাড়ি থামাল। জায়গা বদল করে নিল দুজনে। জায়গাটা এলগিন রোডের মোড়। নানা বাহনে ও পদব্রজে অফিস ফেরত মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে। শৈবাল গাড়িতে স্টার্ট নিল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, ডাক্তার, তুমি তো সমস্ত ব্যাপারটা জানো। আন্দাজ করতে পেরেছো, উদয়কে কে খুন করেছে? বলতে চাইছি কোন সম্ভাবনা, কোন আন্দাজের কাছাকাছি এসেছো কিনা?

—এক, এক সময় সোমনাথ চৌধুরীকেই আমার আসল লোক বলে মনে হচ্ছে।

—কেন?

—হ্যান্ডনোটগুলো উনি সরিয়েছেন, কাঠ চুরিটাও ওঁরই কাজ। দুটো ক্ষেত্রেই দোষ চাপিয়েছেন উদয়ের ঘাড়ে। উদয় বেঁচে থাকলে উনি বেশ অসুবিধায় পড়তেন। স্বার্থের জন্য মানুষ সব করতে পারে।

—ঠিক বলেছো। তবে স্বার্থ আরো অনেকের থাকতে পারে।

—তুমি লোকটাকে চিনতে পেরেছো?

—পেরেছি বললে বেশি বলা হবে। একজনকে অ্যালিবাই আর কথার অসঙ্গতি আমাকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। প্রথমে খেয়াল করিনি। সেদিন ঊর্মিলা বাগচীর সঙ্গে কথা বলার পরই খটকা লাগল।

—লোকটা কে?

—জাল ফেলেছি ডাক্তার।

—জাল ফেলেছো?

—হ্যাঁ। আমি নাইনটি পারসেন্ট নিশ্চিত, মাছ উঠবেই। তখন চিনে নিতে তোমার কষ্ট হবে না?

শৈবাল বুঝলো বাসব পরিষ্কার করে কিছু এখন আর বলবে না। এটা ওর পুরনো অভ্যাস। আর কোন প্রশ্ন না করে জটিল পার্ক স্ট্রীটের মোড় অতিক্রম করার জন্য শৈবাল ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরের দিন।

বেলা তখন পাঁচটা।

বাসবের ড্রইংরুমে তখন জমজমাট অবস্থা। রীমা, প্রদোষ আর রজত রয়েছে।

ওরা এসেছে কয়েক মিনিট আগে। শৈবালও আছে। বাসব ঘরে নেই। ও নিজের স্টাডিরুমে গম্ভীর মুদ্রায় বসে আছে। ওর সামনেকার টেবিলের উপর রাখা রয়েছে টেপরেকর্ডার আর একটা ক্যাসেট।

এই ক্যাসেটটা রিপন স্ট্রীটের সেই বার-এর ম্যানেজার সাইমন বিশ্বাস দিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে বাসব কথাবার্তা বলে নিয়েছে। ক্যাসেটটা শুনেছে একবার। এখন আবার রেকর্ডারের মধ্যে ক্যাসেটটা চালান করে দিয়ে রিল ঘুরিয়ে নিল। তারপর ইজেক্টের নব টিপলো।

হাল্কা যান্ত্রিক শব্দ কয়েক সেকেন্ড। তারপর—

উদয়বাবু যে বার-এ নিয়মিত যেতেন, আমি ওখানকার ম্যানেজার। আমার নাম সাইমন বিশ্বাস।

নাম শুনলাম। বলুন কি বলতে চাইছেন?

—১৫ই জানুয়ারি আপনি উদয়বাবুর সঙ্গে আমাদের বার-এ এসেছিলেন। সেদিন রাত্রেই উদয়বাবু খুন হন—

—আমি বার-এ যাইনি।

—গিয়েছিলেন। শুধু আমি নই, বেয়ারাবাও সনাক্ত করবে। যে চড় খেয়েছিল, সে তো আরো ভালভাবে আপনাকে চিনে রেখেছে।

—যদি গিয়েই থাকি তাতে হয়েছেটা কি?

—পুলিশ এখনও জানে না। তবে আপনি আমার চোখে ধরা পড়ে গেছেন।

হেঁয়ালি আমি পছন্দ করি না। যা বলবার পরিষ্কার করে বলুন।

—উদয়বাবু বেসিনে হাত ধুতে গিয়েছিলেন। সে সময় আপনি একটা মোড়ক থেকে কিছু সাদা গুঁড়ো বার করে ওঁর হুইস্কির গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আমি নিশ্চিতভাবে জানি ঐ গুঁড়োগুলোই হল উদয়বাবুর মৃত্যুর কারণ।

—আপনি এতদিন চুপচাপ ছিলেন কেন? পুলিশকে এ কথা বললেই পারতেন?

—আপনি কে আমি জানতাম না। অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করেছি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নিলাম।

—নিশ্চয় আপনার কোন ইন্টারেস্ট আছে? যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন। অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

—আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে গেছেন। আমি আর সময় নষ্ট করবো না। আমি আমার মুখ বন্ধ রাখার মূল্য মাত্র এক লাখ টাকা চাই।

এ তো ব্ল্যাকমেলিং। টাকা পাবার পর আপনি যে মুখ বন্ধ রাখবেন তার প্রমাণ কি?

—কবে টাকাটা চাই।

—আজই।

—এত টাকা আজই দেওয়া সম্ভব নয়। দুদিন সময় চাই।

—পরশুদিন সন্ধ্যার সময় আপনাকে ফোন করবো।

—ফোন করতে হবে না। আমি সন্ধ্যা সাতটাব পর এখানে আসবো।

বাসব নব টিপে রেকর্ডাব বন্ধ করল।

তারপর ক্যাসেটটা বার করে নিয়ে, মন্থর পায়ে ড্রইংরুমের দিকে এগুলো। ওখানে উপস্থিত সকলে কিছুটা অস্থির হচ্ছিল। গৃহকর্তাকে দেখে নড়েচড়ে বসল।

বাসব সোফায় বসতে বসতে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাদের, ক্ষমা চাইছি। মনে হচ্ছে, বিশেষ কিছু বলতে এসেছেন?

রীমা মুখে হাসি টেনে বলল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আমরা কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে চাইছিলাম।

—বাইরে যাবেন! কোথায়?

—দিল্লী।

প্রদোষ বলল, ইলেকট্রনিক্স-এর মালপত্র নিয়ে আমার কারবার জানেন তো? আমাদের অ্যাসোসিয়েশানেব সর্বভারতীয় কনফারেন্স হচ্ছে দিল্লীতে। ভাবছিলাম রীমা আর রজতকেও সঙ্গে নিয়ে যাই।

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বেশতো। যান না।

—পুলিশ কোন ঝামেলা করবে না তো?

—আপনারা বেল-এ রয়েছেন। পুলিশ-এর এখন আব কোন মাথা ব্যথা নেই। ওদের করণীয় কাজ এখন একটাই আছে, আপনাদের বিরুদ্ধে কোর্টে চার্জশিট দাখিল করা। তবে সে সুযোগও তারা পাবে না তদন্তেব অন্তিমলগ্নে আমি পৌঁছে গেছি।

রজত দ্রুত গলায় বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন, উদয়কে কে খুন করেছে, আপনি জেনে গেছেন।

—হ্যাঁ। আমি তাই বলতে চাইছি।

—লোকটা কে মিঃ ব্যানার্জি?

বাসব ক্যাসেটটা উঁচিয়ে ধরে বলল, এটা দেখছেন? এর মধ্যে হত্যাকারীব অজান্তেই এমন কিছু টেপ হয়ে গেছে যা এই মামলার পক্ষে ভারি মহত্বপূর্ণ।

প্রদোষ বলল, তার নামটা জানার জন্য ভারি আগ্রহ বোধ করছি।

—আপনারাই আন্দাজ করুন না, সে কে হতে পারে?

—আর যেই হোক, আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ নয়।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, নিশ্চিত কি ভাবে হওয়া যায়? আপনার কথাই ধরা যাক। এই ব্যাপারে আপনার মোটিভই সব চেয়ে জোরাল।

—আমার?

আঁতকে উঠল প্রদোষ।

—কি বলছেন আপনি? আমি অকারণে উদয়কে খুন করতে যাবো কেন?

—কারণ তো রয়েছেই। ঐ লোকটা আপনাব স্ত্রীকে অসম্ভব বিরক্ত করছিল। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গতেই পারে।

তারপর একটু থেমে বলল, খুব ঘাবড়ে গেলেন নাকি? ও কথা এখন থাক। আগামী কাল যে কোন সময় নেপথ্য-নায়ক পাদপ্রদীপে দেখা দিয়ে সকলকে চমৎকৃত করবে।

কারুব আব কিছু বলার সুযোগ হল না, ঠিক এই সময় অভাবনীয় ভাবে উমানাথ এসে উপস্থিত হলেন। বাসবও কম অবাক হয়নি। আবার কিছু ঘটেছে নাকি? তবে এসে পড়ে ভালই কবেছেন। কাল দেখা করতে হত। কিছুটা পরিশ্রম বেঁচে গেল।

উমানাথ ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনি আমায় ডেকেছিলেন মিঃ ব্যানার্জি?

বিস্মিত গলায় বাসব বলল, নাতো। বসুন—বসুন। কি হয়েছে বলুন তো?

--তেমন কিছুতো হয়নি। কিছুক্ষণ আগে উদিত বলল, আপনি নাকি আমায় ডেকেছেন।

—উদিতবাবু কেন একথা বলেছেন জানি না। তবে এসে পড়ে ভালই কবেছেন। কয়েকটা কথা বলে নেব।

উমানাথের দৃষ্টি এবার বাকী সকলের উপর পড়ল। রীমা আর রজতকে উনি চেনেন। রীমা নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ল। তারপর এগিয়ে এসে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কবল।

ক্লিষ্ট হেসে উমানাথ বললেন, বেঁচে থাকো। যে যাবার সে তো চলে গেল, মাঝ থেকে তোমাদের ঝামেলাব শেষ নেই।

রজত বলল, মিঃ ব্যানার্জি বলছেন হত্যাকারীর সন্ধান উনি পেয়েছেন।

—উনি ঠিকই বলেছেন। ওঁব দক্ষতার উপব আমরা ভবসা করতে পারি।

বাসব বলল, একটা কথা আপনাবা জানেন না। আপনাদের মত মিঃ চৌধুরীও এই তদন্তে আমাকে নিযুক্ত কবছেন। আমার জীবনেব এ এক বিরল অভিজ্ঞতা, দুপক্ষেব হয়েই কাজ করছি। কিন্তু বিচিত্র আমার পেসা। তদন্তের ফলাফলে আমি যে কত পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট করে দিয়েছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। এক এক সময ভাবি খারাপ লাগে। যেমন এখন মনে হচ্ছে এই তদন্তেব ব্যাপাবে না জড়িয়ে পড়লেই ভাল ছিল।

উমানাথ বললেন, আপনি তো সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেন?

— মাঝে মধ্যে বিকারের শিকাব হয়ে পড়ি। এই মামলাটা শেষ করেই ভাবছি কিছুদিন কলকাতাব বাইবে গিয়ে বিশ্রাম নেব।

--আব কদিন সময লাগবে?

—সত্যি কথা বলতে কি আব এক মিনিটও সময লাগার কথা নয। অল্প কিছুক্ষণ আগে এঁদের আমি বলেছিলাম, কাল চেনা যাবে আসল খুনী কে।

—আজ নয কেন?

বাসব কথা বলতে, বলতে পাইপ থেকে পুড়ে যাওয়া মিক্সচাব অ্যাশট্রেতে ফেলছিল। এবাব পাউচ থেকে মিক্সচার বার করে, পাইপে ঠেসে নিয়ে ধরাল। কয়েকবার মৃদু টান দেবাব পর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সবার উপর।

বলল মৃদু গলায়, অবশ্য আজও চিনিয়ে দেওয়া যায়। পুলিশের উপস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটলেই বোধহয় ভাল ছিল। তাই আগামী কালের কথা বলছিলাম।

রজত বলে উঠল, পুলিশকে জানাতে আর কত সময় লাগবে? আপনি এখনই বলুন।

—আপনাদের সকলেরই কি এই মত?

ঘাড় নেড়ে সকলেই সম্মতি জানালেন।

—ঠিক আছে। তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনারা কেউ সাইমন বিশ্বাসকে চেনেন?

একে, একে সকলের কাছ থেকে জানা গেল কারুর সঙ্গেই সাইমন বিশ্বাসের পরিচয় নেই।

বাসব সেন্টার টপের উপর পাইপ নামিয়ে রেখে বলল, আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল, আপনাদের মধ্যে একজন অন্তত লোকটাকে চেনেন। যাহোক, সাইমন একটা বার-এর ম্যানেজার। ঘণ্টা দেড়েক আগে সে আমাকে একটা ক্যাসেট দিয়ে গেছে। এই যে—এ সম্পর্কে তো আপনাদের আগেই বলেছি। হত্যাকারী অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে, সাইমনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। এই জাল আমি ভেবে চিন্তেই ফেলেছিলাম।

কারুর মুখে কথা নেই।

সকলেই বোধহয় আগ্রহের শেষ প্রান্তে।

একটু থেমে বাসব নরম গলায় আবার বলল, মিঃ চৌধুরী—

—বলুন?

—এ কাজটা আপনি কেন করতে গেলেন? উদয়তো আপনার ছেলে—

গরে যেন হিমালয়ের চূড়া ভেঙ্গে পড়ল। ঘটনার পরিণতি যে এমন একজনকে চিহ্নিত করবে কল্পনা করা যায় নি। উমানাথ কিন্তু সচকিত হলেন না। কয়েক সেকেন্ড নির্বিকার মুখে বসে রইলেন। তারপব উঠে দাঁড়ালেন। বিন্দু, বিন্দু ঘামে কপাল ভরে উঠেছে।

বললেন, শান্ত গলায়, আমি জানতাম, আপনি আমাকে চিনে ফেলবেন। তখন আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম। উদিত আমাকে কিছু বলেনি। আমি ইচ্ছে করেই আপনারকাছে এখন এসেছি। আমি দেখতে চাইছিলাম, আপনি আমাকে কি ভাবে চার্জ করেন।

—আমি যে আপনাকে সন্দেহ করছি, আপনি কি ভাবে বুঝেছিলেন?

—ঊর্মিলার মুখে যখন শুনলাম, আপনি ওর গাড়ির সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছেন, রিপন স্ট্রীটের বার-এর কথাও উল্লেখ করেছেন—তখনই আমি মোটামুটি আন্দাজ করেছিলাম।

—তবে সাইমন বিশ্বাসের কাছে গেলেন কেন?

—ভেবেছিলাম, যদি শেষ রক্ষা হয়। আমার বিরুদ্ধে তো সরাসরি কোন প্রমাণ নেই। বিশ্বাসকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবো।

—তখন কি ভাবেই বা বুঝবেন, ওটা আমার ফাঁদ।

উমানাথ পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। নিজের ছেলেকে খুন করেছে এমন একটা লোকের মুখোমুখি হয়েও, কেউ কিন্তু বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারছে না। বরং মনে করুণাই জাগছে।

একই ভঙ্গীতে উমানাথ বললেন, বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার পরই অনুভব করলাম আমি নিজেকে ভারি ছোট করে ফেলেছি। আত্মধিক্কারে নুয়ে পড়লাম। তাইতো আপনার কাছে চলে এসেছি।

—আপনি তো এখনও বললেন না, এই গর্হিত-কাজটা আপনি কেন করলেন? উদয়কে আপনিই দুনিয়ায় এনেছিলেন।

—হ্যাঁ। মিঃ ব্যানার্জি। তবে এটা আমার পূর্বজন্মের পাপ। উদয় আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। তার নক্কারজনক কাজ কারবারের দরুণ আমার কারুর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তারপর পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এনে দিল। বুঝলাম এবার ওকে নির্মমভাবে বাধা না দিলে, আমার যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। মন স্থির করে ফেললাম। যাকে দুনিয়ায় এনেছি তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় আমাকেই দিতে হবে। এবার আমি যেতে চাই মিঃ ব্যানার্জি—

—যাবেন?

—ভয় নেই পালাবো না। ভারি ক্লান্ত লাগছে। পুলিশকে খবর দিয়ে দিন। আমি নিজের বাড়িতেই থাকবো।

কোন কথা শোনার অপেক্ষায় না থেকে, ধীর পায়ে উমানাথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এতক্ষণ পরে আর সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে স্বস্তি পেল। কল্পনার শেষ প্রান্তে গেলেও স্থির করা যেত না, উমানাথ স্বয়ং এই মর্মন্তুদ ঘটনার নায়ক। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে পরিস্থিতিকে বিচার করার কথা কারুর মনে আসেনি। তাই বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার পর সমস্ত কিছু কেমন বিচিত্র লাগছে।

বাসব ভারি নিশ্বাস ফেলে বলল, তদন্তের এই ধরনের পরিণতি আমার কখনই ভাল লাগেনি। কিন্তু উপায় নেই বাস্তবকে সকলের সামনে টেনে আনতেই হয়।

প্রদোষ বলল, এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

—মর্মন্তুদও। ভেবে দেখুন কোন বাপ কত মরিয়া হয়ে পড়লে , কত উপায়হীন হয়ে পড়লে নিজের ছেলেকে খুন করতে পারে। মনস্তত্ত্বের এ এক শোচনীয় দিক।

রীমা বলল, উনি যে অপরাধী কি ভাবে আপনি বুঝতে পারলেন?

বাসব নড়ে চড়ে বসে বলল, উনি আমার সন্দেহের লিস্টের মধ্যে ছিলেন না। থাকার কথাও নয়। আমি অন্য সকলকে বাজিয়ে দেখেছিলাম। এই সঙ্গে উমানাথবাবুর মেয়ে ঊর্মিলা বাগচীর চকলেট রং-এর প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়িটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বাগচী দম্পতি অস্বীকার করছেন, অথচ নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, ঐ গাড়িটা বিপন স্ট্রীটের একটা বার-এর সামনে ১৫ই জানুয়ারি দুপুরে দাঁড়িয়ে ছিল। রজতবাবু দেখেছেন। উনি আরো দেখেছেন, উদয় ঐ-বার থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়েছে। আপনি তো তাই দেখেছিলেন, নয় কি?

রজত বলল, হ্যাঁ। আপনাকে আমি আরো বলেছিলাম, গাড়িতে আরো একজন লোক ছিল, কিন্তু পিছন থেকে দেখেছিলাম বলে চিনতে পারিনি।

—দ্বিতীয় লোকটা কে হতে পারে—এ নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনার সীমা ছিল না। দেখা করলাম বার-এর ম্যানেজার সাইমন বিশ্বাসের সঙ্গে। জানা গেল, বিশ্বাস লোকটাকে দেখেছে, কিন্তু চেনে না। এর পরই ব্যাপারটা আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে এল কিছুটা। এর উৎস উর্মিলা বাগচী। কথা প্রসঙ্গে উনি জানালেন, ১৫ই জানুয়ারি দুপুরে বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন, তখন উমানাথবাবু আর উদয়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। বাড়ির অন্যান্য পুরুষরা অনুপস্থিত ছিল। এবং মিসেস বাগচীর গাড়িটা কম্পাউন্ডের মধ্যে পার্ক করা ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটা বিষয় আমার মনে ছায়া ফেলল। যেমন—এক, উমানাথবাবু জেরার সময় স্বীকার করেন নি, দুপুরে উদয় তাঁর সঙ্গে ছিল। দুই, তখন বাড়িতে আর কোন গাড়ি ছিল না। তিন, কম্পাউন্ডে দাঁড় করানো মিসেস বাগচীর গাড়ির চাবি ড্যাসবোর্ডে লাগান ছিল। চার, সাইমন বিশ্বাস উদয়ের সঙ্গে যাকে দেখেছিল সে প্রধান ব্যক্তি। পাঁচ, রিপন স্ট্রীটের ঐ বার বিক্রীর মুখে রয়েছে।

একটু থেমে বাসব আবার বলতে আরম্ভ করল, কাজেই ধোঁয়াটে সন্দেহ এবার উমানাথের উপর কেন্দ্রীভূত হল। কিন্তু নিজের ছেলেকে উনি খুন করবেন কেন? জোরাল মোটিভ না থাকলে তো এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। আমি অনেক মাথা খাটিয়েও হত্যার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না। তখন বাধ্য হয়ে স্থির করলাম, আগে তো ওঁকে ফাঁদে ফেলা যাক, তারপর হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া যাবে। পরে আরো একটা ব্যাপার, ওঁর সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত করে তুলল। আপনারা বোধহয় জানেন না, উমানাথের এক কর্মচারীর ভাই—নিমাই দত্ত খুন হয়েছিল। তার খুন হওয়ার সঙ্গে উদয়ের মৃত্যুর কোন যোগ নেই। ওটা হল আরেক চক্রের স্বার্থের হানাহানির এক পরিণতি। এই নিমাই বিষ্ণু বর্ধন নামে একজন লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড হত্যাকারীকে এনে দিয়েছিল। ওর বাক্সপত্র ঘেঁটে আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক পেয়েছিলাম। ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলাম, নিমাই কার সঙ্গে কবে দেখা করেছে তার নাম কোথাও লেখেনি। নামের প্রথম অক্ষরের উল্লেখ রেখেছে। ডিসেম্বর মাসে তার তিনজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ২৪শে ডিসেম্বর "সিবি", ২৭শে ডিসেম্বর "এ" এবং ৩০শে ডিসেম্বর "বি"। "এ" আর "বি" কে চিহ্নিত করতে আমার কষ্ট হয়নি। "এ" অসীম ঘোষাল—যার কাছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়েছিল নিমাই। "বি" বিষ্ণু বর্ধন—সুপারিশপত্র দেখিয়ে যার কাছ থেকে পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু "সিবি" কে? দুটো অক্ষর কেন? তবে কি ইনি একজন মান্যবর ব্যক্তি? এই চক্রে মান্যবর ব্যক্তি বলতে উমানাথকেই বোঝায়। আমি চিন্তা ভাবনার শেষ প্রান্তে পৌঁছাবার পর বুঝলাম, "সিবি" হল চৌধুরীবাবু।

বাসব এতটা বলার পর থামল।

পাইপে মিক্সচার ঠেসে ধরিয়ে নিল। ঘরের আর সকলে নির্বাক বসে রয়েছে।

বাসবের পারদর্শিতা বোধহয় সকলকে নিয়ে গেছে বিস্ময়ের অতলান্তে। ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়ার আবরণে নিজেকে ঢেকে ফেলল বাসব।

আবার বলতে আরম্ভ করল, উমানাথবাবু সম্পর্কে একরকম নিশ্চিত হয়ে আমি আবার সাইমন বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করলাম। হাতে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই জাল ফেলার ব্যবস্থা করতে হল। টোপ হিসাবে আমি বিশ্বাসকে ব্যবহার করবো স্থির করলাম। বিশ্বাস প্রথমে রাজী হতে চায় না। বাধ্য হয়েই ভয় দেখাতে হল। বললাম, আমার কথা মেনে নিলেই ভাল করবেন। নইলে আমাকে লালবাজারে খবর পাঠাতে হবে। তখন কিন্তু ভীষণ ঝামেলায় পড়ে যাবেন। কিছু গাঁইগুঁই করার পর লোকটা রাজী হল। আমি প্ল্যানটা বুঝিয়ে বললাম। যেন বিশ্বাস সমস্ত বুঝে ফেলেছে। পুলিশে খবর দেওয়ার আগে সে সোমনাথের সঙ্গে দেখা করতে চায়। 'ব্ল্যাকমেল'-এর গন্ধ মিশিয়ে দেওয়া হল। আমি তাকে একটা মিনি টেপরেকর্ডার দিলাম। দুজনের মধ্যে যা কথাবার্তা হল, তা যেন টেপ হয়ে যায়। সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিজের ফ্ল্যাটেই করতে হবে।

সাইমন বিশ্বাস যখন উমানাথকে ফোন করে তখন আমি ওঁর সামনেই বসেছিলাম। বাড়ির আর সকলেও ছিল। উনি অবশ্য তখন ওঁর গুদাম থেকে চুরি যাওয়া কাঠ যে কিনেছে তার নাম করে ফোনের ব্যাপারটার উপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। তবে মনে, মনে নিশ্চয় ভয় পেয়ে যান। দেখা করতে যেতেই হয় বিশ্বাসের সঙ্গে। সোফার তলায় রাখা টেপ রেকর্ডারে যথা নিয়মে দুজনের কথা রেকর্ড হয়ে যায়। এক লক্ষ টাকার দাবী ছিল। টাকাটা অবশ্য উমানাথের কাছে কিছুই নয়। তবে উনি নিশ্চয় তখনই অনুভব করেছিলেন, একবার টাকা দিলেই সব কিছু মিটে যাবে না। ব্ল্যাকমেলিং-এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। উমানাথ বিচক্ষণ ব্যক্তি। চিন্তা ভাবনার পর সার কথাটা বুঝতে ওঁর অসুবিধা হল না। আমার অনুসন্ধানের ধারা ওঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিল, আজ নয় কাল চিহ্নিত হবেনই। আত্মধিক্কার আর অনুশোচনায় মন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলই। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে আমার কাছে চলে এলেন। কি বলেছেন, আপনারা শুনেছেন। উমানাথ পুত্র হত্যার মত এক জঘন্য অপরাধ করেছেন। তবু ওঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য আর সৎসাহসকে প্রশংসা করতে হয়।

প্রদোষ বলল, আপনি ঠিকই বলছেন। এতবড় অপরাধ করেছেন, তবু মন থেকে ওঁকে খারাপ বলতে পারছি না। তবে একটা কথা—

—বলুন?

—কাজটা উনি করলেন কি ভাবে?

বাসব পাইপে শেষ টান দেবার পর বলল, চাক্ষুষ প্রমাণ কিছু নেই। তদন্তের সূত্র ধরে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছি। মনে হয় বাস্তবের সঙ্গে খুব অমিল হবে না এই ছবির। উমানাথ বোধহয় গত বছরের শেষ দিকে উদয়ের ধারাবাহিক নক্কারজনক কাণ্ডকারখানায় নিজের অতিষ্ঠ মনকে এক বিন্দুতে এনে ফেলেন। এমন ছেলের বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। ওঁর এক কর্মচারী নিতাই দত্তর

ভাই নিমাই দত্তকে স্বাভাবিক কারণেই চিনতেন। লোকটা নানা গোলমেলে ধান্দায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল। তারই সাহায্যে উনি পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর উদয়ের প্রতি মনোভাব নরম করে আনেন। এই ভাবে না থেকে কোন কাজকর্ম করার কথা বলেন। তার কোন পছন্দ মত ব্যবসা থাকলে উনি ব্যবস্থা করে দেবেন। রিপন স্ট্রীটের ঐ বারটা বিক্রী হওয়ার কথা হচ্ছে উদয় বলে বাপকে। বার-এর ব্যবসাটা ভালই চালাতে পারবে এ কথাও জানায়। উমানাথ রাজী হয়ে যান। এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন বারটা একবার দেখে আসবার। ১৫ই জানুয়ারি বাপ ও ছেলের ঐ সম্পর্কেই কথা হচ্ছিল। তখন ঊর্মিলা এসে উপস্থিত হন বাপের বাড়ি। উমানাথের সঙ্গে উপাচারিক কথাবার্তার পর ঊর্মিলা ভেতর মহলে গিয়ে ভি. সি. আর-এ সিনেমা দেখতে বসে যান। এমন হতে পারে, উমানাথ চেয়েছিলেন বা উদয় জেদ ধরেছিল, পরিস্থিতি যে ভাবেই গড়াক— দুজনে কম্পাউন্ডে দাঁড় করানো ঊর্মিলার গাড়ি নিয়ে রিপন স্ট্রীটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যে কোন একটা সুযোগের প্রয়োজন ছিল। উদয় বেসিনের কাছে যেতেই উমানাথ দ্রুত হাতে কিছুটা পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড হুইস্কি ভরা গেলাসে মিশিয়ে দেন। বাপের সামনে ছেলে মদ খাচ্ছে, এ এক বিশ্রী দৃষ্টান্ত হলেও, মনে হয় কেন, নিশ্চয় উমানাথ উদয়কে এই ছুট দিয়ে রেখেছিলেন। উমানাথ ঐ ভেষজের কার্যকাবিতা নিশ্চয় জানতেন। উদয়কে কয়েক ঘন্টা বাড়ির বাইরে রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য এজন্য ওঁকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি, কারণ উদয় নিশ্চয় ওঁকে বলেছিল, আজ বাড়ি ফিরতে পারবে না। কোন বন্ধুর ওখানে আটকে যাবে বা ঐ ধরনের কিছু। আর কিছু বলার নেই। আপনারা জানেন, এরপর সে কি ভাবে হোটেলে মারা গেল।

রীমা বলল, আমাদের দুর্ভোগের দিন শেষ হল। আপনাকে যে কি ভাবে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। তবে—

ওর কথার খেই ধরে প্রদোষ বলল, আপনার প্রতিভার প্রশংসা করে বা ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। তবে যা করলেন, তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। এবার আমাদের কর্তব্য আমরা করবো। কিন্তু ঠিক..

বাসব বলল, কি বলুন তো?

—পেমেন্টের কথা বলছিলাম। আপনার—

--কোন নির্ধারিত ফি নেই। যা ভাল বুঝবেন, সেটাই আমার পেমেন্ট। ব্যস্ততার কিছু নেই। কাল, পরশু যেদিন হোক, হলেই হবে। এবার আমি লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। উমানাথ সংক্রান্ত ব্যাপারটা ওঁদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

এবার বিদায় নেবার পালা। সকলে চলে যাবার পর শৈবাল বলল, আরেকবার বলতে বাধ্য হচ্ছি, খেলাটা তুমি ভালই দেখাল। উমানাথবাবুকে এই কর্মকান্ডর হোতা ভাবতেও পারিনি। মিঃ সামন্তও অবাক হবেন।

বাসব কিছু না বলে মৃদু হাসল। তারপর ফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত তখন সাড়ে এগারটা।

বাসব শুতে যাবার কথা ভাবছিল। শৈবাল বহুক্ষণ হল চলে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর এতক্ষণ বই পড়ছিল। অনেক আগেই নিশ্চয় উমানাথকে কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে। চৌধুরী বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোন খবরা-খবর পাওয়া গেল না কেন?

প্রশ্নের উত্তর অবশ্য মিনিট কয়েকের মধ্যেই পাওয়া গেল।

স্বয়ং পুরন্দর সামন্ত এসে উপস্থিত হলেন।

ওঁকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে।

ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসে পড়ে বললেন, এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত না করে উপায় ছিল না। একটা চিঠি আছে আপনার নামে। এই যে—

পুরু বাদামি খামে মোড়া চিঠিটা এগিয়ে ধরলেন।

বাসব খামটা হাতে নিয়ে বিস্ময়ের সুরে বলল, চিঠি। ব্যাপারটা কি?

—উমানাথবাবু মারা গেছেন।

—আত্মহত্যা করেছেন?

—হুঁ। আপনার কাছ থেকে খবর পেয়ে, নটার কিছু পরে সদলবলে ওঁর বাড়ি পৌঁছালাম। তখন ওখানে কারুব কিছু জানা নেই। অসময়ে পুলিশ দেখে ওঁর দুই ছেলে বিলক্ষণ ঘাবড়ালেন। প্রশ্ন করে জানা গেল, উমানাথবাবু ঘন্টা দেড়েক আগে ফিরেছেন। এখন নিজের ঘরে আছেন।

—ঘরে গিয়ে দেখলেন, উনি মারা গেছেন।

—একজ্যাক্টলি। ওঁর শিথিল শরীর এলিয়ে ছিল হ্যারিংটন চেয়ারের উপর। মুখ কিছুটা বিকৃত। আধবোঁজা চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল গালের মাঝা-মাঝি এসে শুকিয়ে গেছে। এমনিতেই বোঝা যাচ্ছিল। তবু ডাক্তার আনিয়ে পরীক্ষা করানো হল। এখানকার অবস্থা কি রকম হয়ে উঠেছিল বুঝতেই পারছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে অনিচ্ছার সঙ্গে পুলিশকে কত অমানুষ হয়ে উঠতে হয় আপনি তো জানেনই। বডি পোস্টমর্টেমে চালান করে দিয়ে তবে আসছি।

—চিঠিটা পেলেন কোথায়?

—হ্যারিংটন চেয়ারের পাশেই নীচু একটা টুল ছিল ঐ টুলের উপর রাখা দুটো চিঠি। একটা আপনাব নামে, আরেকটা আমার নামে। আমাকে লেখা চিঠিটা পড়েছি। উনি নিজের অপবাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। কোনরকম চাপের মুখে পড়ে নয়, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর নিজের এই গ্লানিকর জীবন শেষ করে দেবার মনস্থ করেছেন—ইত্যাদি।

—একদিক থেকে ভালই হল। উমানাথবাবুর মত মানুষ জেলে পচতে থাকতেন, এটা ঠিক হত না। কোন্ পয়জেনের সাহায্য উনি নিয়েছিলেন, কি বলেন?

সামন্ত বললেন তাতো বটেই। তবে সঠিক বস্তুটা কি বোঝা যায় নি। চিঠিতে ও সম্পর্কে কিছু লেখেন নি উমানাথ।

—দেখি, আমাকে কি লিখেছেন।

বাসব খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করল।

পড়তে আরম্ভ করল অনুচ্চ গলায়—

মান্যবর বাসববাবু,

আমি গভীর ভাবে অনুভব করলাম, দুনিয়াতে আর থেকে যাবার কোন অধিকার আমার নেই। আমি এক জঘন্য কাজ করেছি। তবে সান্ত্বনা এইটুকুই, এতে পরিবার ধ্বংসের মুখ থেকে বেঁচে যাবে।

পটাশিয়াম অ্যাকোডাইড যা সংগ্রহ করেছিলাম, তার সবটা কাজে লাগেনি। বাকীটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাবার পরই আপনার কাছে গিয়েছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি আমাকে চিনে ফেলেছেন। তাই আপনাকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেবার জন্য ওখানে পৌঁছালাম।

আপনার প্রতিভা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, বিদায় বেলায় আর হাস্যস্পদ হতে চাই না। শুধু প্রার্থনা—উত্তর, উত্তর আপনার শ্রীবৃদ্ধি হোক। উদিতের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন। সে নিশ্চয় আপনার প্রতিভার মর্যাদা রাখবে। বলার তো আরো অনেক কিছু ছিল কিন্তু আপনার সময় আর নষ্ট করব না।

সশ্রদ্ধ শেষ নমস্কার গ্রহণ করুন
উমানাথ চৌধুরী।

সামন্ত বললেন, পরিস্থিতির চক্রান্তে পড়ে মানুষ কোথায় নেমে যেতে পারে উমানাথবাবু তার দৃষ্টান্ত। যাক, ব্যাপারটা মিটে গেল। ফাইল ক্লোজ করতে বলে দেব। এবার আপনি ঝেড়ে কাশুনতো। উমানাথকে চিহ্নিত করলেন কিভাবে?

বাসব চিঠিটা পকেটে রেখে নিয়ে বলল সব কথাই বলছি। তার আগে দু-কাপ গরম কফি হলে বোধহয় ভাল হয়।

—এত রাত্রে! আপনার বাহাদুর তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তার দোষ নেই। বিশ্রাম তো দরকার।

—তাহলে—

—ভারি বিবেচক বাহাদুর। প্রতিদিনই ফ্লাক্সে কফি করে রেখে দেয়। দু'মিনিট সময় দিন। আনছি।

বাসব কিচেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল।

উত্তর সন্ধ্যায়

শেষ পর্যন্ত সুকুমারের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

নৈনিতালের প্রশংসা সে শুনে আসছিল সেই ছোটবেলা থেকে। রাঙামাসি নৈনিতাল গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন দিন দশেক। হাত-মুখ নেড়ে প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিচ্ছিলেন পাহাড়ী শহরটির। সেই প্রথম নৈনিতালের কথা শুনল সুকুমার। তারপর অজস্রবার চেনা ও অচেনা অসংখ্য মানুষের মুখ থেকে।

সুকুমার স্থির করেই রেখেছিল নৈনিতাল একবার যেতে হবে। তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে, প্রথম চেষ্টাতেই তার চাকরি হল রেলে। বাবা রেলে কাজ করতেন। দাদারা রেলে কাজ করেন, এই বিভাগে চাকরি পেয়ে যাবে এই আশা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। তবে যা দিনকাল পড়েছে, এখন না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

রেলে চাকরি পাবার পর নৈনিতাল যাবার সম্পর্কে সুকুমার নিশ্চিত হয়েছিল। ট্রেনের ভাড়া লাগবে না—এই সুবিধেটুকুই বা কজন পায়। কিন্তু তার এমন দুর্ভাগ্য, চাকরিতে যোগ দেবার পাঁচ বছর কেটে যাবার পরও সে যেতে পারল না। শীতকালে বরফের দেশে যাওয়া যায় না। গরমকাল প্রশস্ত সময়। গত পাঁচ বছরের প্রতি গরমকালে কোন না কোন অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। যাওয়া হয়নি।

এবার প্রথম থেকেই সুকুমার সতর্ক ছিল। অসুবিধার পাল্লায় যাতে না পড়ে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত এপ্রিলের শেষে নৈনিতালে এসে উপস্থিত হল। এক মাস দশ দিনের ছুটি নিয়েছে। এতদিনের ছুটি পাওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে।

দিন ছয়েক হল এখানে এসেছে। নৈনিতালের অপরূপ সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে অবগাহন করছে সুকুমার। উঠেছে 'সিলভার অ্যারো' হোটেলে। হোটেলটি ভালো। ফরেন টুরিস্টরা বা ভি. আই. পি'রা অবশ্য এখানে এসে ওঠে না। সে বৈভব তার নেই। তবে মধ্যবিত্তদের কাছে স্বর্গ। মধ্যবিত্ত বাঙালি হোটেল বলতে যা বোঝায় 'সিলভার অ্যারো' ঠিক তা নয়। কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য কেতাদুরস্ত।

হোটেলের অবস্থানও চমৎকার। কার্টার রোড আর হিলভিউ রোডের সংযোগে প্রতি ঘরে বসে বিরাট ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোর মধ্যে দিয়ে তুষারের বর্ম-আঁটা পাহাড়কে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। অনেক বোর্ডার চাঁদনী রাতে হোটেলের বাইরে না গিয়ে ঘরে বসেই নৈনিতালের সৌন্দর্যসুধা পান করেন।

'সিলভার অ্যারো' হোটেলটি প্রতিষ্ঠা করে একজন গোয়ানিজ।

সুদূর গোয়া থেকে এখানে এসে কেন যে বাগ্রাঞ্জা হোটেল খুলে বসেছিল, তা বলা যায় না। বিশেষে সে মোটেই ব্যবসাদার ছিল না। পাঞ্জিমে ঠিকাদারের কাজ করত। অনেক টাকা খরচ করে হোটেল বাড়িটি তৈরি করেছিল সে। ব্যবসাও আরম্ভ করেছিল অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। মদ বাগ্রাঞ্জাকে অতলে তলিয়ে দিল।

বাজারে প্রচুর ধার। হোটেলের দরজা প্রায় বন্ধ হয়-হয়। বাগ্রাঞ্জা পাওনাদারের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে বেড়াতে লাগল। হোটেল বিক্রি করা ছাড়া আর কোন পথ তার সামনে খোলা রইল না।

দিলীপ মুখার্জি সেই সময় 'সিলভার অ্যারো'র একজন বোর্ডার ছিলেন। বাগ্রাঞ্জাকে তিনি হোটেল কিনে নেবার প্রস্তাব দিলেন। রেলের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে গোলমাল হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের ভবিষ্যত কর্মপন্থা কি হবে সেই সম্পর্কে গভীর চিন্তা করবার জন্য নৈনিতাল এসেছিলেন। নিরিবিলিতে চিন্তা করবার অনেক সুবিধা। চিন্তা বিশেষ করতে হল না এখানে। বাগ্রাঞ্জার শোচনীয় অবস্থা উৎসাহিত কবল তাঁকে। কথাবার্তা অবিলম্বে পাকা হয়ে গেল। হস্তান্তরিত হল 'সিলভার অ্যারো'। তারপর থেকে হোটেলটি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দিলীপ মুখার্জি নিজেই ম্যানেজারের পদটি গ্রহণ করেছেন।

বাঙালি ওনার বলেই বোধ হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত বাঙালি এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁদের অধিকাংশ 'সিলভার অ্যারো'তে আশ্রয় নেন। অবশ্য দু-বছর আগেকার মত এখন এখানে সহজে জায়গা পাওয়া যায় না, চিঠি লিখে মাসখানেক আগে থাকতে জায়গা বুক করে রাখতে হয়। সুকুমার তাই করেছিল।

বেশ মনের আনন্দে সুকুমার আছে নৈনিতালে। আটটার সময় হোটেল থেকে বেরোয় প্রতিদিন। ফিরতে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা হয়ে যায়। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। প্রচণ্ড খিদে হচ্ছে। চমৎকার স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে, এ বিশ্বাস সুকুমারের আছে। দুপুরে বই পড়ে আর জানালার চৌক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে পাহাড়কে দেখেই কাটিয়ে দেয়। বিকেলে বেড়োয় আবার অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। যথানিয়মে সুকুমার বেড়িয়ে ফিরছে হোটেলে, পার্লার পেরিয়ে ওপরে উঠতে যাবে, কাউন্টারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থেমে গেল। কি আশ্চর্য! তার অত্যন্ত এক পরিচিত ভদ্রলোক দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছেন। ওপরে আর উঠল না, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কাউন্টারের কাছে।

মুখার্জি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তখন বলছেন, আপনি বাঙালি, এই বিদেশে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যি আনন্দিত হতাম। কিন্তু নিরুপায়, কোন ঘর খালি নেই হোটেলে।

ভদ্রলোক বললেন, কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না?

উঁহু। আজ কম করেও দশজনকে ফিরিয়েছি। আপনারা তো মশাই আমার লক্ষ্মী, আপনাদের অনর্থক ফিরিয়ে দিলে তো আমারই ক্ষতি।

সুকুমার বলে উঠল, আপনি একটা সিঙ্গল খাট বা চৌকির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তাহলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক চমকে মুখ ফেরালেন। তারপর সহর্ষে বলে উঠলেন, একি! কুট্টু, তুমি...

আস্তে, আস্তে মধুসূদনবাবু, আমার ডাকনামটা আর এখানে প্রচার করে দেবেন না। কখন এলেন?

এই তো আসছি। ইনি বলছেন, ঘর খালি নেই। রাত হয়ে গেল, কি করব বুঝতে পারছি না। তুমি কবে এলে?

দিন কয়েক হল।

দিলীপ মুখার্জি বললেন, দিন কয়েক আগে আমায় জানিয়ে রাখলে এই অসুবিধায় আপনাকে পড়তে হত না।

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে মধুসূদনবাবু বললেন, আসবার কোন স্থিরতা ছিল না। হঠাৎ ছুটি পেয়ে যাওয়ায় ট্রেনে চেপে বসেছিলাম আর কি।

মিস্টার মুখার্জি...

সুকুমারের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, বলুন?

এখুনি একটা সিঙ্গল খাট বা চৌকির ব্যবস্থা করতে পারবেন কি?

কি করবেন?

জোগাড় করে দিতে পারবেন কিনা বলুন না?

পারব না কেন?

তাহলে তো কোন সমস্যাই রইল না। এ ভদ্রলোক সহজেই আমার ঘরে থাকতে পারবেন।

মধুসূদনবাবু যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এক মুখ হেসে বললেন, বাঁচালে ভাই। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, নইলে এই বিদেশে কোথায় যে হাতড়াতাম।

দিলীপ মুখার্জিও হাসলেন।

যাক, সমস্যার সমাধান তাহলে হয়ে গেল। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা চৌকি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আসুন মধুসূদনবাবু, আমরা ঘরে যাই।

আপনি যান, মালপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘরে।

মধুসূদনবাবু সুকুমারকে অনুসরণ করলেন।

সুকুমারের ঘরখানা ছোট নয়, হেসেখেলে দুজনের সঙ্কুলান হয়ে যাবে।

মধুসূদনবাবুর সঙ্গে সুকুমারের যে প্রচণ্ড হৃদ্যতা আছে, তা কিন্তু নয়। সাধারণ মুখ-চেনাচিনি আছে বলা চলে। পথে-ঘাটে কালে-ভদ্রে দেখা হলে, কি খবর? ভালো তো?—এই ধরনের মামুলি কথাবার্তা হয়ে থাকে। একে মুখ-চেনাচিনি ছাড়া আর কি বলা চলতে পারে।

শুধু তার সঙ্গেই নয়, মুঙ্গেরের কোন বাঙালির সঙ্গে মধুসূদনবাবুকে কেউ কখনো হৃদ্যতা করতে দেখেনি। সুকুমারের মনে হয়েছে তাঁর চারপাশটা যেন রহস্যের আবরণ দিয়ে ঢাকা। ইচ্ছে করেই যেন তিনি কারুর সঙ্গে মিশতে চান না। তাঁর অতীত জীবনে এমন কিছু ঘটনা নিশ্চয় আছে, যা কারুর কাছে প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্যই সকলকে এড়িয়ে চলেন। মধুসূদনবাবুর সম্পর্কে এই ধারণা সুকুমারের একার নয়, মুঙ্গেরের আরো অনেক বাঙালি ও অবাঙালির।

মধুসূদন গুপ্ত উচ্চতায় ফিট ছয়েক হবেন। রোদে-পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। মুখ-চোখ ভালোই। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। ঘন ঘন নস্যি নেন। চশমাও আছে চোখে। 'মুঙ্গের ট্রেনিং কলেজে' অধ্যাপনা করেন।

সুকুমার মধুসূদনবাবুকে দৈবাৎ আবিষ্কার করে। মুঙ্গেরের ছোটিকিলা বাড়িব বাসিন্দা সে। একদিন লক্ষ্য করল, একজন বাঙালি ভদ্রলোক বাজারের থলি হাতে ফিরছেন। শহরের কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও প্রত্যেক বাঙালির সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালির পরিচয় আছে।

উনি কে?

পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে তো কেউ নয়, নিশ্চয় নতুন এসেছেন শহরে। কলকাতায় কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। আলাপের গণ্ডীর বিস্তৃত করা তাঁরা পছন্দ করেন না। দুটি পাশাপাশি ঘরে একই সময় শ্রাদ্ধ ও বিয়ের অনুষ্ঠান হতে বাধা নেই। কিন্তু প্রবাসী বাঙালির মনোভাবকে ওই দৃষ্টি-কোণ দিয়ে বিচার করা চলবে না।

সুকুমার তৎপর হল। নতুন একজন বাঙালি এসেছেন, বিশেষ তাদের পাড়ায়—সুতরাং উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা তার কর্তব্য। সে গেল তাঁর বাসায়। হাসি-মুখে নিজের পরিচয় জানাল। আসবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেও ভুলল না।

মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারের আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন। গম্ভীর মুখে নিজের নাম বললেন। কলকাতা থেকে ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক হয়ে এসেছেন, তাও জানালেন। এবং পরিশেষে বললেন, তিনি ব্যস্ত মানুষ, গল্প-গুজব করে নষ্ট করার মত সময় তাঁর নেই। আরো যারা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ, তাদের যদি সুকুমার এই কথা জানিয়ে দেয়, তবে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন।

এই ধরনের পরিষ্কার ইঙ্গিত পেয়ে সুকুমার হতবাক্। ভদ্রলোকের শিষ্টাচার জ্ঞান একেবারেই নেই বুঝতে পারা যায়। সে চলে এসেছে। দু-চার কথা শুনিয়ে আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নিজের সংযমের রাশকে শেষ পর্যন্ত কড়া হাতে টেনে রাখল।

আর যায় নি। তবে পথে-ঘাটে দেখা হলে ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নেন নি। একটু হেসেছেন। দু-চারটে কুশল প্রশ্ন করেছেন। সেই মধুসূদন গুপ্তকে সুদূর নৈনিতালের সিলভার-অ্যারো হোটেলের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুকুমার স্বাভাবিকভাবেই অবাক হয়েছিল।

তারপরই প্রতিশোধ নেবার দুর্বার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল। প্রথম সাক্ষাতে মধুসূদনবাবু তার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে চান নি। সে আজ তাঁকে বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে। নিজের অসুবিধা করে, নিজের ঘরে স্থান দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোকের সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেছিলেন।

রাত্রে মধুসূদনবাবুর সঙ্গে সুকুমারবাবুর কোন কথাই হল না। দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের জন্য ক্লান্ত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া সারলেন সাড়ে আটটার মধ্যে। শুয়ে পড়লেন। দশ মিনিটের মধ্যে ভারি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ পাওয়া গেল—তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

তখন সবে ভোর হয়েছে। মধুসূদনবাবু সুকুমারকে ঘুম থেকে তুললেন, ওহে কুট্টু, চলো বেড়িয়ে আসি।

চোখ রগড়ে নিয়ে সুকুমার বলল, এই সাত সকালে বেড়াতে বেরুবেন কি! ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবেন যে!

কোর্টের ওপর গ্রেটকোট চাপালেও সুবিধা হবে না বলছ?

এখন রাস্তায় নামার অর্থ হল নিউমোনিয়াকে দ্রুত আমন্ত্রণ করা। আপনি মাত্র গতকাল এসেছেন, এখানকার হালচাল জানেন না। আমি কিছু কিছু বুঝেছি।

এক টিপ নস্যি নাকে দিলেন মধুসূদন গুপ্ত। জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন, আমার কথাবার্তায়, ব্যবহারে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে যাচ্ছ?

একটু হচ্ছি বইকি।

আমি একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসি না বললে ভুল হবে, আমি ভয় পাই।

ভয় পান! কেন?

এই কেন-র উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তুমি নেহাত ছেলেমানুষ, সে-সমস্ত কথা তোমার কাছে নাই বা বললাম। তবে এইটুকু জেনে রাখো, একদিন আমি অত্যন্ত মিশুক ছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। সে একদিন গেছে—আর আজকে, আমার দিনগুলির রূপ অন্যরকম।

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, আমি বোধ হয় মুঙ্গেরের প্রথম লোক, যার সঙ্গে আপনি ঘনিষ্টভাবে কথা বলছেন।

কলেজের আওতার বাইরে তাই বটে। কলেজে আমায় অনেক কথা বলতে হয়। প্রতিদিন গোটা তিনেক লেক্‌চার থাকেই। কুট্টু, তুমি কিছু মনে করো না ভাই।

কিসের বিষয়ে?

আমার বাসায় গিয়েছিলে, আমি তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি। আমি মর্মাহত। আমি কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে যে আনন্দ পাই, তা নয়, তিক্ত

অভিজ্ঞতায় বিপর্যস্ত মন আমাকে নাড়া দিয়ে বলে, ভুলে গেলে সে-সমস্ত দিনের কথা! এই সামাজিক জীবরা তোমাকে সর্বহারা করে ছেড়ে দিয়েছে। তারপরই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

আপনার জীবনে নিশ্চয় এমন কোন আঘাত আছে, যার জন্য আপনি মানুষের সঙ্গকে বিষবৎ এড়িয়ে চলতে চান।

তুমি ঠিকই ধরেছো। এক সময় মনে হয়েছিল কোথাও চলে যাই, যেখানে মানুষ নেই। প্রেম-ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, আড়ালে যেখানে কেউ বুকে মারবার জন্য ছুরি শানায় না।

সুকুমার কথার মোড় ঘোরাল, নৈনিতালে এসে কেমন বোধ করছেন, বলুন?

খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগছে বলেই তো তোমার সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে পারলাম।

লবির ওয়াল ক্লকে সশব্দে সাতটা বাজল।

সুকুমার বাথরুমে গেল।

মধুসূদন ঘনঘন নস্যি নিতে লাগলেন।

দিন দুয়েকের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেল দুজনের মধ্যে।

এখানে-ওখানে চুটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

এক-এক সময় সুকুমারের ইচ্ছে হচ্ছে মধুসূদন গুপ্তকে প্রশ্ন করে তাঁর জীবনের অন্ধকার দিক সম্পর্কে আবার সে-ইচ্ছে দমন করে নিচ্ছে। যদি বিরক্ত হন, যেটুকু হৃদ্যতা হয়েছে, তাও ভেঙে যাবে।

বলতে গেলে আজ সারাটা দুপুর দুজনে লেকে বোটিং করে কাটালেন। নৈনিতালের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল এই বোটিং। অত্যন্ত ভালো লাগে। ভারতের কোন শৈলাবাসে এমন চমৎকার লেক নেই।

তীরে ফিরে এসে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, যারা নির্জনতা ভালোবাসে কয়েক বছর পরে তারা কেউ আর এখানে আসবে না।

লেকের জলে ভাসমান অসংখ্য বোটের দিকে তাকিয়ে সুকুমার বলল, সত্যি, অত্যন্ত ভিড় হয়ে গেছে।

দার্জিলিং-এর অবস্থা আরো খারাপ। গত বছর গিয়েছিলাম। তিনদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মানুষ আর মানুষ। দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেমন মানুষ চলে—ঠিক তেমনি। প্রতিটি রাস্তায় গায়ে গা ঠেকিয়ে চলেছে জনস্রোত।

অথচ শুনি ভালোভাবে বেঁচে থাকার মত পয়সা নাকি আমাদের কাছে নেই।

একজ্যাক্টলি। আচ্ছা, এত পয়সা মানুষ কোথা থেকে পাচ্ছে বলতে পারো?

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে চললেন।

মেঘলা আকাশ।

পরিষ্কার তকতকে রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলতে ভালোই লাগছে।

কিছু দূর অগ্রসর হয়েছেন দুজনে।

ও মশাই, শুনছেন...

পিছন থেকে কে একজন ডাকল।

সুকুমার পিছন ফিরে দেখল, একজন চল্লিশের কোঠায় পৌঁছতে সামান্য বিলম্ব ভদ্রলোক হাত দশেকের ব্যবধানে রয়েছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিশ্চয়ই ওদের নয়, রাস্তায় আরো লোক রয়েছে, তাদের কাউকে ডেকে থাকবেন তিনি। সুকুমাব মুখ ফিরিয়ে নিল।

শুনুন আপনাদেরই বলছি।

ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলেন।

আমাদের!

আপনারা বাঙালি তো?

বাঙলায় কথা বলছি শুনতেই পাচ্ছেন। কি দরকার বলুন তো?

আমি বাঙালিদের সঙ্গ পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি মশাই! আপনাদের দেখে স্বজাতি মনে হল, তাই...

মধুসূদন গুপ্তর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

হাঁপিয়ে উঠেছেন কেন?

ভদ্রলোক মহা আশ্চর্য হলেন।

হাঁপিয়ে উঠব না! কি বলছেন! মাসখানেক হল এখানে এসেছি, কথা বলার একটা লোক পাচ্ছি না। আসুন না, ওখানে বসা যাক।

রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চের দিকে ভদ্রলোক অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

অনিচ্ছার সঙ্গে মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বসলেন বেঞ্চের ওপর। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম মৃগাঙ্ক ঘোষ। খাস কলকাতার লোক। পৈতৃক সূত্রে একটা গেঞ্জির মিলের মালিকানা এখন তাঁর। বর্মায় গেঞ্জি সাপ্লাই করে প্রচুর পয়সা করেছেন। প্রতি বছব গরমকালে কোন না কোন শৈলাবাসে গিয়ে কম করেও মাস দুয়েক কাটিয়ে আসেন।

এবার নৈনিতালে এসেছেন।

হোটেলে থাকা তাঁর পছন্দ নয়। বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে তিনি অভ্যস্ত নন। যেখানেই যান, হোটেলে না উঠে একটা বাড়ি ভাড়া করেন। এখানেও তাই করেছেন। সেকেণ্ড রেঞ্জের অর্কিড হাউস ভাড়া নিয়েছেন। ভাড়া একটু বেশি। তা হোক, বাড়িটা ভালো।

প্রথম কদিন সময় তাঁর ভালোই কেটেছিল। সস্ত্রীক এসেছেন। দুজনে মিলে চুটিয়ে বেড়িয়েছেন এধার-ওধার। তারপর লালায়িত হয়ে পড়েছেন অনেক মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য। তিনি মিশুক মানুষ; কলকাতার বকুল বাগানের মৃগাঙ্ক ঘোষের বৈঠকখানার জমাটি মজলিসের কথা কে না জানে!

এখানেও লোকের অভাব নেই।

ইচ্ছে করলেই মজলিস বসাতে পারেন। কিন্তু বিরাট এক অসুবিধা মাথা চাড়া

দিয়ে উঠল। হিন্দী একরকম জানেন না, কাজেই পাঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশের লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারছেন না। প্রচুর বাঙালী এসেছে এবার নৈনিতালে। সেখানেও সুবিধা করতে পারলেন না মৃগাঙ্ক। উঁচু মেজাজ ও উঁচু মহলের মানুষ তাঁরা। মৃগাঙ্ক ঘোষের প্রচুর পয়সা আছে, তাই তাঁরা পাত্তা দিলেন না।

পৃথিবীতে অসংখ্য শ্রেণীর মানুষ আছে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ এক বিচিত্র শ্রেণীর সন্দেহ নেই। তিনি পথে পথে বাঙালি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। অবশ্য মধ্যবিত্ত বাঙালি—যাদের সঙ্গে গল্পগুজোব করে আনন্দ পাবেন। সুকুমার ও মধুসূদনবাবুকে দেখতে পেয়ে তাঁর ধারণা হল, এঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে তিনি উপেক্ষিত হবেন না।

রাস্তার ধারের বেঞ্চের ওপর বসে ঘণ্টাখানেক গল্পগুজোব হল তিনজনের মধ্যে।

মৃগাঙ্ক ঘোষকে অপছন্দ হল না সুকুমারের। কথাবার্তা বেশ গুছিয়ে বলতে পারেন ভদ্রলোক, এবং রসিকও। মধুসূদন গুপ্ত কিভাবে গ্রহণ করলেন ভদ্রলোককে তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারা গেল না।

মৃগাঙ্ক ঘোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে আসবার পর মধুসূদন গুপ্ত বললেন, কিরকম দেখলে লোকটিকে?

মন্দ কি!

কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে?

একটু চিন্তা করে সুকুমার বলল, কই না!

মধুসূদন গুপ্ত হাসলেন।

তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।

বেশ তো, বলুন না, কি এমন বিশেষ জিনিস আপনি ভদ্রলোকের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন?

একটু সতর্ক থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। তাঁর কথাবার্তার ধারা একটা বিশেষ দিক ঘেঁষে ছিল। সুতরাং আমার অনুমান করে নিতে কষ্ট হয়নি, নারী জাতির ওপর অসম্ভব দুর্বলতা আছে তাঁর।

কথা শেষ করে মধুসূদন গুপ্ত এক টিপ নস্যি নিলেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিয়মিত সিলভার অ্যারো হোটেলে আসতে লাগলেন। তিনি আসেন বেলা পড়ে এলে, যান রাত জমে উঠলে। চা-পর্বটা এখানে সমাধা করেন। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প হয়।

তবে সুকুমার লক্ষ্য করেছে, প্রসঙ্গ যাই হোক না কেন, একটি নারী চরিত্রকে কোন না কোন উপায়ে ঠিক এনে ফেলেন মৃগাঙ্ক। তখন তাঁর মুখ-চোখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মধুসূদন গুপ্তের সন্দেহ সম্পর্কে সে নিশ্চিত হল।

সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে মৃগাঙ্ক উঠলেন। পোর্টিকো পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলো সুকুমার।

আবার ওপরে উঠে যাবার মুখে দিলীপ মুখার্জি বললেন, একটা কথা বলছিলাম...

কাউন্টারে তখন আর কেউ ছিল না।

সিঁড়ির মুখ থেকে সরে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল সুকুমার।

বলুন।

মিক্সচারের সাহায্যে সিগারেট পাকাচ্ছিলেন দিলীপ মুখার্জি। ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, একটা প্রশ্ন ছিল, যদিও অনধিকার চর্চা...

সঙ্কোচ করবেন না। কি বলতে চান বলুন না!

যাঁকে আপনি পোর্টিকো পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন, ওঁর নাম যতদূর মনে পড়ছে মৃগাঙ্ক ঘোষ। ওঁকে কতদিন থেকে চেনেন?

দিন ছয়েক, কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধের নয়।

ওঁকে চেনেন?

নাম বললাম শুনলেন না! একবার সিলভার অ্যারোতে এসে উঠেছিলেন, তখন থেকেই আমি ওঁকে চিনি।

সুবিধের নয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

সে অনেক ব্যাপার, সমস্ত কথা বলতে চাই না। আপনি আমার একজন বোর্ডার এবং আপনাকে আমি একজন সজ্জন ব্যক্তি বলে মনে করি, সুতরাং সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করলাম।

বিস্মিত সুকুমার বলল, এই হোটেলেই এমন কিছু করেছিলেন কি যা মোটেই ভব্যতাসুলভ নয়?

বার কয়েক সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখার্জি বললেন, ঠিক তাই। সেদিন হোটেলের সুনাম যে কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল, তা একমাত্র আমিই জানি। আমি কল্পনাও করতে পারি নি, ভদ্রলোক আবার সিলভার অ্যারোর দরজা অতিক্রম করে ভিতরে আসবেন। আপনার সময় আর নষ্ট করতে চাই না। ভালো কথা, বয় কি রাত্রের খাবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

না, আমরা ডাইনিং রুমে আসব।

চিন্তিত সুকুমার ওপরে চলে গেল।

সুকুমার ওপরে চলে যাবার পর দিলীপ মুখার্জি গৌড়কে আহ্বান করলেন। রাজেন্দ্র গৌড়, তাঁর সহকারী। চটপটে ছোকরা। মুখার্জি তাকে লক্ষ্ণৌ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কাজের ছেলে। বিশ্বাসীও! তাকে কাউন্টারে থাকতে বলে মুখার্জি হোটেল থেকে বেরুলেন।

ভদ্রলোক বিশেষ লম্বা নয়, আবার তাঁকে বেঁটেও বলা চলে না। মাঝামাঝি। স্মার্ট। গায়ের রঙ কালো। রঙ কালো হলেও মুখশ্রী ভালো। চোখে উগ্র আধুনিক প্যাটার্নের চশমা।

হোটেলের বাইরে এসে, অলেস্টারের কলার ভালো করে তুলে নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন। এপ্রিল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাণ্ডার বহর দেখে কে বলবে

ভারতের অন্যান্য প্রান্তে এখন বিরক্তিকর গরম চলছে। খানেক গজ এগোবার পর একটা বাড়ির সামনে থামলেন দিলীপ মুখার্জি।

ইংল্যাণ্ডের কাউন্ট্রিতে যে ধরনের বাড়ি তৈরি হয়, এই বাড়িখানার চেহারা হুবহু সেরকম। অনেকখানি জমি ঘিরে বাউণ্ডারি-ওয়াল। গেটের পাশে পাথরের ফলকের ওপর লেখা রয়েছে 'আড্ডাবাড়ি হাউস'।

নাম পড়ে অনেকের মনে স্বাভাবিক ভাবে উদয় হতে পারে, পথিকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করার জন্য গৃহকর্তা এই নাম রেখেছেন! কিম্বা এখানে ক্লাব আছে—রসিক সভ্যরা ক্লাবের নামকরণ করেছেন 'আড্ডাবাড়ি হাউস'। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা নয়।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিহারের পূর্ণিয়া শহরে থাকেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে তাঁর অনেক জমিজমা আছে, আর আছে বিঘা তিরিশেক বিস্তৃত এক আমবাগান। ওই অঞ্চলের লোক ওই আমবাগানকে আড্ডাবাড়ি নামে উল্লেখ করে থাকে।

জানা যায় না প্রথমে কে বীরেন বিশ্বাসের নাম 'কুমারবাহাদুর অব আড্ডাবাড়ি' দিয়েছিল। তবে একথা নিশ্চিত, কেউ একজন এই নামকরণ করেছিল। এই উপাধিতে খুশি হয়েছিলেন বীরেন; মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, লোকে যেন তাঁর নামের সঙ্গে ওই উপাধিটা যুক্ত করে উচ্চারণ করে। মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, সকলে এখন তাঁকে আড্ডাবাড়ির কুমারবাহাদুর নামেই উল্লেখ করে।

নৈনিতালে বেড়াতে এসেছিলেন একবার কুমারবাহাদুর।

সস্তায় একটা বাড়ি বিক্রি হচ্ছে শুনে কিনে ফেললেন। 'আড্ডাবাড়ি হাউস' লিখিয়ে পাথরের ফলক গেটের সঙ্গে যুক্ত করা হল। প্রতি বছরই এসে মাস দুয়েক থেকে যাচ্ছেন। তিনি বিবাহিত ও সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও কাউকে সঙ্গে করে এখানে আনেন না—আসেন সম্পূর্ণ একা।

দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে বছর তিনেক আগে হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল আড্ডাবাড়ির কুমারবাহাদুরের। তিনি তারপর থেকে নৈনিতালে এলেই মুখার্জি মাঝে মাঝে যান তাঁর কাছে। গল্পগুজোব হয়; গল্পের ফাঁকে ফাঁকে কিছু লালজলও যে দুজনের পেটে না যায় তা নয়।

গেট পেরিয়ে সুরকি-ঢালা পথ মাড়িয়ে পার্লারে পৌঁছলেন দিলীপ। সেখানে কেউ নেই। কুমারবাহাদুরের সন্ধান পাওয়া গেল ড্রইংরুমে। তিনি রেডিও শুনছিলেন। ঘরের স্তিমিত আলোয় ভালো করে তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। দিলীপ মুখার্জিকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে তিনি দ্রুত খনখনে গলায় বললেন, আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম—

নব ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে বড় আলো জ্বাললেন তিনি।

তাঁকে বেঁটেই বলা চলে। গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, ভাঙা চোয়াল, দীপ্তিহীন মুখ, অসম্ভব রোগা।

গায়ে তাঁর ঢলঢলে ড্রেসিং গাউন। অত্যন্ত বেমানান দেখাচ্ছে। ডান হাতের

দু' আঙুলের ফাঁকে কটু গন্ধযুক্ত জ্বলন্ত সিগারেট। এক অপরূপ চেহারার অধিকারী কুমারবাহাদুর অব আড্ডাবাড়ি। একবার দেখলে সহজে কেউ তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

দিলীপ বসলেন একটা সোফায়।

খনখনে গলায় কুমারবাহাদুর আবার বললেন, দিন দুয়েক এলেন না তো! ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

সিজিন টাইম চলেছে, সময় হাতে খুব অল্প পাই।

আসবেন, আসবেন, সময় হাতে পেলেই চলে আসবেন। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। নৈনিতালে আপনি ছাড়া তো আমার আর কোন পরিচিত লোক নেই!

পকেট থেকে পাউচ বার করে মুখার্জি বললেন, একা আসেন কেন? স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে আর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না।

স্ত্রী!

দীর্ঘ লয়ে হাসলেন কুমারবাহাদুর।

বিরাট ড্রইংরুম যেন ঝনঝন করে উঠল। আগে দিলীপ মুখার্জির মনে হত এই শব্দে বুঝি জানলার কাঁচগুলো সব ফেটে গেল। মাথার মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

শাস্ত্রকাররা ঠিকই বলেছিলেন ম্যানেজার সাহেব, পথে নারী বিবর্জিতা! ঘরে আছে, বেশ আছে; তাকে পথে টেনে নিজের জীবনকে কেন বিড়ম্বিত করে তুলি বলুন?

কিন্তু...

কিন্তু শব্দটা তালাক দিন। আমার কথা চিন্তা করে দেখবার চেষ্টা করুন। মেয়েমানুষ আর স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। স্ত্রীকে আপনি নারী সংজ্ঞা দিতে পারেন। মেয়েমানুষ—পথে তাকে কিন্তু বিবর্জন করা চলবে না। নইলে ফুর্তির বান মনে ডাকবে কিভাবে?

কুমারবাহাদুরের কথায় দিলীপ মুখার্জি অবাক হলেন। পূর্বে তিনি এ ধরনের কথা তাঁকে বলতে শোনেন নি কখনও। তাই একটু ইতস্তত করে বললেন, চাকররা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ আছে নাকি?

আবার হাসলেন কুমারবাহাদুর। সমস্ত ঘরখানাকে চৌচির করে হাসলেন যেন। তারপর বললেন, না, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। একটা উপমা দিলাম মাত্র। বাড়িতে আমি একাই আছি। যাক ওকথা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আসুন, ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

তিনি উঠে গিয়ে হোয়াটনটের ওপর থেকে হুইস্কির বোতল ও সোডা নিয়ে এলেন। সিল করা বোতলের মুখ ভাঙতে যাবেন—

মুখার্জি বললেন, ভাঙবেন না, থাক। আমি সঙ্গে করে একটা বোতল নিয়ে এসেছি, ট্রাই করে দেখুন।

তিনি অলেস্টারের পকেট থেকে একটা বোতল বার করলেন।

ভ্যাট সিক্সটি নাইন! তোফা জিনিস। কোথা থেকে পেলেন?

আমি হোটেলের ব্যবসা করি, এ সমস্ত মাল না রাখলে কি চলে? গেলাসে ঢালা যাক, কি বলেন?

নিশ্চয়।

দুটো গেলাসে বোতল থেকে তরল নেশা ঢেলে মুখার্জি বললেন, গেলাস তুলে নিন। আমরা এবার কারুর স্বাস্থ্য পান করি।

কুমারবাহাদুর গেলাস তুলে নিলেন।

আমরা রক্তিমার স্বাস্থ্য পান করব।

রক্তিমা!!

একটি মেয়ে। এই মুহূর্তে তার স্বাস্থ্য পান করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করছি।

গেলাসে গেলাসে ঠেকালেন দুজনে। মৃদু মিষ্টি শব্দ হল। গেলাসের মধ্যে চলকে উঠল ভ্যাট সিক্সটি নাইন। দুজনে রক্তিমার স্বাস্থ্য পান করলেন।

এরপর বোতল খালি হতে সময় বেশি লাগল না।

ঢুলু ঢুলু চোখে সোফার ওপর এলিয়ে পড়লেন দুজনে। কুমারবাহাদুর অসংলগ্ন কথার বন্যা বইয়ে দিলেন। দিলীপ মুখার্জি যে কিছু অসংযত হয়ে পড়লেন না তা নয়। আরও বোতল দেড়েক হুইস্কি গলায় ঢেলে দেবার পর তিনি কিভাবে হোটেলে ফিরে এসেছিলেন, তা তাঁর জানা নেই।

মৃগাঙ্ক ঘোষ সম্পর্কে যে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন দিলীপ মুখার্জি, সেকথা সুকুমার বলে নি মধুসূদন গুপ্তকে। সে সতর্ক হয়ে আছে। দেখাই যাক না ভদ্রলোককে শেষ পর্যন্ত।

প্রতিদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যে মৃগাঙ্ক চলে আসেন সিলভার অ্যারোতে। আজ ছটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নেই!

সওয়া ছটার সময় মধুসূদন গুপ্ত বললেন, কি ব্যাপার হে কুট্টু? ঘোষ মশাইয়ের তো দেখা নেই!

তাই তো দেখছি, ভদ্রলোক বোধ হয় আজ আর এলেন না।

তিনি তো এলেন না—এদিকে যে আমাদের বিকেলটা মাটি হয়ে গেল। এখন কোথাও বেরোন কি ঠিক হবে?

বাইরে যাওয়া অবশ্য ঠিক হবে না। চলুন, পার্লারে গিয়ে বসি। পার্লারে গিয়ে বসতে হল না, মৃগাঙ্ক ঘোষ ঘরে প্রবেশ করলেন। আজ এত দেরি করে ফেললেন?

মৃগাঙ্ক চেয়ারে বসে বললেন, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ঠিক সময়, পথে দেরি হয়ে গেল।

এক টিপ নস্যি নিয়ে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, পথে দেরি হয়ে গেল অর্থে কোথাও আটকে পড়েছিলেন?

বীভৎস এক দৃশ্য দেখতে গিয়ে দেরি করলাম বলতে পারেন।

দুজনেই হতবাক।

বীভৎস দৃশ্য!

বীভৎস না বলে তাকে হৃদয়বিদারক বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। ফারদৌখি হোটেলটা দেখেছেন তো? এখান থেকে আধ মাইলটাক দূরে হবে বোধ হয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফারদৌখির পাশ দিয়েই আমি আসছিলাম। লক্ষ্য করলাম, হোটেলের মধ্যে প্রচুর সোরগোল চলেছে। ছুটোছুটিও কম হচ্ছে না। তাছাড়া গেটের গোড়ায় পুলিশ-ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি? কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আরও বহুলোক দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রমে শুনলাম, একটি মেয়ে নাকি খুন হয়ে গেছে। কে তাকে খুন করেছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সুকুমার বলল, বলেন কি!

শুনুন, তারপর কি হল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুলিশ স্ট্রেচারে করে মৃতদেহ বয়ে এনে গাড়িতে রাখল। গাড়িতে তোলবার সময় পরিষ্কার দেখতে পেলাম। বয়স খুব বেশি নয়। গায়ের রঙ ফরসা। দেখতে-শুনতে বোধ হয় ভালোই ছিল, এখন বোঝবার উপায় নেই। ভারি কোন কিছু দিয়ে মুখ একেবারে থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে। চটচটে রক্ত তখনও গড়িয়ে পড়ছে। কে যে মেয়েটিকে এইভাবে মারল ভগবান জানেন।

মধুসূদন গুপ্ত বললেন, মেয়েদের তো খুন হবার কথা নয়, খুন হবে পুরুষ মানুষ—এই তো নিয়ম!

মৃগাঙ্ক সিগারেট ধরালেন. ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এ আমার একটা থিওরি। সকলকে আমার থিওরি মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমার দৃঢ় ধারণা হল, মেয়েরা রক্তপাত ঘটাবার জন্যই পৃথিবীতে আসে।

আপনি তো দুর্বোধ্য হয়ে উঠলেন মশাই।

দুর্বোধ্য কোথায়! উদাহরণ দিয়ে বলছি। ইতিহাসকে খুঁটিয়ে দেখুন, বিখ্যাত যুদ্ধগুলোর আরম্ভ হওয়ার মূলে কোন নারীর হাত আছে, বা কোন নারীকে উপলক্ষ্য করেই যুদ্ধ। এখনও হয়তো ওই একই ব্যাপার। কোন মেয়ের প্ররোচনায় কোন পুরুষ এই মেয়েটিকে খুন করেছে।

সুকুমার এইভাবে মধুসূদন গুপ্তকে কথা বলতে কোনদিন দেখে নি, অবাক হয়ে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে বিস্মিত গলায় বলল, আপনি যা বললেন, তাতে হয়তো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে আমার ধারণা হচ্ছে, মেয়েদের প্রতি আপনি যেন বিদ্বেষভাব পোষণ করেন।

মধুসূদন গুপ্ত মৃদু হাসলেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, যত অন্যায় কাজ করুক না কেন, তবু মেয়েদের নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হোক, এতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।

ওদের সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত দুর্বল মনে হচ্ছে মিস্টার ঘোষ।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই। দেখুন মিস্টার গুপ্ত, সতীসাধ্বী ইত্যাদি বিকারগুলোকে

আমি মোটেই আমল দিই না। আমি ওদের অত্যন্ত লোভনীয় খাদ্যবস্তু বলে মনে করি। সুতরাং ওই লোভনীয় খাদ্যবস্তু অযথা নষ্ট হোক, তা আমি পছন্দ করি না। মিস্টার রায়, আপনার অভিমত কি?

আমার...মানে..., সুকুমার ইতস্তত করতে লাগল।

ইতস্তত করছেন কেন? উই আর অল ফ্রেণ্ড হিয়ার। বলুন—বলুন? মন খুলে কথা বলুন।

দেখুন, আমি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ মিশিনি। ছেলেমানুষী মনে করবেন না, আগে মনে হত ওরা এক গেলাস পাইন-অ্যাপেলের যুস। তারিয়ে তারিয়ে গেলাস শেষ করে দিলে মন ভরে উঠবে। কিন্তু একবার বিশেষ এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর থেকেই আমার ধারণা হয়েছে, পাইন-অ্যাপেলের যুস-ভর্তি সমস্ত গেলাস উপাদেয় না হওয়াই হল বাস্তব।

অর্থাৎ আপনি কারুর প্রেমে পড়েছিলেন, এবং তাকে আকণ্ঠ পান করতে গিয়ে তেমন মিষ্টি আস্বাদন পেলেন না। মিস্টার গুপ্ত—

বলুন?

ওদের সম্পর্কে আপনার মত এত তিক্ত কেন, বুঝিয়ে বলুন না?

মধুসূদন গুপ্ত কেমন বিপন্ন বোধ করলেন, কি করবেন শুনে ও-কথা থাক মিস্টার ঘোষ।

থাকবে কেন? লজ্জা আমাদের ভূষণ নয়; বলুন, শুনি।

আপনি বরং বলুন। নিজের স্ত্রীর মধ্যে কি এমন পেলেন, যার জন্য সমস্ত জাতটার ওপর আপনার এমন গদগদ ভাব?

আকাশ থেকে পড়লেন মৃগাঙ্ক ঘোষ। সিগারেটের টুকরোটা অ্যাস্ট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আবার পেলেন কোথা থেকে?

সস্ত্রীক এখানে এসেছেন, এই তো শুনেছিলাম।

একটু ভুল শুনেছেন। একজন মহিলা আমার সঙ্গে আছেন বটে, তবে তিনি আমার স্ত্রী নন। ফুলে ফুলে মধু খেয়েই তো বেড়াচ্ছি, বিয়ে করবার সময় পেলাম কোথায়।

মধুসূদন ও সুকুমার দুজনেই হতভম্ব।

আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

তা হয়েছি বৈকি। মধুসূদন বললেন, তার মানে ওই মহিলাটি...

স্বাভাবিক গলায় মৃগাঙ্ক বললেন, সেকেলে ভাষায় রক্ষিতা বলতে পারেন। ইনি বছর খানেক ধরে আছেন আমার কাছে। মন ভরে গেলেই বিদায় দেব। আবার একটি সংগ্রহ করে নিতে হবে।

সুকুমার বলল, বলেন কি মিস্টার ঘোষ?

জটিল কিছু তো বলি নি! আমার বৈশিষ্ট্য বললাম। বুঝতে পারছি, আমার সম্পর্কে আপনাদের মনোভাবে কয়েক ধাপ নেমে গেল। কি করব বলুন, নিজের চরিত্রকে ঢাকতে গিয়ে মিথ্যে কথা তো বলতে পারি না।

আপনার জীবনে তাহলে অসংখ্য মেয়ে এসেছে?

অসংখ্য। জাতিধর্মনির্বিশেষে। আপনার ভাষায় বলি, তাদের আমি পাইন-অ্যাপেলের যুসের মত তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছি। অবশ্য এই ব্যাপারে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে।

মধুসূদন বললেন, রুচির প্রকারভেদ আছেই। আপনার যা ভালো লাগবে, আমার যে তা ভালো লাগতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবু বলব, আপনার বৈচিত্রপূর্ণ-জীবন অনেকের কাছে লোভনীয় হবে। আপনি কিন্তু এক কাজ করলে ভালো করতেন।

কি কাজ?

জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে, অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করলে লোকে উপভোগ্য কাহিনী পড়বার সুযোগ পেত। আপনিও নাম-করা সাহিত্যিক হয়ে যেতেন।

সাজিয়ে-গুছিয়ে লেখা সোজা কথা নাকি? ও-সব আমার আসে না মশাই, তবে গুছিয়ে বলতে পারি।

উৎসাহের সঙ্গে সুকুমার বলল, বেশ তো, তাই বলুন শুনি।

আবার সিগারেট ধরালেন মৃগাঙ্ক ঘোষ।

আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাদের দুজনের অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনতে চাই।

আমার অভিজ্ঞতা...আমি তো আপনার কাছে শিশু।

আমি ভুলিনি মিস্টার রায়, পাইন-অ্যাপেলের যুসের সমস্ত গেলাস আপনার সুস্বাদু মনে হয়নি—সে অভিজ্ঞতার কথা সহজেই বলতে পারেন। মিস্টার গুপ্ত শোনান, আমার অনুমান করে নেওয়া তাঁর জীবনের কোন হত্যাকারী নারীর কথা, তারপর আমি নিজের কথা বলব।

সুকুমার না-না করেও রাজি হয়ে গেল। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, মিস্টার গুপ্ত সম্মত হবেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি কোন আপত্তির কথা তুললেন না, এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন—যেন বলতে পারার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত।

তিনজনে ঘনীভূত হয়ে বসলেন। এক বিচিত্র আসর আরম্ভ হবে এবার।

স্থির হল সুকুমার প্রথমে বলবে। তারপর বলবেন মধুসূদন গুপ্ত। সবশেষে মৃগাঙ্ক।

নিজের গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সুকুমার আরম্ভ করল।...

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কুট্টুর রেজাল্ট ভালোই হয়েছিল, বি-এ'তে কিন্তু আশানুরূপ ফল হল না। পাশ-কোর্সে কোন রকমে বেড়া ডিঙিয়ে গেল বলা চলে। বাড়ির সকলে চেয়েছিলেন, অনার্স নিয়ে সে বি-এ পাশ করুক, তারপর মাস্টার ডিগ্রীটা করায়ত্ব করে নিক।

কুট্টু বাড়ির লোকেদের ইচ্ছায় বাদ সাধল। কোন বকমে গ্র্যাজুয়েট হবার পর সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক আর রাখল না। সকলকে জানিয়ে দিল, পড়াশুনা অনেক হল, আর নয়। এবার সে চাকরির সন্ধান করবে। চুপচাপ বসে থেকে স্রেফ দাদাদের অন্ন ধ্বংস করে যাওয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক, এটুকু হৃদয়ঙ্গম করবার বয়স তার হয়েছে।

চাকরি চাইলেই পাওয়া যায় না—বিশেষ করে আজকের এই শোচনীয় চাকরি-সমস্যার যুগে। এখানে-ওখানে আবেদন করল, কেউ ডাকল, কেউ ডাকল না। যারা ডাকল, সেখানে ইন্টারভিউ সুবিধার হল না—সুতরাং চাকরি হল না।

অনেকে পরামর্শ দিলেন, এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে লাভ নেই, তুমি জামালপুর ওয়ার্কসপে চেষ্টা করো। মাঝে মাঝেই প্রার্থীর আবেদন হয়, চিন্তার কোন কারণ নেই। কুট্টু বিষয়টি অনুধাবন করে দেখল, মন্দ কি, দাদারা সকলে ওখানে কাজ করেন, সেও না হয় করবে।

মাস খানেক পরে সুযোগ এল। কয়েকটি পদের জন্য বেশ কিছু কর্মীর প্রয়োজন বেলকর্তৃপক্ষের। অনেকের সঙ্গে কুট্টুও আবেদন করল। ডাক এল যথা সময়ে। ডাক পাওয়ার পরই তার মন নিশ্চিন্তভাবে ভরে গেল। কেমন মনে হতে লাগল চাকরি হয়ে যাবে।

উৎফুল্ল মনেই অনেক দিন পরে কুট্টু গঙ্গার ধারে বিকেলে বেড়াতে গেল। সূর্য তখনও ডোবেনি, তবে ডুবতে বিশেষ বিলম্ব নেই। সুদৃশ্য লোহার বেড়ায় ঘেরা উঁচু কষ্টহারিণী ঘাটের পাড়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে চমৎকার লাগে। কলেজ জীবনে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কুট্টু এখানে নিয়মিত এসেছে। বসে থেকেছে কয়েক ঘণ্টা—সিগারেট ফুঁকেছে।

বলতে বাধা নেই, মুঙ্গেরের বেশির ভাগ ছেলের সিগারেটে হাতে খড়ি হয় এখানে। বয়স্ক লোকের আনাগোনা কম—হয়তো বয়স্করা ছোকরাদের কাছ থেকে নিজেদের মান বাঁচানোর জন্যই এখানে আসেন না, সুতরাং বেপরোয়াভাবে ধোঁয়ার কারিকুরি করতে বাধা নেই।

সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরকাশিম স্বপ্নেও নিশ্চয় ভাবতে পারেন নি, গঙ্গার দিক থেকে আগত শত্রুকে বাধা দেবার তাঁর এই বিশেষ ঘাঁটি একদিন তরলমতি তরুণদের খেয়ালখুশির জায়গা হয়ে উঠবে।

একটা বেঞ্চের ওপর বসে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কুট্টু দেখছিল, টকটকে লাল সূর্য যেন গঙ্গার জল স্পর্শ করেছে। এবার অথৈ জলে তলিয়ে যাবে। বাস্তবে এরকম ঘটে না। তবু এরকম মনে হয় কেন? সূর্য তলিয়ে চলেছে—একমনে দেখছে কুট্টু।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল। খুব কাছেই কারা যেন বাংলায় কথা বলল।

মুখ তুলে দেখল, হাত কয়েক দূরে একদল দাঁড়িয়ে। দলে মেয়ের সংখ্যাই বেশি। পুরুষ মাত্র দুজন। অপরিচিত। হয় এরা বাইরে থেকে মুঙ্গেরে এসেছে কারুর বাড়িতে বেড়াতে, কিম্বা জামালপুরে। কুট্টু দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আবার অস্তগামী

সূর্যকে দেখতে লাগল।

কিহে সুকুমার, তুমি এখানে বসে?

আবার চমকাবার পালা।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, অনন্তবাবু। অনন্ত মুখার্জি—ওদের পারিবারিক বন্ধু। সজ্জন প্রকৃতির। জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করেন—থাকেন ওখানকার ইস্ট কলোনীব কুইন্স রোডে।

তিনি বললেন, চুপ করে বসে আছো এখানে?

উঠে দাঁড়িয়ে কুট্টু বলল, কিছু করবার নেই, বসে বসে স্রেফ সময় কাটাচ্ছি। আপনি নিশ্চয় বেড়াতে এসেছেন?

মেয়ে-পুরুষের দলটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে অনন্ত বললেন, এঁরা সব এসেছেন কলকাতা থেকে। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোক। মুঙ্গের ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি সকলকে।

এঁদের মধ্যে বৌদিকে তো দেখছি না?

ও আসে নি। কলিক-পেন চাগাড় দেওয়ায় বাড়িতে রয়ে গেল।

অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে অন্যান্যরা হাঁ করে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কলকাতার লোক তাঁরা। ফ্রেমে-আঁটা ভাগীরথীকে দেখতে অভ্যস্ত, এখানকার গঙ্গার বিস্তৃতরূপ স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের হতবাক করে দিয়েছে।

এক সময় অনন্তবাবু বললেন, ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে, আমাব একটা সমস্যার সমাধান তুমি নিশ্চয় করতে পারবে।

বলুন?

রেবু এবার ক্লাশ সেভেনে উঠল। পড়ার চাপ তার বেড়েছে স্বীকার করতেই হবে। অথচ ভালো একজন প্রাইভেট টিউটার পাচ্ছি না। তুমি একটু ওকে দেখিয়ে দাও না।

অবাক হয়ে কুট্টু বলল, আমি...।

অবাক হচ্ছ কেন! তোমার হাতে সময় রয়েছে। রেবু তোমাকে চেনে, তোমাব কাছে পড়তে আপত্তি করবে না।

সমস্ত মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি কিভাবে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন, আমি একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারব?

অনন্তবাবু মৃদু হেসে বললেন, আজকালকার ছেলেদের আরগুমেন্টের ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। আমি তোমাকে উপযুক্ত লোক বিবেচনা করেই অনুরোধ করছি।

বেশ, পড়িয়ে দেব রেবুকে। কোন্ সময় যেতে হবে বলুন?

বিকেলের ট্রেনে এস। পড়িয়ে বাসে ফিরে যেতে পারবে।

মুঙ্গের থেকে জামালপুরের দূরত্ব ন' কিলোমিটার।

আরেকটা কথা, টিউশন ফি তোমাকে প্রতি মাসে নিতে হবে।

এ-কথা বলবেন না অনন্তদা, রেবু আমার ভাইঝি, টিউশন ফি নিয়ে তাকে

পড়াতে যাব কেন?

নেবে না কি রকম? বেকার বসে আছো, পয়সা-কড়ির তো দরকার হয় হে? বড় ভাইয়ের কাছ থেকে না হয় সামান্য কিছু হাত খরচ নিলে।

কুট্টু আর কিছু বলতে পারে না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অনন্ত আবার বললেন, তাহলে কথা পাকা হয়ে গেল। আজ ছাব্বিশ তারিখ, মাস পুরে গেলেই তুমি রেবুকে পড়াতে আসবে।

নির্দিষ্ট দিনে বিকেলের ট্রেনে কুট্টু জামালপুরে গেল। ব্রীজ পার হয়ে কুইন্স রোডে পৌঁছতে তার মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগল না। অনন্ত মুখার্জির কোয়ার্টারের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবে, লক্ষ্য করল, বছর আঠারো-উনিশের একটি মেয়ে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে কোন পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছে।

কেউ হবে।

কুট্টু তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে, মেয়েটি মুখ তুলে বলল, শুনুন।

সে মুখ ফেরাল।

ওঁরা কেউ বাড়িতে নেই।

নেই! ওঁরা তো জানতেন, আমি আজ আসব।

মেয়েটি থেমে থেমে বলল, জানতেন। কেন্ট রোডে সকলে গেছেন বিশেষ প্রয়োজনে। বলে গেছেন, আপনি এলে যেন অপেক্ষা করেন।

কুট্টু কিছু না বলে আরেকখানা চেয়ারে বসল। ভাবতে লাগল মেয়েটি কে হতে পারে। অনন্তদার পরিবারের কেউ হলে নিশ্চয় অপরিচিতা বলে মনে হত না, পাশের কোয়ার্টারের বোধ হয়।

মেয়েটি আবার পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছে। কুট্টু আড়চোখে তার দিকে তাকাল। বেশ দেখতে বললে কিছু বলা হবে না, অপূর্ব দেখতে। চার বছর কো-এডুকেশন কলেজে পড়েছে। প্রচুর মেয়ে ছিল ক্লাশে। কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে দেখল, এক পলকের জন্য হলেও সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, এ-রকম একটিও ছিল না।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। কুট্টুর মন উতলা হয়ে উঠল। তার অবাধ্য চোখ ব্যগ্র হয়ে উঠল আরেকবার অদূরবর্তিনীকে দেখবার জন্য। অসীম বলে নিজেকে সংযত করল সে, তাকিয়ে রইল অন্যধারে।

আপনি মুঙ্গেরে থাকেন বুঝি?

অবিশ্বাস্যভাবে ওধার থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

কুট্টু মুখ ফিরিয়ে দেখল, মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ।

আপনাকে দেখেছি যেন সেদিন।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

কোন্ দিন বলুন তো?

আমরা আপনাদের কষ্টহারিণীর ঘাট দেখতে গিয়েছিলাম, আপনি সে-সময় তো ওখানে বসেছিলেন।

সেদিন এ-মেয়েটিও ছিল নাকি। নিশ্চয় ছিল, নইলে তার কথা বলছে কিভাবে। আশ্চর্য, সে কিন্তু ওকে দেখতে পায় নি।

হ্যাঁ; আমি ছিলাম। কেমন লাগল মুঙ্গের?

ভালো। গঙ্গার তুলনা হয় না। কলকাতায় এ-রকম জোয়ার-ভাঁটাহীন গঙ্গা থাকলে আমি প্রত্যহ সাঁতরাতাম।

কুট্টু একটু হাসল।

খুব ভালো সাঁতার না জানলে আমাদের গঙ্গায় সাঁতার কাটা রিস্কি। একটু ঢালু অবস্থায় বইছে। তাছাড়া, পাহাড়ের খোঁচাও আছে এখানে-ওখানে। আমাদের শহরে বেশির ভাগ লোকই সাঁতার জানে না, আমিও না।

মেয়েটি আর কিছু বলল না, পত্রিকার পাতায় মন দিল।

কুট্টু ভাবতে লাগল, এ-রকম সপ্রতিভ মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য ঘনিষ্ঠভাবে সে ক'টা মেয়েকেই বা দেখেছে। চুপচাপ কেটে গেল মিনিট পনেরো আরো। কি বিচিত্র পরিস্থিতি, একটি সুন্দরী অপরিচিত মেয়ে তিন হাত দূরে বসে আছে—পড়ছে। আর সে অপেক্ষা করছে আরেকজনের জন্য।

ধৈর্য পরীক্ষা শেষ হল, রেবুকে নিয়ে সস্ত্রীক অনন্তবাবু ফিরে এলেন। লজ্জিত গলায় বললেন, সরি সুকুমার, না গিয়ে উপায় ছিল না।

কোথায় গিয়েছিলেন?

আমার এক কলিগ সপে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বসেছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বেশিক্ষণ বোধ হয় তোমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি।

আধ ঘণ্টাটাক এসেছি। বৌদি, আপনার খবর বলুন?

মৃদু হেসে বৌদি বললেন, নতুন খবর তো কিছু নেই ভাই, পুরানোর জেব টেনে চলেছি। কলিক-পেনই আমাকে শেষ করে দিল।

আপনার রোগ সারানো এখানকার ডাক্তারের কর্ম নয়। অনন্তদা বৌদিকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে নিয়ে যান।

আমিও তাই স্থির করেছি; সামনের শীতে নিয়ে যাব। ভালো কথা,—অনন্তবাবু মেয়েটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন, একে বোধ হয় চিনতে পারো নি?

কুট্টু মাথা নাড়ল।

ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বড় মিষ্টি—শ্যালিকা হে। কলকাতা থেকে অনেকে বেড়াতে এসেছিলেন—গঙ্গার ঘাটে দেখেছ তো? রত্না এসেছিল ওদের সঙ্গে। আমি মাস কয়েকের জন্য ওকে এখানে আটকে রাখলাম।

কুট্টু প্রসঙ্গান্তরে গেল, আমি ভাবছি, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করে দেব।

বেশ তো।

রেবু, চলো, তোমার পড়ার জায়গায় যাই।

রেবুর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারা যাচ্ছিল, পড়ার টেবিলের কাছে এখন যাবার ইচ্ছে তার নেই। অবশ্য কোন ওজোর-আপত্তি না তুলেই সে পড়তে গেল।

দিন কেটে চলেছে। নিয়মিতভাবে রেবুকে পড়াতে আসে কুট্টু। রত্নার সঙ্গে মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা হয়। অনন্তবাবুর মুখে শুনেছে, রত্না তাঁর মামাতো শালী। বেথুনে পড়েছিল বছর খানেক, পড়ায় মন না বসায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন মাঝে মাঝে সখ করে থিয়েটার করে। এ-কথা শোনার পর কুট্টু বুঝতে পেরেছে, রত্না কেন এত সপ্রতিভ।

ইতিমধ্যে সে ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছে।

একদিন অনন্তবাবু সকলকে নিয়ে ভীমবাঁধ গেলেন। ওখানকার লেক ও চারধারের দৃশ্য অনবদ্য। কুট্টুকেও যেতে হয়েছিল। এই প্রথমবার নয়, এই নিয়ে বার চারেক হল।

অনন্তবাবু রেলের একটা ভ্যান সংগ্রহ করেছিলেন, পথে কোন কষ্ট হয়নি। সমস্ত দুপুর কেটেছিল ওখানে চমৎকারভাবে। একলা পায়ে পায়ে রত্না একসময় এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা।

কি খেয়াল হল, কুট্টু তাকে অনুসরণ করে বলল, একলা ওধারে যাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে রত্না বলল, কেন বলুন তো?

দেখছেন তো, জঙ্গল কি রকম দুর্ভেদ্য? হয়তো ওখানে অনেক বিপদ অপেক্ষা করে রয়েছে।

বাঘ আছে নাকি?

বাঘ তো আছেই। বাঘের চেয়েও হিংস্র জীব ওখানে থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বাঘের চেয়েও হিংস্র! বলেন কি? সেই জন্তুর নাম নিশ্চয় জানেন?

জানি; মানুষ।

শব্দ তুলে হাসল রত্না।

বেশ বললেন যা হোক, মানুষ কখনো বাঘের চেয়ে হিংস্র হতে পারে?

পারে বৈকি। বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু আপনার মত সুশ্রী মেয়ের পক্ষে কোন হিংস্র মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রত্না আর এগুলো না।

সে-রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না?

রক্ষা করতে পারব কিনা বলতে পারি না, তবে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব, এটা ঠিক।

আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।

আপনিই বা কম কিসে?

দুজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

কেমন লাগছে ভীমবাঁধ?

চমৎকার। শুধু ভীমবাঁধ কেন, আপনাদের মুঙ্গের জামালপুর দুই আমার ভালো লেগেছে।

কুট্টু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ভালো লাগার জের আপনার মনে বেশিদিন থাকবে না। কলকাতায় ফিরে যাবেন—নিজের গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে পড়লে এই সমস্ত কথা মন থেকে মুছে যাবে।

আপনার ধারণা ভুল, সহজে আমি কোন কথা ভুলি না।

আর কোন কথা হল না। দুজনে ফিরে এলো আর সকলের কাছে।

বুধবার দিনটা আর সকলের কাছে কেমন কুট্টু জানে না, তবে তার জীবনে এই দিনটি অনেক শুভ সংবাদ বয়ে এনেছে। ইন্টারভিউ পাবার সংবাদ এসেছিল বুধবারে, আবার চাকরি পাবারও সংবাদ এলো ওই দিনটিতে।

যাক, এতদিন পরে কুট্টুর বেকার জীবনের ওপর যবনিকা পড়ল।

এখন সে চাকুরে। প্রতিদিন দাদাদের সঙ্গে আট ঘণ্টা করে কাজ করবে সপে গিয়ে। রেলে চড়তে আর পয়সা লাগবে না। ধানুষকোটি থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে টিকিট না কাটিয়ে। অনেক দিনের একটা ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।

কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে চলে যেতে পারবে নৈনিতাল।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ একটু তাড়াতাড়ি কুট্টু জামালপুর গেল। শুভ সংবাদটা অনন্তদাকে না জানানো পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিল না। তাঁর কোয়ার্টারে পৌঁছে সে রত্না ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলো না।

রত্না হাসি মুখে বলল, রেবুদের স্কুলে আজ প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। দিদি ও জামাইবাবু গেছেন ওখানে।

ও। আপনি গেলেন না?

স্কুলের ফাংশন দেখার অভিজ্ঞতা আমার আছে—কোন ব্যবস্থা থাকে না, ভিড়ের ঠেলা খেতে হয় শুধু। ও সমস্ত আমার ভালো লাগে না।

এখানে গেলে হয়তো নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, লক্ষ্য করতেন হয়তো সুব্যবস্থা চূড়ান্ত। ওঁরা কখন ফিরবেন?

আটটা বেজে যাবে।

মৃদু হেসে কুট্টু বলল, ছাত্রী অনুপস্থিত, সুতরাং আমারও কোন প্রয়োজন নেই এখানে। চলি।

রত্না কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, যাবেন...

যাই, এখানে তো আর কিছু করার রইল না।

অন্যত্র বিশেষ কোন কাজ না থাকলে বসুন না, একলা থাকতে কেমন ভয় ভয় করছে।

ভয়! ভয় কেন? এখানে তো কোন হিংস্র জন্তু নেই?

হিংস্র মানুষ থাকতে পারে তো!

কুট্টু একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, কি হয়েছে বলুন তো?

রত্না বসেই ছিল। আঁচলটা আলতো ভবে মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, দিদিকে বলেছিলাম, দিদি এ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

তার আগে আমায় বলতে আপনার আপত্তি আছে?

রত্না ইতস্তত করে বলল, পাশের কোয়ার্টারের একটা ছেলে আমাকে ভীষণ বিরক্ত করছে! আমার ভয় হয় একলা বাড়িতে থাকলে সে না এসে পড়ে! এখানকার সমস্ত আনন্দ সে আমার নষ্ট করে দিয়েছে।

সেকি...!

কুট্টু উঠে দাঁড়াল।

কোথায় চললেন?

ছেলেটার নাম জানেন? ডান দিক না বাঁ দিক, কোন্ দিকের কোয়ার্টারে সে থাকে?

আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বসুন।

উত্তেজিত হবো না! কি বলছেন? সমাজের এই সমস্ত দুষ্ট গ্রহদের শিক্ষা না দিলে নিজেদের অপরাধী করে তোলা হয়।

রত্না কেমন বিপন্না হয়ে পড়ল।

বসুন সুকুমারবাবু। তাকে হঠাৎ কিছু বলতে গেলে কেলেঙ্কারি বাঁধবে, আমার জন্যে দিদি-জামাইবাবু খুব অসুবিধায় পড়ে যাবেন।

সুকুমার বসে পড়ল।

কিন্তু একটা কিছু করতে তো হবে?

ভেবেচিন্তে করবেন।

কুট্টুর মন হঠাৎ রসসিক্ত হয়ে উঠল। সে কি কোন দিন কল্পনা করেছিল, কোন তরুণী তার কাছ থেকে একদিন এইভাবে সাহায্য চাইবে? এবং তার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে পড়বে? অচেনা দুষ্কৃতিকারীর কাছে ছুটে যেতে চাইবে? সে চিন্তা করে দেখেনি, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটি যদি তাকে প্রশ্ন করে বসত, ভদ্রমহিলা আপনার কে? কোন্ অধিকারে আপনি এই ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন? তখন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উত্তর কি তার কাছে আছে? অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি বোধ হয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই, বহু রাত আজকাল সে বিনিদ্র থাকছে। এমন একটি মুহূর্ত কি তার হাতে এসেছে, যখন রত্নাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে? ও-পক্ষের মনোভাব কি তা জেনে নিতে দোষ কি?

রত্নার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে কুট্টু বলল, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার জন্য ব্যস্ততা বোধ করছি।

বলুন?

আমাকে আপনার ভয় করে না?

আপনাকে! কেন?

আমি পুরুষ, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটিও পুরুষ—

অবাক দৃষ্টিতে রত্না কুট্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ও আপনি ছাড়া বাড়িতে উপস্থিত আর কেউ নেই—

আপনি কি বলতে চাইছেন সুকুমারবাবু?

দুর্বোধ্য কিছু বলতে চাই নি। আমার প্রশ্ন হল, পাশের কোয়ার্টারের ছেলেটির মত আমিও যে এই নিরিবিলি মুহূর্তে আপনাকে উত্যক্ত করে তুলতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনে জাগছে না কেন?

আপনি...আপনি দিদি-জামাইবাবুর পরিচিত লোক। আমার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। কোন সম্মানহানিকর কাজ আপনি করতে পারেন না।

আপনি জানেন না, পরিচিত লোকরাই অন্যায় সুযোগ বেশি নেয়।

না...মানে...

রত্না আর কিছু বলতে পারল না। অসহায়ভাবে বসে রইল চুপচাপ।

নীরবতার মধ্যে দিয়ে মিনিট পাঁচেক বোধ হয় কাটল।

কুট্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাব প্রশ্ন আপনাকে বিপন্ন করে তুলেছে বুঝতে পেরেছি। আমার সম্পর্কে কিছু সন্দেহও হয়তো মনে দানা বাঁধছে। কাজেই এখানে আর অপেক্ষা করা শোভন হবে না। চলি। ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন, বিপদের আশঙ্কা থাকবে না।

কুট্টু বারান্দা থেকে বাগানের সিঁড়িতে পা দিল।

শুনুন...

অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত শোনাল। ঘুরে দাঁড়াল কুট্টু।

আপনি আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন, অবিশ্বাস আপনাকে আমি করিনি।

কেন?

এ কেনর উত্তর নেই সুকুমারবাবু।

কুট্টুর ঠোঁটের আগায় দুষ্টুমিষ্টি হাসি—আছে; আপনি বলতে চাইছেন না।

বিব্রত রত্নাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আর বিব্রত হতে হল না, আটটার সময় আসবার কথা থাকলেও সস্ত্রীক অনন্তবাবু রেবুকে নিয়ে অনেক আগেই ফিরে এলেন। রত্না যেন বেঁচে গেল।

কুট্টু হতাশ হল কিঞ্চিৎ।

রেবু এগিয়ে এসে বলল, এখন আমি কিন্তু আর পড়ব না সুকুমারকাকা।

তার কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল।

সুকুমার নিশ্চিত হয়ে গেছে রত্নার মনোভাব সম্পর্কে। তবু সে মনের কথা পরিষ্কারভাবে শুনতে চায় এবং তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ততই ভালো। কিন্তু এরপর দিন পনেরোর মধ্যে রত্নাকে একা পেল না সে। গেছে নিয়মিত। রেবুকে পড়িয়েছে, অনন্তবাবু বা বৌদির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেছে, তারপর রওনা দিয়েছে বাস ধরার উদ্দেশ্যে।

রত্নার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা হয়েছে, কথা হয়নি। কি বিরক্তিকর পরিস্থিতি। কুট্টু মরিয়া হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতির আওতা থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়, একান্ত প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় রত্নার সঙ্গে। সুযোগ—যে-কোন উপায়ে সুযোগ সংগ্রহ তাকে করতে হবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় অভাবনীয়ভাবে সুযোগ এসে গেল—একেই বোধ হয় সুবর্ণ সুযোগ বলে। অনন্তদা অফিসের কাজে কলকাতা গিয়েছে, পড়াতে গিয়ে একথা শুনল কুট্টু। বৌদিকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে সে খুশি হত। তবে এরপর যা ঘটল তাতে আনন্দে উপচে পড়া ছাড়া কুট্টুর আর অন্য কোন পথ রইল না।

তাকে দেখে বৌদি বললেন, তোমার কথা ভাবছিলাম ভাই, মুঙ্গের রোডে আমাকে একবার পৌঁছে দিতে হবে।

কুট্টু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, মুঙ্গের রোডে কেন?

আমাদের মহিলা সমিতির অফিস যে ওখানে। আজ মিটিং আছে। তুমি পৌঁছে দাও, ফিরে আসবার সময় আর সকলের সঙ্গে চলে আসব।

আশার আলোয় তার মন আলোকিত হয়ে উঠল।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব মা। রেবু আব্দার ধরে বসল।

না; ছোট মেয়েদের সেখানে যেতে নেই, তুমি এখন পড়বে। আমাকে পৌঁছে দিয়েই তোমার সুকুমারকাকা ফিরে এসে তোমাকে পড়াবেন।

বৌদি তৈরি ছিলেন, বেরিয়ে পড়লেন কুট্টুর সঙ্গে। নত্রদাম একাডেমির কাছে রিক্সা পাওয়া গেল। এরপর মহিলা সমিতিতে পৌঁছতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না। বৌদিকে নামিয়ে ওই রিক্সাতেই কুট্টু কুইন্স রোডে ফিরে এল। রেবু বইখাতা সরিয়ে তখন একটা প্লাইউডের বোর্ডের ওপর জলছবি তুলছিল। সুকুমারকাকাকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠল।

পড়া ছেড়ে তুমি এসব কি করছ?

রেবু সঙ্কুচিত হয়ে রইল।

কুট্টু চেয়ারে বসে বলল, পড়ায় তোমার মন নেই, সব সময় ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছ আমি লক্ষ্য করছি।

খাতা টেনে নিয়ে গোটা ছয়েক অঙ্ক দিয়ে বলল, এগুলো করো, নির্ভুল না হলে ভীষণ বকুনি খাবে। আমি পাশের ঘরে আছি, হয়ে গেলেই আমাকে ডাকবে।

কুট্টু পাশের ঘরে গেল।

রত্না জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে বলল, পড়ানো হয়ে গেল?

না; টাস্ক দিয়ে এলাম। একটু থেমে বলল, রেবুকে টাস্ক দিয়ে এ-ঘরে চলে এলাম, কেন বলুন তো?

আপনি বলুন।

এ-ঘরে এলাম সেদিনের অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করে নিতে।

রত্না কিছু বলল না। আবার জানলার দিকে তাকাল।

চুপ করে থাকবেন না, আপনার উত্তরের ওপর আমার বিরাট এক সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।

মুখ না ফিরিয়ে রত্না বলল, সমস্যা! আমি কি আপনাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছি?

আমার মনের অবস্থার সঠিক ছবি কাউকে দেখানো সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, গত কয়েক রাতে আমার চোখে ঘুম আসেনি। অবিরাম চিন্তা করেছি। কেন ঘুম আসেনি, কি চিন্তা করেছি—জানি, অনুমান করে নিতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না। আমি শুধু জানতে চাই, আমার শোচনীয় মনের অবস্থা আপনার হৃদয় স্পর্শ করেছে কিনা?

আমি...

থামবেন না, বলুন?

ফিরে না দাঁড়িয়েই রত্না বলল, আমি কি বলব?

কুট্টু এগিয়ে গেল। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এত কথা বলে যাচ্ছি, আর আপনি সামান্য একটা—

আপনি অবুঝের মত যদি শুধু প্রশ্ন করে যান, সে অপরাধ কি আমার?

কুট্টুর মনে হিল্লোল জাগল। সত্যি তো, সমস্ত কথা যে মুখ ফুটে বলতে হবে, তার কি অর্থ আছে। সম্মতি না থাকলে সে কি এত কথা বলতে পারতো? তার আগে কি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাকে থামিয়ে দেওয়া হত না?

সংযমের বাঁধকে আর বেঁধে বাখা গেল না। উচ্ছ্বসিত গলায় কুট্টু বলল, রত্না...

সুকুমারকাকা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না, এসে বুঝিয়ে দিয়ে যাও না।

স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল যেন, রেবুর আহ্বানে ছত্রখান হয়ে গেল সমস্ত। বিরক্ত মনে পাশের ঘরের দিকে এগোল কুট্টু। কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পাহাড়ের কাছের গল্‌ফ মাঠে কতকগুলো আম গাছ আছে, কাল সকাল সাড়ে আটটার সময় আমি ওখানে অপেক্ষা করব।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুট্টু।

রাত্রে কুট্টু হাল্কা মনেই বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিল। অনেক কথা ভেবেছিল। ভাবতে ভালো লাগছিল তার। একটি মেয়ের মনে দাগ কেটে যাওয়া সহজ কথা নয়। ইচ্ছে করছিল, নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দেয়। তবে—

তবে একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। সঙ্কোচকে জয় করে রত্না কি আসবে তার কথামত? হয়তো আসবে না। কুট্টু অবশ্য নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট

স্থানে গিয়ে উপস্থিত হবে, দেখবে শেষ পর্যন্ত কি হয়। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসেছিল প্রায় মাঝরাতে।

বিস্তৃত গলফ মাঠ। এখানে-ওখানে জমি উঁচু করে অবস্ট্রাক্সন সৃষ্টি করা হয়েছে খেলার নিয়মানুসারে। ওই মাঠের মধ্যেই গোটা কুড়িক আমগাছ আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কবে এবং কে এই গাছ পুঁতেছিল এখন বলা কঠিন।

গাছগুলির হাত দশেক দূর দিয়ে পিচ-ঢালা রাস্তাটা গেছে। রাস্তা টপকে আর সমতল জমি পাওয়া যায় না। দু' ফুট, আড়াই ফুটের পাহাড় মাথা উঁচিয়ে আছে। এগুলির বিরাট আকার নিতে কম করে এক লক্ষ বছর লাগবে। তবে তিল তিল করে প্রতিদিন যে নিজেদের উচ্চতা বাড়িয়ে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই।

শিশু-পর্বতমালার আওতা পার হলেই পাওয়া যাবে ঝিল। বেশ চওড়া আকারে, এঁকেবেঁকে চলে গেছে দৃষ্টি সীমার বাইরে। ঝিল সৃষ্টি হয়েছে জলপ্রপাতের জলে। সারা বছর ধরে অবশ্য পাহাড় গড়িয়ে জল পড়ে না, পড়ে দু-আড়াই মাস ধরে।

ঝিলের একপাশে সুউচ্চ পাহাড়। তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়। মনে হয়, বিন্ধ্যাচল রেঞ্জের এই বিরাট শাখা চরম গাম্ভীর্য নিয়ে তাকিয়ে আছে দূর-দূরান্তের দিকে।

কুট্টু সওয়া আটটার সময় আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। এই পাহাড়ে এসেছে অজস্রবার পিকনিক করতে। কয়েকজন বন্ধু মিলে খেয়াল-খুশি মত চলে গেছে মাইল পনেরো-কুড়ি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে। একবার তো পথ হারিয়ে গিয়ে প্রাণ প্রায় যেতে বসেছিল। জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর অভাব নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত দিক ঠিক করতে পেরে ফিরে আসতে পেরেছিল।

সাড়ে আটটা বেজে গেল; রত্নার দেখা নেই। ন'টা পর্যন্ত এখানে কুট্টু অপেক্ষা করবে, ফিরে যাবে তারপর। ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না, পৌনে ন'টার সময় দেখা গেল নির্জন রাস্তা দিয়ে মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে রত্না। অবিশ্বাস্য হলেও দৃশ্যটি বাস্তব। হর্ষোৎফুল্ল মনে কুট্টু তাকিয়ে রইল।

রত্না এগিয়ে এল, কাছে—অনেক কাছে। তবে আমতলায় এল না—দাঁড়াল এসে রাস্তার ওপর, তার সামনা-সামনি। ওর মুখে সঙ্কোচ আর দুঃসাহসের ভাব যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে।

কুট্টু এগিয়ে গেল, আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি আসবে না।

রত্না কিছু বলল না।

এস, আমরা ওধারে গিয়ে বসি।

দুজনে এগিয়ে গেল। ভাবী পাহাড়ের চত্বর পিছনে ফেলে দুজনে শালগাছের তলায়, ঝিলের ধারে গিয়ে বসল।

রত্না—

রত্না মুখ তুলল।

তুমি যে আমার পাশে এসে বসেছ, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে আসতে হয়েছে।

একবারও কি মনে হয়নি, গিয়ে কাজ নেই।

ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে রত্না বলল, মনে হয়েছিল।

ছোট একটা ঢিল ঝিলের জলে ফেলল, কুট্টু, তবু তবু এলে যে?

আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন—

শুধু এই কারণে এলে? আমার তো বিশ্বাস হয় না, আমি আসব বলেই এসেছ। কে জানে, হয়তো আসবার জন্য ব্যস্ততাও বোধ করেছ।

আজকের যুগে এত স্পষ্ট কথা বলবেন না।

রত্না—

উঁ—

আপনির বেড়া টপকে তুমিতে এসে পড় না।

রত্না জলের দিকে তাকিয়ে বলল, একদিনে এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

কুট্টু হাসল। ভালো নয় বলছ বটে, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

না—না—

আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি যে।

এত আত্মবিশ্বাস!

আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষ ভিখারী থেকে রাজা হয়ে গেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তাছাড়া পরশুরামের সেই গল্পটার কথা ভুলে গেলে? তিনি বলেছেন, মেয়েদের না বলার অর্থই হল হ্যাঁ বলা।

তা হবে।

এত ছোট্ট করে উত্তর দিলে হবে না, তুমি আমার মত অনেক কথা বলো রত্না।

রত্নাও একটা ঢিল জলে ফেলল। ছোট থেকে বড়, তারপর আরো বড় হতে লাগল জলের চক্র।

আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমাকে এখানে আসতে বলবেন, ভাবতে পারিনি।

তোমার সাহস দেখেও আমি কম অবাক হচ্ছি না। আমার সমস্ত পরিচয় তোমার হয়তো এখনও জানা নেই, অথচ এক ডাকেই তো চলে এলে।

রত্না কথার মোড় ঘোরাল, এখানে কেউ এসে পড়তে পারে।

আসবেই তো; ক্ষতি কি?

পরিচিত কেউ এসে পড়লে ভীষণ লজ্জার বিষয় হবে।

পরিচিতরা এখন কেউ এখানে আসবে না।

আসবে না! আপনি জানলেন কিভাবে?

ওয়ার্কসপ চলছে। সকলে কাজে গেছে। কেউ সর্বজ্ঞ নয়, কাজেই আমরা কি করছি না করছি দেখবার জন্য অফিস কামাই করে এখানে আসবার মাথাব্যথা

কারো নেই।

রত্না হাসল, কিছু বলল না।

দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ।

শেষে—

আমি এবার উঠি।

বিস্মিত গলায় কুট্টু বলল, এই তো এলে, এখুনি উঠবে কি?

এতটা পথ আবার যেতে হবে। দেরী করলে, দিদি সন্দেহ করতে পারেন।

আবার কবে এখানে দেখা হবে বলো?

আগামী সপ্তাহে।

না, কাল।

না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়।

আমি কিন্তু কাল তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

রত্না উঠে পড়ল। ঢালু পথ ধরে এগিয়ে চলল পিচঢালা রাস্তার দিকে।

আসছ তো?

মুখ ফিরিয়ে একবার কুট্টুকে দেখে নিয়ে আবার চলতে চলতে বলল, এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

বাড়াবাড়ি ভালো নয় বললেও পরের দিন ঠিক সময়েই রত্না এল। এবং তার পরের দিনও। দিন এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদ্যতাও গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে কুট্টু কাজে যোগ দিয়েছে। কাজে যোগ দেবার পর আর দুজনের সাক্ষাত পাহাড়ের ধারে সকালে হয় না। অনেক মাথা খাটিয়ে সকলের চোখ বাঁচিয়ে দেখা-সাক্ষাত করে মনের কথা আদান-প্রদান করতে হয়।

তিন মাস কেটে গেল এইভাবে।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে সেই চির নতুন জায়গায় আজ আবার দুজনের সাক্ষাত হল। রত্না আগেই এসেছিল, কুট্টু এল অফিস থেকে সরাসরি। দুজনে বসল শালগাছের তলায় জল-ঘেঁষে।

কুট্টু রত্নার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

আজ যে কত কায়দা করে এখানে আসতে হয়েছে কি বলব।

কেন?

অফিস থেকে বেরুচ্ছি, এক বন্ধু ধরে বসল বাজারে যেতে হবে। তার বোনের বিয়ে—কি সমস্ত কেনাকাটা করতে হবে। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে আসতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে আমার একদিন দেখা হবে না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

মাসের পর মাস আমাকে না দেখে থাকবে কিভাবে?

মাসের পর মাস! তার মানে?

আমি চলে যাচ্ছি!

মনের মধ্যে কুট্টু প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

কবে?

দিন ছয়েকের মধ্যে।

না, তোমার যাওয়া চলবে না।

তুমি তো চলবে না বলেই খালাস। আমি তো চিরদিন এখানে থাকতে আসি নি। বাড়ির লোকেরা আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন, এবার তাঁরা আমায় নিয়ে যাবেন।

কিন্তু...

কিন্তু কি, বলো?

কিন্তু আমাদের এই মেলামেশা, এই অন্তরঙ্গতা—এর কোন মূল্য হবে না? তোমাকে তো চলে যেতে দিতে পারি না রত্না! একটা পরিণতি চাই, শুভ পরিণতি।

আমায় কি করতে বলো?

তুমি নিশ্চয় চাইবে, বাকি জীবন আমরা দুজন একই সঙ্গে থাকব? আমাদের বিয়েতে তোমার নিজের লোক, কি অন্য কেউ আপত্তি করবেন?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা তারা করবেন না।

আমি আজই বাড়িতে কথা পাড়ব। চাকরি পাবার পর থেকেই মা পাত্রী খুঁজছেন, বিয়েতে তিনি নিশ্চয়ই মত দেবেন। এরপর আর একটা বিষয় বাকী রইল।

আবার কোন্ বিষয়?

মৃদু হেসে কুট্টু বলল, তোমার মত। তোমার মত না পেলে তো এক ইঞ্চি এগুবার উপায় নেই। বলো না, আমাকে কি তোমার খুব অপছন্দ?

মাথা নত করল রত্না। একটু হেসে বলল, ভীষণ।

উৎফুল্ল কুট্টু ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

মায়ের মত পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না। অবশ্য সরাসরি কথা তাঁর কাছে পাড়তে তার সঙ্কোচ হয়েছে, বৌদির সাহায্যে কার্যোদ্ধার করতে হল। এখন দ্বিতীয় কাজ হল, অনন্তদার স্ত্রীকে কথাটা প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া। যাতে তিনি সমস্ত কিছু পাকা করে ফেলতে পারেন।

আজ অফিস ছিল না, ঈদের ছুটি। পাঁচটার ট্রেনে কুট্টু জামালপুর গেল। অসম্ভব আনন্দ তাকে উতলা করে রেখেছে। কি শুভক্ষণে সেদিন গিয়েছিল কষ্টহারিণী-ঘাটে বেড়াতে, না গেলে অনন্তদার সঙ্গে দেখা হত না। রেবুকে পড়াবার কথা বলতে পারতেন না। রেবুকে পড়াতে না এলে রত্নার সঙ্গে দেখা হত না।

স্টেশনের বাইরে এসে ছোট ব্রীজটা অতিক্রম করে কুইন্স রোডের পথ ধরল

কুট্টু। বরফ ফ্যাক্টরী পেরিয়ে কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় জন চারেক ছেলে তার পথ রোধ করল। বাইশ থেকে আঠাশের মধ্যে বয়স তাদের। কলার খাড়া করা, ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার পরা অতি আধুনিক তরুণের দল। একজনের চেহারা আবার পালোয়ানদের মত।

একজন বলল, কি মশাই, কি ভেবেছেন আপনি?

বিস্মিত কুট্টু বলল, আমায় বলছেন?

এখানে আর কেউ আছে নাকি? আপনি এত ঘনঘন কুইন্স রোডে কেন আসেন বলতে পারেন?

টিউশানি করি।

সকলে টেনে টেনে হাসল।

আরেকজন বলল, ও তো লোক দেখানি। আসলে কি করতে যান, জানি আমরা।

মুঙ্গের থেকে এখানে এসে প্রেম করা হচ্ছে।

কাঁপা গলায় কুট্টু বলল, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনারা কেন ইন্টারফেয়ার করছেন বুঝতে পারছি না।

ঘটে বুদ্ধি থাকলে বুঝতে কষ্ট হত না।

পথ ছাড়ুন, রাস্তার মাঝে এইভাবে কাউকে আটকানো ভদ্রতা নয়।

একজন চড়া গলায় বলল, বলে কি!...রামুদা, তোমার উপস্থিতিতে আমাদের ভদ্রতা শেখাচ্ছে!

রামুদা, অর্থাৎ পালোয়ান চেহারার লোকটি এবার নিজের বাজখাঁই গলা ছাড়ল। সে আর সকলের চেয়ে বয়সে বড়। বলল, ওহে ছোকরা, বেশি কোপচিও না। ওই তো চেহারা, এক রদ্দায় ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

কুট্টুর অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে উঠল। রদ্দা না খেয়েই সে বুঝতে পারছিল, রামুদার রদ্দা তার পক্ষে বিশেষ সুখকর হবে না।

সে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমার অপরাধটা কি, আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝতে ঠিকই পারছ, ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করছ শুধু। রামুদা বললেন, এ-পথ তোমার আর মাড়ানো চলবে না। যদি আমার কথা অমান্য করো, মোরব্বা বানিয়ে ছেড়ে দেব। এমন কাউকে দেখতে পাবে না যে তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে।

কিন্তু...

স্যাট-আপ! মুখের ওপর চোপা আমি পছন্দ করি না। যা বললাম, অক্ষরে অক্ষরে তা মনে রাখবে।

রামুদা দলবল নিয়ে অগ্রসর হলেন।

অপমানে জর্জরিত কুট্টু দাঁড়িয়ে রইল, তার ওপর যেন মধ্যযুগীয় অত্যাচার হয়ে গেল। এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সাধ্য এই মুহূর্তে তার নেই, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করবে না, যে কোন উপায়ে প্রতিশোধ নেবেই।

রামুদার দল তখন ব্রীজের ওপর উঠে পড়েছে। কুট্টু এগোতে যাবে, এমন সময় অমিয় এসে উপস্থিত হল। অমিয় সান্যাল—চার বছরের কলেজ-জীবন কেটেছে দুজনের পাশাপাশি বসে। কুট্টুর আগেই ওয়ার্ক-সপে চাকরি পেয়েছিল। সাইকেল থেকে নেমে সে বলল, ওরা তোমাকে গায়ে হাত দেয়নি তো?

না।

আমি দূর থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। খুব বেঁচে গেছো, রামুদা সাঙঘাতিক লোক।

হোক সাঙঘাতিক! তোমাদের রামুদাকে ভয় করে আমি চলব না, তুমি দেখে নিও।

দেখ সুকুমার, অবিবেচকের মত কিছু করে বস না। আমি জানতাম না, তলায় তলায় এত ঘোরাল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলছো। জানতে পেরেছি আজ সকালে। আগে জানলে, নিশ্চয় তোমাকে সাবধান করে দিতাম।

একজন মহিলার সম্মান যে বিপন্ন হয়েছে, সে-সম্পর্কে ওদের সচেতন করে দিচ্ছ না কেন?

তুমি কার কথা বলছ?

কেন, রত্নার।

একটু ইতস্তত করে অমিয় বলল, কিছু মনে করো না ভাই, মহিলা বলতে যা বোঝায়,সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে তোমার রত্নাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাই সাবধান করতে চাইলাম।

তার মানে?

যা হবার হয়ে গেছে, এখনও সাবধান হও।

তুমি কি বলতে চাইছ?

মেয়েটি ভালো নয়।

কুট্টু প্রায় চিৎকার করে উঠল, কি আজেবাজে কথা বলছ! রত্না আমাকে ভালবাসে, আমি তাকে বিয়ে করতে চলেছি!

মহাবিস্ময়ে অমিয় বলল, বিয়ে করতে চলেছ! আমি তোমাকে বুদ্ধিমান বলে মনে করতাম। আমার ধারণা হয়েছিল, মধু চুষে নিয়ে আর ফুলের দিকে তাকাবে না। বিয়ে করার পাগলামি মাথায় চাপবে, ভাবতে পারিনি।

অমিয়...

আমাকে চোখ রাঙাতে পারো—আর সকলে তোমার নির্বুদ্ধিতায় হাসবে।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে আমি নাচার। অনন্তবাবুর ওখানে যাচ্ছ বোধ হয়? যাও। তবে যাবার আগে আমার একটা কথা শুনে রাখো, এই জামালপুরে তোমার মত আরও অনেককে তোমার রত্না নাচাচ্ছে। যারা তোমাকে ধমকে গেল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গ-সুখ পেয়ে থাকে।

কুট্টু অমিয়র পথ রোধ করল, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

আমার লাভ?

তুমি জেলাস। রত্নাকে আমি ট্যাক্‌ল করতে পেরেছি, তোমার তা সহ্য হচ্ছে না।

অমিয় জোরে হেসে উঠল।—তুমি পাগল হয়ে গেছ—কলকাতার একটা সোকল্ড মেয়ে তোমাকে বদ্ধ উন্মাদ করে ছেড়েছে। শোন সুকুমার, রত্নাকে আমি চিনি তোমার সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে থেকে। হাজরা রোডে ওদের বাড়ি, আমার মামার বাড়ির পাশেই। ওর অনেক কেচ্ছা-কাহিনী আমার জানা আছে। এমন কি যাব জন্য জামালপুরে এসে থাকা, সেই অ্যাবরশান কেসটির কথাও।

অ্যাবরশান।—কুট্টু আকাশ থেকে পড়ল।

যে মেয়ে এদিক-ওদিক থিয়েটার করে বেড়ায়, রাতে-বেরাতে বাড়িব বাইরে থাকে, তার যদি দু-একটা অ্যাবরশান হয়, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তুমি বলতে চাও, সমস্ত জেনে-শুনেও অনন্তদা—

তিনি ভালমানুষ, এত সাত-পাঁচের সংবাদ রাখেন না। ওর বাপ-মা তারই সুযোগ নিয়েছে। এদিকে মেয়ে এখানে এসেও নাচিয়ে বেড়াচ্ছে একগাদা ছেলেকে।

প্রায় পাঁচ-মিনিট কোন কথা বলল না কুট্টু। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, তুমি নিজের কথা প্রমাণ করতে পারবে?

কোন্ কথা?

রত্নার সম্পর্কে যা বললে?

অন্তত এটুকু প্রমাণ করে দেব, জামালপুরের আরো ছেলেব সঙ্গে সে দহরম-মহরম করছে।

বেশ। কবে...?

কাল পরশুর মধ্যে অফিসে তোমায় জানিয়ে দেব।

কুট্টু আর দাঁড়াল না, অমিয়কে পাশ কাটিয়ে অনন্তদার কোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হল। তার মন সন্দেহের দোলায় প্রচণ্ডভাবে দুলছে। রত্নার আন্তরিকতায় এতখানি খাদ আছে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। অথচ অমিয় বলছে—তার মিথ্যে কথা বলে লাভ কি?

তবু শুধু কথায় রত্নাকে অবিশ্বাস করবে না সে, চাক্ষুস প্রমাণ তার চাই। অনন্তদা কোয়ার্টারে ছিলেন না; রত্না বসেছিল ড্রইংরুমে। বৌদি রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কুট্টু রেবুকে নিয়ে পড়াতে বসল। আজকাল অবশ্য নিয়মিত পড়াতে পারে না। আধ ঘণ্টাটাক পরে ওকে টাস্ক দিয়ে কুট্টু ড্রইংরুমে এল।

মিষ্টি করে হাসল রত্না।

স্বাভাবিক গলায় কুট্টু বলল, বাড়িতে বলেছিলাম।

তাই নাকি! কি বললেন?

ভায়া বৌদি কথাটা মাকে পৌঁছাতে হয়েছিল। তাঁর অমত নেই। এবার অনন্তদার কানে কথাটা তুলে দিতে চাই।

এখন থাক; ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাব। আমি চলে যাই, তারপর বলো।

বিয়ের পর আমরা বেরিয়ে পড়ব—বিদেশী কায়দায় হানিমুন আর কি। কোথায় যাওয়া যাবে বল তো?

পুরী!

কুট্টু আপত্তি তুলল, পুরী! না, না, পুরী নয়। আমরা নৈনিতাল যাব। ওখানে আমাদের চমৎকারভাবে দিন কাটবে।

রত্না একটু হেসে বলল, আপাতত তুমি পাশের ঘরে যাও, দিদি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন।

কুট্টু দ্বিরুক্তি না করে রেবুর কাছে ফিরে গেল।

পরের দিন দুজনের সাক্ষাৎ হল যথা-নিয়মে শালগাছ তলায়। অনেক কথা হল। ভবিষ্যতের অনেক রঙ্গীন স্বপ্নকে ওরা নেড়েচেড়ে দেখবার চেষ্টা করল। এক সময় কুট্টু বলল, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা হল, এবার বর্তমান নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

রত্না হাসতে হাসতে বলল, বেশ তো, আরম্ভ করে দাও।

অমিয় তোমার সম্পর্কে একটা কথা বলছিল।

আমার সম্পর্কে! অমিয় কে?

আমার বন্ধু। ও বলছিল, তুমি নাকি আমাকে রঙ-বাক্সের মধ্যে পুরে রেখেছ। জামালপুরে আরো অনেকের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা হয়েছে।

মিথ্যে কথা! রত্নার মুখ লাল হয়ে উঠল। ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তোমার বন্ধু তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। ছি, ছি, ছি, তুমি তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে প্রশ্ন করছ!

আমাকে ভুল বুঝো না রত্না, তার কথা বিশ্বাস করলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করতাম না।

মনের মধ্যে কিছু সন্দেহ আছে বলেই তুমি প্রশ্ন করেছ।

না, না, তা নয়; কোন রকম মনে সন্দেহ না রেখেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম। যাক ও-কথা, সহজেই আমরা আবার পুরনো আলোচনায় ফিরে যেতে পারি।

রত্না গম্ভীর মুখে বসে রইল।

এই, রাগ করলে?

আমি শুধু ভাবছি, তুমি আমাকে ওই প্রশ্ন করলে কিভাবে!

কুট্টু নরম গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো রত্না। ক্ষমা না করলে, আমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না। বলো ক্ষমা করলে?

মৃদু হেসে রত্না বলল, ভীষণ ছেলেমানুষ তুমি।

পরের দিন দুটোর সময় অফিস থেকে কুট্টু সরে পড়ল। অমিয় বলেছে, হাতে হাতে প্রমাণ যদি চাও, এই সময় তোমাকে রওনা দিতে হবে। আমি সংবাদ পেয়েছি, এই সময় তোমার রত্না ওয়াটার ওয়ার্কসের পিছন দিকের নির্জন

জায়গায় অভিসারে গিয়ে থাকে। সুতরাং কুট্টু রওনা দিয়েছে।

হাসপাতালের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা ধনুকের মত বেঁকে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরেই কুট্টু এগুলো। কিছুদূর থেকে ওয়াটার ওয়ার্কসের রেলিংঘেরা রাস্তা আরম্ভ হয়েছে। গেট দিয়ে না ঢুকে ভেঙে যাওয়া রেলিঙের মধ্যে দিয়ে সে শর্টকাট করল।

এগিয়ে যেতে যেতে কুট্টুর বারংবার মনে হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সে যেন কিছুই দেখতে না পায়, মিথ্যা প্রমাণিত হয় অমিয়র কথা। ওয়াটার ওয়ার্কসের পিছনে পৌঁছে গেল মিনিট কয়েকের মধ্যে। জায়গাটিকে পিকনিক প্যারাডাইস বলা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে এখানে দল বেঁধে অসংখ্য মেয়ে-পুরুষকে পিকনিক করতে দেখা যায়।

কুট্টু একটা খাড়া পাথরের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সতর্কভাবে তাকাতে লাগল এধার-ওধার। যা দেখতে চায় না, সেই দৃশ্য চোখে ধরা পড়তে বিশেষ বিলম্ব হল না।

অবাক বিস্ময়ে কুট্টু দেখল, ঝিলের যে অংশ মোড় খেয়ে এইদিকে চলেছে, তারই ধারে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে রত্না আরেকজনের সঙ্গে। কোন শব্দ ভেসে আসছে না, অত্যন্ত মৃদু গলায় কথাবার্তা হচ্ছে বোধ হয়।

কুট্টুর মাথার মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অমিয় তাহলে মিথ্যা কথা বলেনি! অথচ কি চমৎকার অভিনয় সেদিন রত্না কবল। কি প্রয়োজন ছিল তার? আন্তরিকতাই যদি না হবে, তবে দিনের পর দিন ওকে কে বলেছিল অভিনয় করে যেতে?

দৃঢ় পায়ে কুট্টু এগিয়ে গেল। দুজনের খেয়াল নেই—আত্মবিস্মৃত দুই নারী-পুরুষ। ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে কুট্টু গম্ভীর গলায় বলল, চমৎকার!

চমকে দুজনে মুখ ফেরাল। কুট্টুকে দেখে রত্নার মুখ সাদা হয়ে গেল। ঘাম দেখা দিল কপালে। ওর সঙ্গী-ছেলেটিকে—সেদিন যারা রামুদার সঙ্গে ছিল, তাদের মধ্যে একজন বলে মনে হল। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। রত্নাও।

তুমি এই সময় আমায় এখানে আশা করোনি। ঘাবড়ে গেলে নাকি?

রত্না নিজেকে সামলে নিয়েছে; গম্ভীর গলায় বলল, ঘাবড়ে যাইনি।

জানি, তুমি ঘাবড়াবে না। তোমার মত মেয়ে এত সহজে ঘাবড়াবে না।

রত্নার সঙ্গীটি কোন কথা না বলে দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করল।

তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে কুট্টু বলল, তোমাকে একলা ফেলে চলে গেল যে! চেপে ধর, একজন বডি-গার্ড না থাকলে অসহায় বোধ করতে পারো।

বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই, যা বলতে চাও তাড়াতাড়ি বলো।

সময়ের অভাব তো বটেই। আরেকজন কোথাও অপেক্ষা করছে বুঝি?

সুকুমার...

চোখ রাঙিও না; তোমার কথায় অনেক উঠেছি-বসেছি, অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার, আর নয়—। চোখ রাঙানোর অভিনয় দেখে, ভয়ে আর ইঁদুরের গর্তে

গিয়ে লুকোব না।

রত্না অগ্রসর হল।

পথ রোধ করল কুট্টু। যাচ্ছ কোথায়? আমার মনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছো—আর গোটাকতক কথা না শুনেই চলে যাবে!

কি বলবার আছে তোমার?

কি বলবার নেই? কেন সতীপনা দেখাচ্ছিলে আমায়, দিনের পর দিন? তোমার মনোভাব যখন এইরকম, একজনকে নিয়ে যখন সন্তুষ্ট থাকতে পারো না—সেকথা আমায় জানিয়ে দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত কি?

রত্না তির্যক দৃষ্টিতে সুকুমারকে লেহন করে নিল যেন। ভ্রূ-ভঙ্গি করে বলল, তুমি এত বোকা আমি জানব কিভাবে? আমার মত কলকাতার মেয়ে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ-বন্ধু সংগ্রহ করতে পারেনি, একথা তুমি ধারণা করেছিলে কেন?

ধারণা করেছিলাম, তোমার সতীপনা দেখে! তুমি কেন আমার কাছে দিনের পর দিন অভিনয় করেছিলে? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি?

ক্ষতি! তুমি আমার কি ক্ষতি করবে? সে সাধ্য তোমার কোথায়? এটা আমার হবি। তোমার মত বোকা ছেলেদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আমি আনন্দ পাই, বুঝলে? পথ ছাড়ো।

না।

না, মানে?

পথ ছাড়বো না! এই বোকা ছেলেটির কাছে এখন তোমায় কিছু শিক্ষা নিতে হবে।

আমি তোমার কেনা বাঁদী নাকি যে, পান থেকে চুন খসলেই শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছ?

তুমি আমার আন্তরিকতাকে ছুরি দিয়ে কেটে খান খান করে ফেলেছ রত্না—এখন ইচ্ছে করছে, তোমাকে কেটে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলি।

তীক্ষ্ণ গলায় রত্না বলল, চমৎকার! কলকাতায় যাও না, ঐতিহাসিক নাটকে তোমার অভিনয় মন্দ জমবে না। কিন্তু আমার সহ্যের সীমা আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পাগলামি দেখতে ভাল লাগে না।

ও কুট্টুকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

কুট্টু ওকে বাধা দিতে পারত, এক ঝটকায় ঝিলের জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারত; জল থেকে যাতে উঠে আসতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হত না—কিন্তু সে কিছুই করল না।

আত্ম-ধিক্কারে মরে যেতে ইচ্ছে করল তার, এই মেয়েকে চেয়েছিল বিয়ে করতে! ঈশ্বর আছেন, তিনি রক্ষা করেছেন।

কুট্টু ফিরে চলল। রত্না বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলে যে ওকে ধরা না যায়, তা নয়। কুট্টু আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মন্থর

পায়ে এগিয়ে চলল। ঠিক এই সময় আচম্বিতে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

দলবল নিয়ে রামুদা ভুঁইফোড়ের মত উপস্থিত হলেন। ঘনিষ্ঠ ভাবে যে ছেলেটি রত্নার সঙ্গে বসেছিল, সেই বোধ হয় সংবাদ দিয়েছে গিয়ে। কুটু কিছু বলবার অবকাশ পেল না, প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর প্রচণ্ডভাবে পড়তে লাগল ঘুষি চড় আর লাথি তার ওপর। অসহ্য যন্ত্রণায় তার জ্ঞান স্তিমিত হয়ে এল।

জ্ঞান হল হাসপাতালের বেডে।

কিভাবে সে ওখানে গিয়ে পড়েছিল কেউ বলতে পারল না। তবে এইটুকু জানা গেল, তার রক্তাক্ত অজ্ঞান দেহ পড়েছিল হাসপাতালের গেটের সামনে।

সুকুমার নিজের কাহিনী শেষ করল।

তারপর? মৃগাঙ্ক ঘোষ প্রশ্ন করলেন।

মৃদু হেসে সুকুমার বলল, তারপর আর কি, যন্ত্রণার তাড়নে জ্বর এসেছিল। দিন কুড়িক বিছানায় পড়ে রইলাম। সকলের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বলেছিলাম, পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পা-পিছলে পড়ে গিয়ে এই বিপত্তি। অবশ্য অনেকের মনে প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল, অফিস থেকে পালিয়ে আমি পাহাড়ে কেন বেড়াতে গিয়েছিলাম।

এক টিপ নস্যি নিয়ে মধুসূদনবাবু বললেন, তোমার অভিজ্ঞতা বেশ ইন্টারেস্টিং।

তারপর থেকেই বুঝতে পেরেছি, পাইন অ্যাপেলের যুসে ভর্তি সব গেলাস মিষ্টি নাও হতে পারে। আমি আর ওধার মাড়াইনি।

মৃগাঙ্ক ঘোষ বললেন, এবার আমি উঠব, রাত অনেক হল। আমার এবং মিস্টার গুপ্তের অভিজ্ঞতার কথা কাল হবে, কিছু সময় হাতে করে আসব বরং। তিনি হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দার ঘড়িতে সশব্দে এই সময় দশটা বাজল।

পরের দিন বেলা চারটের সময় সিলভার অ্যারোতে এলেন মৃগাঙ্ক ঘোষ। ঘরেই ছিলেন দুজনে; সকাল ও দুপুর কোন কথা হয়নি মধুসূদন গুপ্ত ও সুকুমারের মধ্যে। নতুন করে পুরনো গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় সুকুমার কেমন অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থেকেছে। মধুসূদন গুপ্ত সুকুমারের কাহিনী শোনবার পর থেকে কিছু বিমনা রয়েছে।

চা-পর্ব শেষ হল।

মিস্টার ঘোষ এবার আপনি আরম্ভ করুন।—সুকুমার বলল।

আমি নয়, আমি সব শেষে বলব। মিস্টার গুপ্ত, আপনি বলুন।

মধুসূদন গুপ্ত আপত্তি করলেন না; বললেন, বেশ তো, আমিই আরম্ভ করছি। জানি না, আমি গুছিয়ে বলতে পারব কিনা। তবে আমার জীবনে যা ঘটেছে, অতি অল্প মানুষের জীবনে সেরকম মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে থাকে, একথা আগে

বলে নিতে বাধা নেই।

তিনি আরম্ভ করলেন।

ছোটবেলা থেকেই মধুসূদন পড়াশুনায় অত্যন্ত ভালো ছিল। প্রথমে কিন্তু তার এই প্রতিভার কথা কারুর জানা ছিল না। জানা গেল, যখন সে স্কুলে ভর্তি হল। কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন ভর্তি করতে।

পরিচিত প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন করলেন, ভাইপোকে কোন্ ক্লাসে দিতে চান হরিহরবাবু?

ভাবছি, ক্লাস সেভেনে দেব। পর পর দুটো বছর ...নুয়ারী মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে ওকে ভর্তি করতে পারিনি। এবার ... বর ইচ্ছায় ভালো আছে। এইটে আর দেব না, সেভেনেই ভালো।

প্রধান শিক্ষক ছোটখাটো গোবেচারা চেহারার মধু... নের দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্লাশ সেভেন কি ও পারবে? ওকে বরং ফো... য়ে দিন।

হরিহরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, ফোরে! কি... হন মশাই!

উঁচু ক্লাশে সিলেবাস শক্ত, আপনার ভাই... পক্ষে—

পরীক্ষা নিয়ে দেখুন না? সিলেবাস যে শ... কি আমি জানি না? পেরে যদি না ওঠে, নিচু ক্লাশে দেবেন।

পরীক্ষা নেওয়া হল।

গোবেচারা ছেলেটির জ্ঞান-বুদ্ধি দেখে ও...ম্ভিত হয়ে গেলেন প্রধান শিক্ষক। ওকে ক্লাশ সেভেনে ভর্তি করতে আর কোন বাধা রইল না। বলা বাহুল্য, এই স্কুল থেকেই সসম্মানে প্রথম বিভাগে ও ম্যাট্রিকের দরজা অতিক্রম করেছিল।

তারপর ধাপে ধাপে উঠে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নিজের পাঠ-জীবন শেষ করল মধু। কাকা তখন বেঁচে নেই। দীর্ঘ রোগভোগের পর দেহ রেখেছেন। কাকার মৃত্যুর পর নিজের বলতে মধুর দুনিয়ায় আর কেউ রইল না।

মুক্তপুরুষ। আর্থিক অবস্থা ভালোই—বাপ-কাকা অনেক রেখে গেছেন। বসে খেলে রাজার হালে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মধু স্থির করে ফেলেছে ওইভাবে জীবন কাটাবে না। সে জানে, আইডল ব্রেন ইজ দি ডেভিল্‌স্ ওয়ার্কসপ। সে চাকরি করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী যখন তার পৃষ্ঠপোষক, তখন চাকরির অভাব হবে না!

অনেক বাছাবাছির পর মধু অধ্যাপনার ক...জ বেছে নিল। সহকর্মীরা সকলেই পরিচিত। শ্রদ্ধেয়। এই কলেজেই সে চার বছর পড়াশুনা করেছিল। প্রথমে বাঁধোবাঁধো ঠেকতো; যাঁরা তাকে পড়ি...ছিল, তাঁদের পাশাপাশি বসতে কুণ্ঠা বোধ করত। কুণ্ঠাকে শেষ পর্যন্ত জয় ক...তে হল। জয় করতে না পারলে, কলেজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

দিন ভালোভাবেই কেটে চলেছে। এইরকম গতানুগতিকভাবে দিন কেটে যাবে,

এ-ধারণা করে নেওয়া ভুল। এই ভুল ধারণার মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল মধু। সে ভেবেছিল, এই তো জীবন! দায় নেই, দায়িত্ব নেই—প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কি চমৎকারভাবেই না কেটে যাবে!

কাটল না ওইভাবে দিন। শেষ পর্যন্ত মধুকে গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করতে হল, নিতে হল দায়, দায়িত্ব। জীবনের মোড় এইভাবে সে স্বেচ্ছায় নিতে চায় নি। তার মনোভাব একদিন এলোমেলো করে দিলেন সংস্কৃতর অধ্যাপক তর্করত্ন মশাই।

নীলকণ্ঠ তর্করত্নের অগাধ পাণ্ডিত্য সংস্কৃত সাহিত্যে। প্রায় বিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন। শুষ্ক, একহারা চেহারা। চুল ছোট করে ছাঁটা, তবে টিকিটি পুরুষ্ট। ছাত্র মহলে মিষ্টভাষী ও রসিক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে।

ছাত্র-জীবনে মধুর পাঠ্য-সূচীতে সংস্কৃত ছিল না, কাজেই তর্করত্ন মশাইয়ের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করবার সুযোগ তার হয়নি। তবে তাঁকে সে শ্রদ্ধা করত, এবং এখনও করে। এই কলেজেই মধুকে অধ্যাপকের পদ নিয়ে আসতে দেখে তিনি সবিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন।

সেদিন দুটোর পর মধুর কোন ক্লাশ ছিল না, কলেজে আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে যাওয়া মনস্থ করল। এই সময় বাড়ি ফিরলে কিছু পড়াশুনার অবকাশ পাওয়া যায়। কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দেবার পরই লক্ষ্য করল, তর্করত্ন মশাই বাসস্টপের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মধু এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনিও বাড়ি ফিরছেন স্যার?

হাসি-মুখে তর্করত্ন বললেন, হ্যাঁ। আজ আর কোন ক্লাশ নেই, এখন বাড়ি ফিরলে বেশ কিছুক্ষণ লেখা যাবে।

আপনার 'সংস্কৃত সাহিত্যের মূলকথা' শেষ হতে আর কত দেরি স্যার?

মাস ছয়েক তো আরো লাগবেই। ওহে গুপ্ত—

আজ্ঞে—

এখন তো তুমি আমার কলিগ হে। স্যাব, স্যার, করে অস্থির হও কেন বলতো?

মৃদু হেসে মধু বলল, আমার সৌভাগ্য স্যার, আমি আপনাদের ছায়ায় এখনও আছি। অতীতের সম্পর্ক থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

প্রশংসার দৃষ্টিতে মধুর দিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, আমার দুর্ভাগ্য সংস্কৃতর ছাত্র-হিসাবে আমি তোমাকে কাছে পেলাম না। বাড়ি ফিরছো নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ; আমারও ক্লাশ নেই।

দাঁড়িয়ে আছি এখানে মিনিট কুড়িকের কম হবে না, বাসের দেখা নেই।

এই রুট খুব নেগলেক্টেড। একটা ট্যাক্সি আসছে স্যার, ওটা বরং থামানো যাক।

তোমার প্রস্তাব মন্দ নয়, একই পথে যখন যেতে হবে।

ট্যাক্সি থামানো হল। মধু ও তর্করত্ন উঠে বসলেন। তিনি বললেন, বাসের জন্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত বলা ভগবানের অসাধ্য, তার ওপর ভিড়ের

সম্ভাবনা তো ছিলই। এই ভালো।

ট্যাক্সি এগিয়ে চলল। নানা রকম কথা হতে লাগল দুজনের মধ্যে। এক সময় তর্করত্ন বললেন, ওহে গুপ্ত, একটি প্রশ্ন তোমাকে করবার ইচ্ছা আমার বহু দিনের।

বলুন স্যার?

তুমি এখনও দারপরিগ্রহ করছ না কেন বলতো? আমি যতদূর জানি, তোমার আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ। অন্যান্য কোন অসুবিধাও নেই।

মধু প্রবীণ অধ্যাপকের প্রশ্নে বিব্রত হল।—আজ্ঞে...

না, না, তোমাকে বাধ্য করছি না। বলতে অসুবিধা থাকলে, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

বলতে অসুবিধা নেই স্যার; আসল কথা হল, বিয়েতে আমার রুচি নেই।

চোখ কপালে তুললেন নীলকণ্ঠ তর্করত্ন।—বল কি হে, রুচি নেই! আজকালকার ছেলেদের এই ধরনের বিকারকে প্রশ্রয় দিতে দেখছি বটে। তুমি বলতে চাও, তোমার বাপ-ঠাকুর্দা বিবাহ করে কুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে না; আমি সেকথা বলতে চাইনি স্যার। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল—

উদ্দেশ্য যাই থাক, মহৎ নয়। আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার উপদেশ শোন, বিবাহাদি করে সংসারধর্ম পালন করো।

মধু কিছু বলল না। তার মনে হতে লাগল, একান্তে এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলেই ভালো ছিল।

তর্করত্ন আবার বললেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার যৌবন। সেই যৌবন তুমি হেলায় নষ্ট করছ। পরে পরিতাপ করবে গুপ্ত।

আপনার কথাটা আমি ভেবে দেখব স্যার।

নিশ্চয় ভেবে দেখবে! আমার কথাবার্তায় তুমি ক্ষুণ্ণ হলে না তো?

না, না—

যাক, এসে পড়েছি। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও!

তর্করত্ন নেমে গেলেন। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরল মধু।

পড়াশোনায় মন বসল না। থেকে থেকে তর্করত্ন মশাইয়ের কথাগুলি মনে পড়তে লাগল। তিনি যা বলেছেন, তাকে স্নেহ করেন বলেই বলেছেন। তাছাড়া খুব মন্দ হয় না—এই যে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে, একা পড়ে আছে বাড়িতে, সঙ্গ দেবার কেউ নেই! দুটো কথা বলে মনকে হাল্কা করবার মত কেউ নেই। অসুস্থ হয়ে পড়লে আন্তরিকভাবে সেবা করবার কেউ নেই!

স্ত্রী থাকলে এতগুলো অসুবিধার মুখোমুখি কি দাঁড়াতে হত?

বিয়ে করলে ক্ষতি কি?

তর্করত্ন মশাই ঠিকই বলেছেন, হেলায় যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো যৌবনকে এই ভাবে নষ্ট করবার অধিকার তো তার নেই! অনেক রাত পর্যন্ত মধু চিন্তা করল। বলতে গেলে পরের দিনও চিন্তার মধ্যে কাটল।

তৃতীয় দিন সে স্থির করে ফেলল বিয়ে করবে।

কলেজে পৌঁছে তর্করত্ন মশাইকে বলল, স্যার আপনার কথা আমি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখলাম—বিয়ে আমার করা উচিত।

নীলকণ্ঠ তর্করত্ন খুশি হলেন।

তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে, সুখের কথা। দেখে-শুনে এবার সুলক্ষণা একটি মেয়ে ঘরে আনো!

মৃদু হেসে মধু বলল, আমি কোথায় মেয়ে দেখতে যাব? ও-কাজ আপনার। আমি শুধু বিয়ের পিঁড়িতে সময় মত উপস্থিত থাকতে চাই।

তুমি তো খুব চতুর ছোকরা, দায়িত্বপূর্ণ কাজটি আমার স্কন্ধে চাপাতে চাও! অবশ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে জীবনে পশ্চাৎপদ হইনি। সন্ধানে রইলাম।

শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল একদিন।

পাত্রীটি তর্করত্নমশাইয়ের এক ছাত্রের মেয়ে। মেয়েটি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। আহা মরি না হলেও দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। মধুর অপছন্দ হল না।

বিয়ের পর তার দিনগুলি চমৎকারভাবে কাটতে লাগল। মাঝে একবার ঘুরে এলো পুরী।

মধুর যাবার ইচ্ছে ছিল অন্য কোথাও। সুনন্দার ইচ্ছে সমুদ্র দেখার। স্ত্রীর মতে মত দিয়ে ঘুরে আসতে হল পুরী। ওখানে দিন দশেক কেটে গেল অচীন মূর্ছনার মধ্যে দিয়ে।

কবির কথা নয়, সত্যি সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে মধুর বিয়ের পর মাস আষ্টেক কেটে গেল। কলেজ থেকে সবে ফিরছে মধু, অন্যান্য দিনের মত আজ কিন্তু সুনন্দা তাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করল না, দরজা খুলে দিয়ে বসল গিয়ে হেলান দেওয়া চেয়ারে।

মধু ওর মুখের দিকে তাকাল। কেমন যেন শুকনো শুকনো লাগছে।

নন্দা, তোমার শরীর খারাপ?

অন্য ধারে মুখ ফিরিয়ে সুনন্দা বলল, না।

তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে!

না...মানে...

মধু স্ত্রীর পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে।

কি হয়েছে নন্দা? লুকিও না, আমায় বলো...

মধু দেখতে পেল সুনন্দার মুখে ক্রমেই আবিরের প্রলেপ পড়ছে।

তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু চেষ্টা করেও বলতে পারি নি। আমি...মানে...আমার...

বলো, বলো, তোমার কি?

আমরা বোধ হয়...

থেমে যাচ্ছো কেন, বলো না!

আমরা বোধ হয় আর দুজন থাকছি না—

মধু বিস্ময়ে বলল, কেন, আমবা দুজন থাকছি না কেন?

আমরা কয়েক মাস পরে তিনজন হয়ে যাচ্ছি!

অ্যাঁ...কি বললে নন্দা? আমরা...মানে.. আমাদের..

অসহ্য আনন্দে মধু সবলে জড়িয়ে ধরল সুনন্দাকে।

তুমি কিভাবে বুঝলে?

স্বামীব বুকে মুখ রেখেই সুনন্দা বলল, তোমার যেমন কথা! তিন মাস ধরে শরীরের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারব না?

মধু উঠে পড়ল, এগিয়ে চলল দরজাব দিকে।

কোথায় যাচ্ছো?

ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

ছেলেমানুষী করো না। ডাক্তারের যখন প্রযোজন হবে, আমি নিজেই তোমাকে বলব। এসো আমার কাছে।

সুনন্দার কাছে এসে বসল মধু। স্ত্রীর মুখেব দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের কি হবে বলো তো?

ছেলে।

না, মেয়ে।

মেয়ে কেন? তুমি ছেলে পছন্দ করো না?

আমার মেয়েই ভালো। ছেলেরা বাপেদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, তাদের সব ভালোবাসা মায়েদের প্রতি।

সুনন্দা হাসতে হাসতে বলল, তুমি বাপু ভীষণ স্বার্থপর!

মধুও হাসল।

পৃথিবীতে কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয। মানুষেব জীবনের আনন্দও না। তার ধারণা ছিল, হেসে-খেলে আনন্দে বুঝি-বা জীবন কেটে যাবে।

ঝড় উঠল একদিন। ঝড়ের তাণ্ডব সমস্ত কিছুকে লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল।

ঝড়ের পর ভগ্নস্তূপের ওপর যখন মধু দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন তার পাশে সুনন্দা নেই। কোনদিন এসে দাঁড়াবেও না। আচম্বিতে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছে অন্য লোকে। এরকম যে হবে ডাক্তাররাও বুঝতে পারেননি। বরং পেসেন্টের সুস্থতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে বলে তাঁদেব ধারণা হয়েছিল।

সিজারিয়ান অপারেশনের পব বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল সুনন্দা। তখন সময়োচিত অসুস্থতা ছাড়া আর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। মাসখানেক ভালোই কাটল। অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখল দুজনে।

একদিন সুনন্দা বলল, তোমার কথাই শুনলেন ঠাকুর।

কোন্ কথা?

মেয়ে হল যে!

মধু হেসে বলল, তাতে কি হয়েছে! আজকালকার মেয়ে ও ছেলের মধ্যে তফাৎটা কি বল না? তুমি না হয় তোমার মেয়েকে ছেলের মতই মানুষ করো।

হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে সুনন্দার শরীর খারাপের দিকে মোড় নিল।

ডাক্তারদের হাট বসিয়ে দিল মধু। অর্থ জলের মত ব্যয় হতে লাগল। চিকিৎসায় নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না; মধুর বুক খালি করে সুনন্দা চলে গেল। একফোঁটাও চোখের জল পড়ল না তার। শোকে পাথর হয়ে যাওয়া একেই বলে বোধ হয়। এক মাসের মেয়েকে বুকে আঁকড়ে মৃতা স্ত্রীর মুখের দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুনন্দার মৃত্যুর পর দশ দিন অতিক্রম করেছে।

নবজাতককে নিয়ে অসম্ভব অসুবিধার মধ্যে আছে মধু। প্রতিবেশী মহিলারা প্রথম কয়েকদিন বাচ্চার দেখা-শুনা করেছিলেন। নিজেদের ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম ফেলে তাঁরা আর কতদিন পরের ঝক্কি সামলাবেন।

মধুর আতান্তরে সীমা নেই। বাচ্চাকে সামলাতে পারছে না। সামলাতে পারার কথাও নয়। বাচ্চারই বা অপরাধ কি? স্বাভাবিক নিয়মে সে নিজের মাকে খুঁজবে। সে তো জানবে না, তার জন্ম, তার মায়ের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে।

বাচ্চার কান্নায় অস্থির মধুর দৃষ্টি পড়ল, ড্রেসিং টেবিলের ওপর টাঙানো সুনন্দার বিরাট পোর্ট্রেটের দিকে। সে দ্রুতপায়ে গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলল, তুমি এইভাবে আমার সর্বনাশ কেন করলে নন্দা? তোমার এই উপহারকে সামলাবার সাধ্য কি আমার আছে? আমি বেঁচেও মরে আছি। তুমি আমার শুধু সর্বনাশ করোনি, তুমি আমাকে খুন করেছ। আমার সত্ত্বা, আমার ভবিষ্যতকে নির্মমভাবে গলা টিপে মেরে রেখে গেছ!

দরজায় কে করাঘাত করল।

সুনন্দার পোর্ট্রেটের কাছ থেকে সরে এল মধু। দরজা খুলে দিল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠ তর্করত্ন। বিষণ্ণ তাঁর মুখ। তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন, মধুসূদন—

স্যার আপনি এসেছেন—

আসা আমার সেইদিনই উচিত ছিল, কিন্তু আসতে পারিনি। বারংবার মনে হয়েছে এই বিয়োগান্ত ঘটনার জন্য দায়ী আমি। আমার কথামতই তুমি..., তিনি কথা শেষ করলেন না।

আর নিজেকে সংযত করতে পারল না মধু, দশ দিনের রুদ্ধ চোখের জল অজস্র ধারায় গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। ক্ষীণ, তীক্ষ্ণ গলায় তখন নবজাতক কেঁদে চলেছে।

সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমার নেই বাবা। ঘর বাঁধবার পরামর্শ দেবার সময় বুঝতে পারিনি আমি তোমার ঘর ভেঙে দিচ্ছি।

মধু নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে বলল, আপনি সঙ্কুচিত হবেন না স্যার, এ আমার ভাগ্যের দোষ। সুনন্দাকে ধরে রাখবার চেষ্টা কম আমি করিনি—ভাগ্যের সঙ্গে পেরে উঠব কেন।

তর্করত্ন ভিতরে এলেন। অনেক কথা হল দুজনের মধ্যে।

কথায় কথায় উনি বললেন, এইভাবে চলতে থাকলে তুমি তো কোনদিন কলেজ যেতে পারবে না।

কিভাবে যাব বলুন? বাচ্চাটাকে কার কাছে রেখে যাব?

কোন মহিলা নিজের লোক তোমার নেই? তাঁকে আনিয়ে নাও। সত্যি কথা বলতে কি, তুমিও যে বাচ্চাকে সামলাতে পারছ, তা তো নয়।

দেখি...।

এক সময় তর্করত্ন মশাই বিদায় নিলেন। মধু চিন্তা করে দেখল. তিনি মন্দ কথা বলেননি। একজন আত্মীয়াকে নিজের কাছে এনে না রাখলে বাচ্চাকে বাঁচানো যাবে না, তার পক্ষেও কাজকর্মে যোগ দেওয়া সহজ হবে না।

প্রশ্ন দেখা দিল কাকে আনা যায়। নিজের সংসারের বিষয় ভ্রূক্ষেপ না করে কে তার সংসারের বোঝা হাসি-মুখে বইবে? প্রথমে চিন্তার সমুদ্রে থৈ পাওয়া গেল না, শেষে ডাঙ্গার সন্ধান পাওয়া গেল। মনে পড়ে গেল লাবণ্যদির কথা। লাবণ্যদি দূর সম্পর্কের পিসতুতো দিদি হল মধুর। বিধবা হয়েছেন বিয়ে হবার মাত্র তিন বছর পরে। এখনও তিনি চল্লিশের কোঠা পার হননি। থাকেন বিরাটিতে।

কোন ঝক্কি-ঝামেলা তাঁর নেই। পান খান আর পাড়া বেড়িয়ে সময় কাটান। কলকাতার দূরত্ব মাত্র ন'মাইল। মাঝে মাঝে আসেন এখানে। সিনেমা দেখে বিরাটিতে ফিরে যান। মধুর দৃঢ় ধারণা হল, তিনি সানন্দে এই বিপদে তাকে সাহায্য করবেন।

সংবাদ পাঠান হল।

লাবণ্যদি এলেন। আঁটসাঁট চেহারা তাঁর। গায়ের রঙ মাজা-মাজা। কাঁচা বয়সে চেহারায় চটক ছিল, এখন দেখেও বুঝতে পারা যায়। তিনি সমস্ত শুনে অমত করলেন না। বাচ্চাকে তুলে নিলেন বুকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মধু।

লাবণ্যদি বাড়িতে আসার দিন দুয়েক পর থেকেই মধু কলেজ যাওয়া আসা আরম্ভ করল। বাচ্চাও বলিষ্ঠ আশ্রয় পেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে বলা চলে। মাস কানেক কেটে গেল ক্রমে। সুনন্দার ঘা বুকের মধ্যে দগদগে থাকলেও, অনেক নিশ্চিন্ত এখন মধু।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। ইচ্ছে ছিল নিজে বাড়িতে থেকে লাবণ্যদিকে সিনেমা দেখতে পাঠাবেন। এখানে এসে অবধি তিনি ওপথ মাড়াবার সুযোগ পাননি। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। মধু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, লাবণ্যদি দরজা খুলে দিতে আসেননি। দরজা খুলে দিল একজন সুন্দরী তরুণী!

মধু কিছু না বলে এগিয়ে গেল। ভিতরের বারান্দায় লাবণ্যদির সঙ্গে সাক্ষাত হতে সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, মেয়েটি কে?

রেবা।

তোমার কেউ হয় নাকি?

আমার আবার কে হবে? শোভাবাজারে সেজমাসীর বাড়ির পাশে ওরা থাকে। খুব আলাপ আছে। বেশ মেয়ে রেবা। তারপর কৈফিয়তের সুরে তিনি বললেন,

রিলি ঘুমিয়ে পড়লে কিছু করার থাকে না, দীর্ঘ দুপুরে একা একা হাঁপিয়ে উঠি। রেবাকে বলেছিলাম। ও আসে মাঝে মাঝে। কথায় কথায় সময় কেটে যায়।

লাবণ্যদি মধুর মেয়ের নাম দিয়েছেন মবালী। ছোট করে রিলি বলে ডাকা হয়।

মধু বলল, ভালোই করেছ তো। উনি আসবেন, কথায়-বার্তায় সময় কেটে যায়—ভালোই।

সে নিজের ঘরে চলে গেল।

রেবার সঙ্গে আরো কয়েকবার দেখা হয়েছে মধুর। সেদিন লিজার থাকায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে, দেখা হয়েছে সেদিনই। কথা হয়নি। দু-একটা কথা বলার ইচ্ছে যে তার হয়নি তা নয়। তবে কেন জানি না, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কিছু বলেনি।

হঠাৎ একদিন অনিবার্য কারণে দুজনের কিছু কথাবার্তা হয়ে গেল। তিনটের কিছু পরে মধু বাড়ি ফিরেছিল। কড়া নাড়ার পর যথা নিয়মে দরজা খুলে দিল রেবা। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে কিন্তু লাবণ্যদিকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রেবার দিকে না তাকিয়ে তখন উপায় ছিল না। রিলি অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

রেবা মৃদু গলায় বলল, উনি বেরিয়েছেন।

কোথায় গেছেন?

বিরাটি থেকে কযেকজন কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন। উনি সিনেমা গেছেন। পৌনে ছ'টার মধ্যে এসে পড়বেন।

ও।

মধু নিজের ঘরে চলে গেল।

মিনিট দশেক অতিক্রম করেছে, রেবা এসে দাঁড়াল পর্দা সরিয়ে।

কিছু বলবেন?

চা খাবেন কি?

চা!

লাবণ্যদি বলে গেছেন আপনাকে চা করে দেবার কথা।

চায়ের দরকার নেই। আপনার কষ্ট হবে।

রেবা একটু হেসে বলল, এক কাপ চা করতে আমার কষ্ট হবে না।

এক কাপ কেন! আপনি খাবেন না?

এই সময় আমি চা খাই না।

এবার মধুর হাসার পালা; হেসে বলল, আমাদের দেশে চা খাবার কোন সময় নেই, খেলেই হল। এক কাপ নয়, দু-কাপ তৈরি করবেন।

রেবা চা তৈরি করতে গেল।

মাস দুয়েক আরো কেটেছে।

লাবণ্যদি বললেন, আমাকে দিন দুয়েকের জন্য বিরাটি যেতে হবে ভাই।

মধু প্রমাদ গুনলো, দু-দিনের জন্য? কেন লাবণ্যদি?

শ্বশুরের বাৎসরিক। না গেলেই নয়।

কিন্তু...

ওই দেখ, ছেলের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল! আমি কতদিন বাঁধা পড়ে থাকব এখানে? এখন না হয় দু-দিনের জন্য যাচ্ছি, সামনের পুরো মাসটাই ছেড়ে দিতে হবে। ন'মাসীকে কথা দিয়েছি, তাঁর সঙ্গে কেদার-বদ্রী যাব।

সর্বনাশ। রিলির কি হবে তাহলে?

তুই আমাকে ধরে রাখতে চাইলে হবে কেন? পরকালের চিন্তা এখন থেকে যদি না করি, কখন করব বল? আমার একটা কথা শোন, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়।

বলো?

বিয়ে করো।

বিয়ে করব! কি বলছ লাবণ্যদি?

ঠিকই বলছি। তোরও দেখা শুনা করবার লোক আসবে, রিলিও বাঁচবে।

একবার তো বিয়ে করেছিলাম। দেখলে তো, ধাতে সইল না।

ভাগ্যবানের বৌ মরে বুঝলি। মেয়েটা না থাকলে তোকে বিয়ে করতে বলতাম না। ওই অবোধ শিশুর জন্য তোর অনেক দায়দায়িত্ব, স্বার্থত্যাগ করতে হবে। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

ও কথা থাক; এখন যে তুমি দিন দুয়েক থাকবে না, তার কি হবে?

তুই কলেজে থাকাকালীন রেবা রিলিকে দেখবে। রাত্তিরটুকু শুধু তার কষ্ট।

বিস্ময়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছল মধু ঃ বলছ কি লাবণ্যদি! তোমার অনুপস্থিতির সময় উনি রিলিকে দেখবেন?

আমি ওকে বলে রেখেছি।

কিন্তু...ভালো দেখাবে কি?

খারাপ দেখাবার কি আছে?

তুমি বুঝতে পারছ না, উনি একজন অবিবাহিত মহিলা। মানে...

থাক, তোকে আর কথা বাড়াতে হবে না। বিশ্বাসের অমর্যাদা তুই করবি না জানি। আমি যা বলেছি, মাথা ঠাণ্ডা করে দেখ, তাহলে সব দিক রক্ষা পায়। রেবার মত মেয়ে হয় না।

রেবা! লাবণ্যদি...

আমি তোর ভালো চাই মধু।

না-না; এ হতে পারে না, এ হবার নয় লাবণ্যদি।

নিজের পায়ে যারা কুড়ুল মারে, আমি তাদের ঘৃণা করি। তুই রিলিকে মেরে ফেলতে চাস? একটু ভেবে দেখ, রেবা ওর জন্যে জীবন দিতে পারে।

আর বল না। তুমি থামো...তুমি থামো লাবণ্যদি। আমি কিছু ভাবতে পারছি

না, সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মধু ছুটে পালিয়ে গেল নিজের ঘরে।

সেদিনকার মত নিষ্কৃতি পেলেও বরাবরের জন্য নয়। লাবণ্যপ্রভা লেগে রইলেন মধুর পিছনে। দ্বিতীয়বার বিয়ে না করলে রিলিকে বাঁচানো যাবে না, একথা বারংবার বলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুললেন।

উপায়হীন মধুকে শেষপর্যন্ত বলতে হল, বেশ, তোমার কথা রাখব। কিন্তু রেবার বাবা কি দ্বিতীয় পক্ষর হাতে মেয়ে দিতে রাজি হবেন?

হবেন বৈকি। না হলে আমি তাঁকে রাজি করাব।

লাবণ্যপ্রভা নিজের কথা রাখলো। কেদার-বদ্রী যাবার পূর্বে রেবার সঙ্গে মধুর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভকাজ শেষ হল। তর্করত্ন মশাই ছাড়া নিজের সহকর্মীদের কাউকে মধু আমন্ত্রণ জানায় নি।

বিদায় নেবার সময় তিনি দুজনকে আন্তরিকভাবে আশীর্বাদ করে গেছেন। রেবা ও মধুকে বৌভাতের দিন একান্তে রেখে রিলিকে কোলে নিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে লাবণ্যপ্রভা যখন ঘরের বাইরে এসেছেন, তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে।

মধু প্রথমে কিছু বলতে পারেনি। সুনন্দার পোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। রেবা নববধূ, কি বলবে, সেও চুপচাপ। এখনও কোন বাড়িতে শানাই বাজছে। দুটি জীবন নতুন জীবনে প্রবেশ করছে সেখানে আর এখানে, একজন নতুনকে সাগ্রহে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ কিনা কে জানে। দ্বিতীয়জন, বেদনাদগ্ধ যে-জীবন ফেলে এসেছে, সেই স্মৃতিকে রোমন্থন করবার জন্য হয়তো ব্যগ্র!

একসময় মধু নীরবতা ভঙ্গ করল।

রেবা...

বলুন?

তোমার জীবনের অনেক আনন্দকে আমি নষ্ট করে দিলাম।

এ-কথা কেন বলছেন?

বয়স আমার যাই হোক না কেন, দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম। আর রিলি— বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদায়িত্ব তোমাকে নুইয়ে দিয়েছে।

রেবা কিছু বলল না।

নীরবতার মধ্যে দিয়ে মিনিট কয়েক আরো কাটল!

তারপর মধু বলল, গোটা কতক কথা তোমাকে বলে নিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু থাক—ফুলশয্যার রাতের একটি স্বতন্ত্র মাদকতা আছে। আমার জীবনে না হয় দ্বিতীয়বার, তোমার তো প্রথম। স্বাভাবিক নিয়মে কিছু অর্থহীন কথা আমরা এখন আলোচনা করব।

রেবা মৃদু গলায় বলল, অপনি যা বলতে চাইছেন, বলুন?

না, থাক।

মিথ্যা ভাবাবেগ আমার নেই। বলুন?

সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তোমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে আমাকে করতে হয়েছে। এ-কথা খুবই সত্যি, রিলি আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বাধ্য করেছে। তোমার কাছে আমার এই প্রথম ও বিশেষ অনুরোধ, আমার ওপর তোমার কর্তব্য কিছু শিথিল হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রিলিকে চোখের মণি করে রাখবে।

রিলির জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।

আমি বিশ্বাস করি রেবা, তুমি তাকে নিজের করে নিতে পারবে। আমার কি মনে হচ্ছে জান?

বলুন?

মনে হচ্ছে, সুনন্দা আমাদের দুজনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুনছে, আমরা তার রিলির সম্পর্কে কি আলোচনা করছি।

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

সুনন্দার আত্মাকে ভূত বলে হেয় করো না, সে আমার জীবনে ওয়েশিশ ছিল রেবা। যাক, ও-সমস্ত কথা। রাত অনেক হল, শুয়ে পড় এবার।

আপনি...

আমি একটি চিঠি লেখা শেষ করে শুতে আসছি।

বিয়ের পর মাস খানেক কেটে গেছে।

মধু রেবার কাছে জানতে চেয়েছিল দিন দশেকের ছুটি নেবে কিনা। রিলিকে নিয়ে দুজনে ঘুরে আসবে কোথাও। রেবা রাজি হয়নি। তার অভিমত হল, এখন সিজন চেঞ্জের সময়। কলকাতার বাইরে গেলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে রিলি, এখন থাক। ও আরো কিছু বড় হোক। তারপর যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যাবে। মন্দ যুক্তি নয়।

কলেজ থেকে ফিরে কাপড় বদলাতে বদলাতে মধু লক্ষ্য করল, ড্রেসিং টেবিলের পাশে টাঙানো সুনন্দার বড় পোর্ট্রেটটা যথাস্থানে নেই। কোথায় গেল! রেবা ঘরে ছিল না, রিলিকে নিয়ে বাগানে আছে বোধ হয়। ভেজানো দরজা ঠেলে বাড়িতে প্রবেশ করেছিল মধু।

রেবা—রেবা—

মধুর আহ্বানে রেবা ঘরে এল। অবাক হয়ে বলল, ওমা তুমি কখন এলে?

মিনিট কয়েক হল। রিলি কোথায়?

পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

আচ্ছা, সুনন্দার ছবিটা এখান থেকে কোথায় গেল বলতো?

মুখ নামিয়ে রেবা বলল, আমি সরিয়ে রেখেছি।

কেন! সরিয়ে রেখেছ কেন?

ও-রকম জায়গায় কেউ ছবি টাঙিয়ে রাখে নাকি? আমার বিশ্রী লাগল। পরে

বাইরের ঘরে টাঙিয়ে দিলেই হবে।

গম্ভীর গলায় মধু বলল, খুবই দুঃখের কথা, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী অথচ আমার মনের খোঁজ রাখো না।

খোঁজ যদি না রাখব, তবে মানিয়ে চলছি কিভাবে?

যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছুকে প্রমাণ করা যায় না রেবা। অনুভূতি হল আরেক জিনিস। কাজটা তুমি ভালো করোনি।

রেবা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এ-বাড়ির কর্ত্রী আমি অথচ দেওয়াল থেকে একটা ছবি সরিয়ে নেবার অধিকার পর্যন্ত নেই আমার। আগে জানা থাকলে নিশ্চয়ই ও কাজ করতাম না।

অবুঝ হবার চেষ্টা করো না। ছবিটা কোথায় রেখেছ দাও, আমি আবার যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখতে চাই।

আছে কোথাও। রেবা দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

রেবার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হল মধু। মনে হল, ও যেন জেনে বুঝে তার নরম জায়গায় আঘাত করেছে। সে রেবাকে অনুসরণ করে ছবিটির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল। খুঁজতে হল না বিশেষ, পাওয়া গেল ওয়ার্ডরোবের পিছন থেকে।

কাচ ফেটে গেছে। সুনন্দাব সুন্দর মুখের ওপর ফাটা কাচের অসংখ্য দাগ রেখায়িত হয়ে রয়েছে। একটা মুহূর্তের অবহেলায় খান-খান হয়ে গেছে ছবিখানি। রাগে দুঃখে মধুর শরীর থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগল।

ছবি হাতে নিয়েই সে রান্নাঘরে উপস্থিত হল। রেবা চা তৈরি করছিল; আড়চোখে তাকাল। তারপর মধুর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না করেই স্টোভের ওপর থেকে কেটলি নামিয়ে, পেয়ালার লিকার ঢালতে লাগল।

মধু গম্ভীর গলায় বলল, ছবিটা শুধু দেওয়াল থেকে নামিয়ে নাওনি, কাচটাও ফাটিয়ে রেখেছ।

আমি কাচ ফাটাইনি।

নিজে থেকে কাচ ফেটেছে বলতে চাও?

উঁচু থেকে খুলে পড়ে গেলে কাচ তো ফাটবেই।

তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছ রেবা। একটু আগে বললে, ছবিটা খুলে নিয়েছ, এখন বলছ পড়ে গেছে।

ঝাঁঝাল গলায় রেবা বলল যদি কাচটা ফাটিয়েই থাকি, কি এমন লক্ষ টাকার ক্ষতি করে দিয়েছি। যে মরে গেছে—তার ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছুর ওপর তোমার যখন এতই দুর্বলতা, তখন বিয়ে করেছিলে কেন? ছবি দেখে বাকি জীবন কাটিয়ে দিলেই তো পারতে!

রেবা! আমি...

থাক, থাক—আর সিনেমার নায়কের মত ঢং করতে হবে না।

তোমাকে কেন, বিয়ে আমি কাউকেই করতে চাইনি। লাবণ্যদির অসম্ভব জেদের জয় হয়েছে। শুধু রিলির জন্য...

স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্য আমার জীবন ব্যর্থ করে দিতে তোমার বিবেকে বাঁধল না? চোখে আঁচল দিয়ে রেবা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে চলল, টাকার তোমার অভাব নেই, বিলিকে দেখবার জন্য গভর্নেস রাখলে তো পারতে, বিয়ে করবার কি দরকার ছিল?

পরিস্থিতি এমন নাটকীয় হয়ে উঠবে মধু কল্পনা করতে পারেনি। বিব্রত হয়ে পড়ল। মনে হতে লাগল, এই আলোচনাকে দীর্ঘ না করলেই ভালো হত। রেবার কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আমায় ভুল বুঝো না, তুমি আমার জায়গায় থাকলে, আমি এখন যা বলেছি, তুমিও তাই বলতে। যেতে দাও ও-কথা। রেবা...

রেবা কিছু বলল না।

রাগ করে থাকলে তোমাকে কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।

খোসামোদ করতে হবে না।

মধু হেসে ফেলল। বলল, পাড়ার রমেনবাবুর মেয়েকে কিন্তু আমি খোসামোদ করছি না, সময় বিশেষে নিজের স্ত্রীকে খোসামোদ করার অধিকার আমার নেই নাকি?

বিনয়ের অবতার।

কলেজের মেয়েরা আমায় কি বলে জান? অবশ্য আড়ালে-আবডাল থেকে শোনা—তারা বলে, লোকটার ভাগ্য দেখেছিস, দুবার বিয়ে করল, আবার দুবারই বৌ পেয়েছে পদ্মিনীর মত।

আর ছেলেরা কি বলে?

তারা আমায় হিংসে করে।

রেবা হাসল।

মধু স্থির করে ফেলল সুনন্দার ব্যাপার নিয়ে ভবিষ্যতে এমন আর কোন কথা বলবে না, যাতে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হতে পারে। ওই সমস্ত বিষয় তার কাছে যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, রেবার কাছে অতি তুচ্ছ ছাড়া কিছুই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপত্নী পাশে থাক বা না থাক, তাকে ঘৃণা করা হল স্বাভাবিক ধর্ম।

রেবাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণে অকারণে সুনন্দার প্রশংসা করে থাকে মধু। স্বাভাবিক ভাবেই রেবার তা ভালো লাগেনি। মনের মধ্যে প্রচুর তুলনামূলক ভাব আনাগোনা করেছে, শেষে রাজ্যের আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সুনন্দার পোর্ট্রেটটার ওপর।

সুনন্দার কথা আর তুলবে না মধু, সংসারে অশান্তিকে আমন্ত্রণ করে লাভ নেই।

মাস দুয়েক কেটে গেছে আরো।

রিলির স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। ওই বয়সের বাচ্চার যেমন স্বভাব হওয়া উচিত তেমন নয়। নাম-করা ডাক্তারকে কল দিয়েছিল মধু। তিনি অভিমত প্রকাশ

করেছেন, বিশেষ কোন রোগ নেই—পুষ্টির অভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

পুষ্টির অভাবে!! মধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। পুষ্টির অভাব তো হবার কথা নয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে ওই বয়সের শিশুর পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সংগ্রহ করে বাড়ি ভরিয়ে রেখেছে, তবে কেন পুষ্টির অভাবে রিলি দিন দিন দুর্বল হয়ে যাবে?

ডাক্তার চলে যাবার পর মধু তাকিয়েছে রেবার মুখের দিকে।

রেবা দ্বিধা জড়িত গলায় বলেছে, সময় মত ঠিক ঠিক তো সব খাইয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন যে ও দুর্বল হয়ে পড়ছে ভগবান জানেন।

আমি বরং দু-মাসের ছুটি নিই। কলকাতার বাইরে কোথাও হাওয়া বদল করে এলে ও শরীরে বল পেতে পারে।

না, না, ও-কাজ করো না, হিতে বিপরীত হতে পারে। ঠাণ্ডা লেগে ব্রঙ্কাইটিশ কি নিউমোনিয়া হলে আর দেখতে হবে না। তার চেয়ে. আমি বলি কি, মাদুলির ব্যবস্থা করি। তুকতাক বাচ্চাদের বেশ খাপ খায়।

মাদুলি!

তুমি ও-সমস্ত বিশ্বাস করো না নাকি?

আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না রেবা। মাদুলি পড়লে যদি রিলির ভালো হয়, তবে পরাও।

মাদুলি পরানো হল রিলিকে।

মধুর মনে হল, মাদুলি পরার পর রিলি একটু ভালোর দিকে। একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেলে রেবা একটা কাজের মত কাজ করেছে বলতেই হবে। মধু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

বিশেষ কারণ এসে পড়ায় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মধুকে আজকাল গোটা কয়েক বেশি ক্লাস নিতে হয়। আগেকার মত এখন সপ্তাহে দু-তিন দিন লিজার থাকার দরুণ দুপুরে বাড়ি চলে আসতে পারে না, ফিরতে পাঁচটা বেজে যায়।

কলেজ আজ বন্ধ হয়ে গেল বারোটার সময়। কলেজের সেক্রেটারি হঠাৎ মারা যাওয়ায় এ বন্ধ। মধু বাড়ি ফিরে এল। দরজার গোড়ায় পৌঁছে তাকে এক বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। তালা ঝুলছে—অর্থাৎ রেবা কোথাও বেরিয়েছে।

পর মুহূর্তে খুব অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না মধুর। প্রতিদিন একা বাড়িতে দুপুর কাটানো কষ্টকর। রিলিকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছে—হয়তো শোভাবাজারে গেছে। অনেক দিন তো বাপের বাড়ি যায় নি।

ডুপ্লিকেট চাবি মধুর কাছে নেই। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার পথ বন্ধ। পাঁচটার আগে রেবা বাড়ি ফিরবে বলে তো মনে হয় না, এতক্ষণ সময় অতিক্রম করবার একমাত্র জায়গা হল সিনেমা। আজকের কাগজেই দেখেছে, লাইট-হাউসে হিচককের বই এসেছে। মধু রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল, পৌনে একটা মাত্র।

সিনেমা আরম্ভ হতে এখনও অনেক দেরি, এই সময়টুকু অবশ্য কফি-হাউসে

কাটিয়ে দেওয়া যায়। দরজার গোড়া থেকে সরে আসবার আগেই কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

বাড়ির মধ্যে থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল—রিলি কাঁদছে।

কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রিলিকে ঘরে বন্ধ করে রেখে রেবা বেরিয়ে গেছে! যতক্ষণ না ফিরে আসবে ও ওইভাবে কাঁদতে থাকবে? চরম অস্থিরতা নিয়ে তালা ধরে টানাটানি করতে লাগল মধু। টাম্বলারের প্যাডলক টানলে খুলে যাবার বস্তু নয়।

অসহায় দৃষ্টিতে মধু চারদিকে তাকাতে লাগল। ওই দরজা না খুললে বাড়িতে প্রবেশ করা যাবে না কোনমতে। রিলি তখন বিরামহীনভাবে কেঁদে চলেছে। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় বারকতক ধাক্কা মারল। কোন লাভ হল না। সেগুন কাঠের দরজা ভাঙা তো দূরের কথা, একটু চিড় পর্যন্ত খেল না।

মধু উপায়ন্তর না দেখে হরিহরবাবুর বাড়ি দৌড়ে গেল। হরিহর রায় তার প্রতিবেশী। তিনি নিজের বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন; মধুকে উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, কি হয়েছে মধুসূদন?

মধু নিজের মুখের ভাবকে সাধ্যমত স্বাভাবিক করে বলল, আপনার কাছে পুরোন চাবির গোছা আছে? একটা তালার চাবি হারিয়ে ফেলেছি—দেখতাম একবার।

গোছা আছে। তালাটা কোন্ মেকার?

টাম্বলারের প্যাডলক।

প্যাডলক! তার ডুব্লিকেট তো হবে না।

মধু নিরাশ হয়ে হরিহরবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। প্যাডলকের ডুপ্লিকেট যে যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না, এ কথা তার খেয়াল ছিল না। বাড়ির সামনে ফিরে আরেক দৃশ্যের অবতারণা লক্ষ্য করল। দরজায় তালা নেই।

অর্থাৎ রেবা ফিরে এসেছে। স্পন্দন অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠল মধুর। নিজের উত্তেজনাকে আপ্রাণভাবে দমন করতে করতে সে গিয়ে করাঘাত করল দরজায়।

রেবা খুলে দিল দরজা। ওর চোখে উত্তেজনার কোন ছায়া দেখতে পাওয়া গেল না। স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

মধু দরজা অতিক্রম করল; বলল, সেক্রেটারি মারা যাওয়ায় কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে।

রিলির কান্না বন্ধ হয়েছে; সে ফিডিং-বটলে দুধ খাচ্ছিল।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

রেবার মুখে এবার আশঙ্কার ছায়া পড়ল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?

কোথায় গিয়েছিলে?

দোকানে গিয়েছিলাম। গোটাকয়েক টুকিটাকি জিনিস কেনবার ছিল।

ভবিষ্যতে রিলিকে একলা ফেলে কোথাও যাবে না। ভয় পেয়ে গিয়ে অসম্ভব কেঁদেছে মেয়েটা।

ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়বে, কে জানতো। কাপড় বদলে খাবার ঘরে এস, চা দিচ্ছি।

মধু আর কথা না বাড়িয়ে কাপড় বদলাতে গেল।

দিন দশেক পরে।

একটার সময় কলেজ সাসপেণ্ড হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে মধুর কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগল না। আজও পূর্বদৃশ্যের প্রতিফলন দেখতে পেল, দরজায় তালা লাগানো। রেবা বেরিয়েছে—রিলিকে সঙ্গে করে নিয়েই বেরিয়েছে নিশ্চয়।

আজ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। সেই দিনের পর থেকে তালার দ্বিতীয় চাবিটা নিজের কাছে রেখেছে। তালা খুলে ভিতরে যাবার পরই রক্ত চনচন করে তার মাথায় চড়ে গেল। রিলিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি রেবা, নিজের বিছানায় সে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

নিঃশ্বাসের চাপে তার জীর্ণ বুক উঠছে-নামছে। শুকনো মুখে নেতিয়ে রয়েছে বিছানায়। রেবার মায়া হয় না? একা ফেলে চলে যায় কিভাবে? রিলির কাছে বসল মধু। সুনন্দার কথা মনে পড়ল। কয়েকদিন থেকে তার কথা বেশি করে মনে পড়ছে।

আজ সুনন্দা বেঁচে থাকলে রিলির জন্য এত চিন্তা কি তাকে করতে হত? কি প্রয়োজন ছিল তাকে এই চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে তার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার?

কিন্তু রেবা কোথায় গেল? সেদিন তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল মধু, রিলিকে একা ফেলে কোথাও যেন না যায়। তবু সে একা বেরিয়ে গেল কেন? ওর এই হৃদয়হীন স্বভাবের জন্য মধু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। রেবার দেখা নেই।

রেবা ফিরল সাড়ে তিনটের কিছু পরে। তালা খোলা অবস্থায় দরজা ভেজানো দেখেই ও বুঝে নিয়েছিল মধু ফিরে এসেছে। তার মুখে কিঞ্চিৎ বিহ্বলতার ছাপ পড়ল। দরজা ঠেলে ভেতরে গেল রেবা। মধু রিলিকে কোলে নিয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিল; স্ত্রীকে দেখে ভ্রূ কুঁচকালো।

রেবা স্বাভাবিক গলায় বলবার চেষ্টা করল, কখন ফিরলে?

গম্ভীর গলায় মধু বলল, পৌনে একটায়।

এত তাড়াতাড়ি ফিরেছিলে? কলেজ বুঝি সাসপেণ্ড হয়ে গিয়েছিল?

আমাকে প্রশ্ন করে নিজের দোষকে ঢাকবার চেষ্টা করো না। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

রেবা চুপ করে রইল।

চুপ করে রইলে যে? কোথায় গিয়েছিলে?

কোথাও যাবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত আমার নেই? তোমাকে জিজ্ঞেস না করে গেলেই চোখ রাঙিয়ে প্রশ্ন করবে?

তীক্ষ্ণ গলায় মধু বলল, উল্টো চাপ দেবার চেষ্টা করো না। আমি জানতে চাই, কোথায় গিয়েছিলে—কেন গিয়েছিলে?

কৈফিয়ৎ চাইছো?

হ্যাঁ কৈফিয়ৎ। তোমাকে আমি বারণ করে দিয়েছিলাম, রিলিকে একা ফেলে কোথাও যাবে না। তা সত্ত্বেও তুমি কেন গিয়েছিলে? তোমার শরীরে দয়া-মায়া নেই? এই অবোধ শিশুকে একা ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এলে?

রেবা এগিয়ে এসে মধুর হাত ধরল। বলল নম্র গলায়, আমার ভুল হতে নেই বুঝি?

এ-রকম মারাত্মক ভুলকে আমি অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে করতে পারছি না। আমি একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তোমাকে হয়তো...

বিশ্বাস করো, আমি ভেবেছিলাম, যাব আর আসব। এত দেরি হয়ে যাবে আমার ধারণা ছিল না।

কিন্তু পরিতাপের কথা আমি যে পয়েন্টের ওপর স্টিক করে রয়েছি, তুমি তার কাছ ঘেঁষেও যেতে পারনি। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরি হোক—তুমি একা বেরিয়েছিলে কেন? আমি তোমাকে বলে রেখেছি, যখনই বেরুবে রিলিকে সঙ্গে নিয়ে ছাড়া বেরুবে না।

বলছি তো, ভুল হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আর এ-রকম হবে না। রিলিকে আমায় দাও। যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে এস লক্ষ্মীটি। আমি ওকে শুইয়ে দিয়ে তোমার জন্য চা তৈরি করি।

মধু আর কথা বাড়াল না, রিলিকে রেবার কোলে দিয়ে কাপড় বদলাতে গেল।

সপ্তাহখানেক পর কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। কলেজ থেকে অসময় বাড়ি ফিরে রেবাকে দেখতে পেল না মধু। রিলি তখন কেঁদে চলেছে। মধুর মনের কানায় কানায় বিরক্তি ভরে উঠল। মেয়েকে সে কোলে তুলে নিল। কোলে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে রিলির।

মধু নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। মন খারাপ হয়ে গেল অসম্ভব। এখন তার কর্তব্য কি? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল। রিলির আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রিলিকে একা রেখে ডাক্তার ডেকে আনা সঙ্গত বিবেচনা করল না মধু। মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক পা এগিয়েছে একটা ট্যাক্সি এসে থামল। রেবা নামল ট্যাক্সি থেকে। ও মধুকে দেখতে পায়নি—ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে গেল।

ডাক্তারখানা বেশি দূরে নয়। তার বাবার আমল থেকে ডাক্তারবাবু তাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা করছেন। রিলিকে তিনি ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই।

ওষুধ নিয়ে মধু বাড়ি ফিরে এল। দরজার গোড়ায় দেখা হল রেবার সঙ্গে। ওর মুখে ভয়ের ছাপ। মধু কিছু না বলে রিলিকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। রেবা এল তার পিছু পিছু।

থার্মমিটার দিয়ে রিলির জ্বর দেখা হল, একশ' এক।

মৃদু গলায় রেবা প্রশ্ন করল, জ্বর হয়েছে?

হ্যাঁ।

মাথায় জলপটি দেব?

ডাক্তার জলপটি দেবার কথা বলেননি।

আমি বুঝতে পারিনি, ওর শরীর খারাপ হয়েছে। যখন বেরিয়েছিলাম, ও তখন ঘুমোচ্ছিল। যদিও...

তোমাকে কোন প্রশ্ন করিনি। কেন কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বিব্রত হচ্ছ।

আমার বেরিয়ে যাওয়া অন্যায় হয়েছে।

মধু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে পার নাকি? তা যদি পারতে, বারংবার রিলিকে এইভাবে একা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে না।

রেবা আর কিছু বলল না।

তিনদিন কলেজে গেল না মধু। রিলি সুস্থ হয়ে উঠল এই তিনদিনেই। চতুর্থদিন কলেজে যাবার আগে রেবার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কলেজ যাচ্ছি। রিলিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ওকে একা ফেলে দুপুরে কোথাও যাবে না।

এই তিনদিন ধরে মধু অনেক কথার সঙ্গে এ-কথাও ভেবেছে, রেবা দুপুরে যায় কোথায়? বাপের বাড়ি গেলে সে-কথাই বা পরিষ্কার করে বলে না কেন? বিরাটিতে যায় কি? লাবণ্যদির কাছে সময় কাটিয়ে আসে? যদি তাই হয়, তবে স্বীকার করতে বাধা কোথায়?

প্রকৃত ব্যাপার বোধ হয় অন্য কিছু। এমন কিছু, যা বলতে সঙ্কোচ হয় রেবার। আবার না গিয়েও উপায় থাকে না। এমন কি এই তিনদিনের মধ্যেও পাঁচ মিনিটের জন্য বেরুচ্ছি বলে তিন ঘণ্টা বাড়ির বাইরে কাটিয়ে এসেছে একেকবার।

কোথায় যায়? কেন যায়?

মধু অনুসন্ধান করে দেখবে, রেবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার উৎস কোথায়? শোভাবাজারে, ওর বাপের বাড়িতে সন্ধান নিয়ে জানা গেল, গত দু-মাসের মধ্যে ও সেখানে যায়নি। লাবণ্যদির ওখানে বিরাটিতেও যায়নি মাস চারেক।

একটা বাঁকা সন্দেহ মধুর মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল।

আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে করতে যখন কলেজে গেল, তখন দুটো। একটা ক্লাশ নেওয়া হল না। তার জায়গায় নিশ্চয় অন্য কাউকে ক্লাশ নিতে প্রিন্সিপ্যাল পাঠিয়েছিলেন। পোর্টিকোর কাছে প্রফেসর সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসবার চেষ্টা করতে করতে পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

মধু লক্ষ্য করেছে কিছুদিন ধরে সহকর্মীরা তাকে একটু এড়িয়ে চলছেন। সময় সময় তাকে দেখলে চাপা গলায় কি সমস্ত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ছাত্ররাও তার সম্পর্কে আজকাল উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখলে তারা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে তোলে নিজেদের মুখে।

ব্যাপার কি?

অন্যদিন হলে সরকারের ব্যবহারের গুরুত্ব দিত না মধু। আজ তার মনে অস্থিরতা ছিল সরকারকে ওইভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে দেখে কান গরম হয়ে উঠল তার।

শুনুন...

সরকার নিজের গতি রোধ করলেন, আমাকে বলছেন?

এখানে আর কেউ নেই। আমি জানতে চাই, কিছুদিন ধরে আমাব সম্পর্কে আপনাদের ব্যবহার ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়ে উঠছে কেন?

প্রফেসর সরকার কয়েক পা এগিয়ে এলেন, আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন। আমাকে নিয়ে কি এত আলোচনা হয় আপনাদের মধ্যে, বলবেন কি?

নাই বা শুনলেন। তবে এটুকু জেনে রাখুন, কথাটা কলেজের গভর্নিং বডির সেক্রেটারির কানেও উঠেছে।

কথাটা কি?

সরকারের মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল। বলল, বললাম তো, নাই বা শুনলেন।

বরেনবাবু—

দেখুন মশাই, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না। বরং নিজের স্ত্রীকে গিয়ে ধমকান, তাতে হয়তো তিনি নিজের চরিত্র কিছু সংযত করতে পারেন।

মধু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সরকারের কলার চেপে ধরতে যাচ্ছিল, ঠিক এই সময় হাঁ-হাঁ করে তর্করত্নমশাই দুজনের প্রায় মধ্যে এসে পড়লেন।

একি...একি, কি হচ্ছে তোমাদের?

আপনার ছাত্র ভালো বলতে পারবেন।

নিজের কাঁধ একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে সরকার স্থান ত্যাগ করলেন।

কি, হয়েছে কি? তোমাকে তো ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক বলেই জানতাম।

মধু নিজেকে সংযত করে নিয়েছে এক লহমার মধ্যে। কলেজ প্রেমিসেসের মধ্যে একি সিনক্রিয়েট করতে যাচ্ছিল সে। ভাগ্যক্রমে কোন ছাত্র এখানে উপস্থিত ছিল না এই রক্ষে।

মধু ঘটনাটা বলল তর্করত্নমশাইকে। শেষে বলল, স্ত্রীর সম্বন্ধে ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি।

গম্ভীর মুখে তিনি সমস্ত শুনলেন। এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কয়েকদিন থেকে কিছু কিছু কথা আমার কানেও আসছে। বৌমা নাকি—

রেবার কথা বলছেন স্যার?

হ্যাঁ। দেখ মধুসূদন, গৃহকে সামলে রাখার দায়িত্ব গৃহকর্তার। সে দায়িত্ব পালন করতে যদি গৃহকর্তা উদাসীন হয়, তবে তাকে ঠকতে হবে।

আপনি কি বলতে চাইছেন স্যার?

আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। আজ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি, তোমার ভালোর জন্যই বলেছি। একটু শক্ত হও। বৌমা নাকি আজকাল এমন সমস্ত লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীব। কলেজের অনেকেই দেখেছে। কানাকানি হওয়া স্বাভাবিক!

মধুর শরীরের সমস্ত রক্ত হঠাৎ অসম্ভব গরম হয়ে উঠল, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রাগ আর বিরক্তি তার মনকে প্রায় পিষে ফেলল, একটা কথাও বলল না সে। বলল না বললে ভুল হবে, বলতে পারল না। বিস্মিত তর্করত্নমশাইয়ের সামনে দিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে কলেজ কম্পাউণ্ড অতিক্রম করল। তিন-দিন বাড়িতে কাটিয়ে আজ কলেজ এসেছিল, কিন্তু কলেজ করা আর হল না।

মধু ফিরে চলল বাড়িতে। ট্যাক্সিতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না।

ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সে লক্ষ্য করল, পরিপাটি করে সেজে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে রেবা বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে; মধুকে দেখেই ওর মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠল।

ভয়কে জয় করবার ক্ষমতা তার অপার। মধু কিছু বলার আগেই শান্ত গলায় ও বলল, তুমি এসে পড়েছ, ভালোই হল—আমি বেরুচ্ছি।

আমি না এসে পড়লেও তুমি বেরুতে।

বেরুতেই হত যে...

ফেটে পড়ল মধু, আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তা সত্ত্বেও একটা দুধের বাচ্চাকে একলা ফেলে তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ? নিজের স্বভাবকে বদলাতে এতটুকু ইচ্ছে করে না তোমার। ভগবান জানেন, তোমার মন কি দিয়ে গড়া।

রেবা নিজের গলার আওয়াজ চড়িয়ে বলল, তুমি চাও, এই চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন থেকে আমি নিজের জীবন নষ্ট করে দেব? আমার দ্বারা তা হবে না।

তুমি যা বলছ, আমি তা কোনদিন চাই না। আমার যা কিছু বক্তব্য সমস্তই রিলিকে নিয়ে।

রিলি—রিলি—অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তোমার স্ত্রীর দরকার ছিল না, দরকার ছিল মেয়েকে দেখাশুনা করবার জন্য একজনকে। বিয়ে করে লোক হাসাতে গেলে কেন, একজন গভর্নেস রাখলেই পারতে! টাকার তো আর অভাব নেই।

আমি তোমাকে ধরে-বেঁধে বিয়ে করিনি। তোমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এনেছিলেন লাবণ্যদি। আমার স্ত্রী হয়ে এ-বাড়িতে প্রবেশ কববার পর কোন্ গুরুদায়িত্ব হাসি-মুখে হাতে তুলে নিতে হবে, তা তোমার অজানা ছিল না।

রেবা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, লেকচার দিতে থাক। বাজে কথা শোনবার

সময় আমার নেই, চললাম।

দাঁড়াও. .

না।

বাইরে যাওয়া তোমার হবে না।

তোমাব হুকুমে?

হ্যাঁ, আমার হুকুমে।

আরো সত্তর বছব আগে তোমাব জন্মানো উচিত ছিল, নিজেব স্ত্রীকে হুকুম দিয়ে ওঠ-বোস কবাতে পারতে।

বিদ্রূপ গলায় ঢেলে দিয়ে মধু বলল, তখন এই ধরনের হুকুম করবার অবকাশ আমি পেতাম না, কারণ তোমার মত স্বেচ্ছাচাবী স্ত্রী সে-যুগে মাথা কুটে মবে গেলেও পাওয়া যেত না। তুমি যদি ভেবে থাক, আমি কিছুই জানি না, তবে বলতে হবে ভুল ধারণা নিয়ে আছো। শুধু আমিই নয়, কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা—ওরা তোমার রাস-লীলার কথা জেনে ফেলে আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। লজ্জা করে না? ভদ্রঘরের বৌ হয়ে যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছো? আর কেউ না জানলেও আমি জানি, তাদের সঙ্গ লাভ কববার আকাঙক্ষা তোমার কত তীব্র!

রেবা কল্পনা কবতে পারেনি, মধু এত তাড়াতাড়ি সব জেনে ফেলবে। একটু ইতস্তত করে অধর-দংশন কবে বলল, আমি এমন কিছু করিনি, যার জন্য এত কথা বললে। কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে কিছু সময় কাটালে তা যে তোমার এবং তোমার কলেজের আর সকলের চোখে দোযনীয় হয়ে উঠবে, বুঝতে পারি নি।

বন্ধু যখন পুরুষ, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যতই অনুকরণ করি না কেন, পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে আমাদের এখনও কয়েকশ' বছর লাগবে বোধ হয়। মেয়ে পুরুষের বন্ধুত্বকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আর সেই সন্দেহজনক কাজ তুমি করছ!

মধু রিলির কাছে গিয়ে বসল। রিলি অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তার ছোট শরীর বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। পাণ্ডুর মুখ, এক ফোঁটা রক্তও যেন শরীরে নেই।

কেউ কোন কথা বলল না কয়েক মিনিট। রেবা দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে। শেযে অনেকক্ষণ পরে বলল, এখন কি করতে চাও তুমি?

কোন্ বিষয়ে?

আমি তোমার একমাত্র প্রবলেম। আমার বিষয় কি করতে চাও, জানতে চাইছি।

রিলির দিক থেকে মুখ না সরিয়ে মধু বলল, কিছুই করতে চাই না। তুমি আমার প্রবলেম হিসেবে বিরাজ থাক, তাও আমার অভিপ্রেত নয়। তুমি নিজেকে একটু সংযত করো, অতীতের সমস্ত কথা আমি ভুলে যেতে রাজি আছি।

রেবা এগিয়ে এল; বসল মধুর পাশে। সঙ্কোচ জড়ানো গলায় বলল, পরিণামের কথা চিন্তা না করেই সময় সময় অনেক কাজ করে ফেলি, পরে অনুশোচনা

করতে হয়। ভবিষ্যতে এমন আর কোন কাজ করব না, যাতে তুমি কোন অভিযোগ তুলতে পারো।

মধু কিছু বলল না, রিলির মুখের দিকে তাকিয়েই বসে রইল।

বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই কেটে গেছে আরো একটি মাস। আর কোন অভিযোগ উত্থাপন করবার অবকাশ দেয়নি রেবা। মধু যে-কোন সময় ফিরে এসে দেখেছে ও বাড়িতে আছে। রিলিকে নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। খুশি হয়েছে সে। রেবার সম্পর্কে নিজের মনোভাবকে আমূল পরিবর্তন করবার জন্য ব্যস্ততা অনুভব করেছে।

আরেক বিষয় নিয়ে মধু চিন্তা করে দেখেছে।

কলেজে তাকে নিয়ে আলোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সময় সময় ক্লাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফাজিল উদ্ধত ছোকরা সব কালেই কলেজে কিছু থাকে। রোল করার সময় নিজের রোল নম্বর না বলে রেবার নাম উচ্চারণ করার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ঘনঘন।

এইভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না, মধু চিন্তা করে স্থির করে ফেলেছে এ কলেজ ছেড়ে দেবে। এমন কি কলকাতার কোন কলেজে যোগ দেবে না, কোন মফঃস্বলে নিজের কর্মকেন্দ্র বেছে নেবে। চেষ্টা করছিল। অল্প দিনের মধ্যেই বহরমপুর কলেজ থেকে আহ্বান এল।

মধু বলল রেবাকে, কাজে যোগ দেবার আগে জায়গাটা আমার মনোমত হবে কিনা একবার দেখে আসা দরকার, কি বলো?

বহরমপুর তো শুনেছি বেশ ভালো জায়গা।

জায়গা ভালো সন্দেহ নেই, তবু একবার যাওয়া দরকার। আমি বরং কালই রওনা হয়ে যাই, একটা বাড়ি ঠিক করে আসি এই ফাঁকে। দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব। রিলির দিকে নজর রেখো, ওর শরীর আবার দিন কয়েক থেকে ভালো যাচ্ছে না।

মধু বহরমপুর চলে গেল।

ভালোই লাগল জায়গাটা তার। কলেজের সেক্রেটারি ও প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা হল, দুজনেই অমায়িক, ভদ্র ব্যক্তি। ছোট একটা একতলা বাড়ি অল্প ভাড়াতেই পাওয়া গেল। বাড়িওয়ালাকে দু-মাসের ভাড়া অ্যাডভ্যান্স করে ঠিক তিনদিনের মাথায় কলকাতায় ফিরল মধু।

তখন সন্ধ্যা হতে কিছু দেরি আছে, সূর্য সবে পাটে বসতে চলেছে। নিজের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে মধু নামল। দরজায় তালা লাগান। রিলিকে নিয়ে রেবা কোথাও বেরিয়েছে, এই কথা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ডুপ্লিকেট চাবি কাছেই ছিল। তালা খুলে মধু ভিতরে গেল।

সে কল্পনা করতে পারেনি ভিতরে তার জন্য এক কল্পনাতীত মর্মন্তুদ দৃশ্য অপেক্ষা করছে। বারান্দা অতিক্রম করে সে নিজের শোবার ঘরে গেল। বাইরে কিছু আলো অবশিষ্ট থাকলেও ঘরের মধ্যেটা ছায়া ছায়া। হাত বাড়িয়ে সুইচ

টিপল।

আলোর বন্যায় ঘর ভরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল মধু। রিলি বিছানায় পড়ে আছে, স্থির নিস্পন্দ তার শরীর। অসংখ্য মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে, চাক বেঁধে বসেছে শরীরের এখানে-ওখানে। সম্বিত ফিরে পাবার পরই একটা বিশ্রী সন্দেহ মধুর মনের মধ্যে গুলিয়ে উঠল, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

তার সন্দেহ অলীক নয়। রিলির ছোট্ট দেহে প্রাণ নেই, বহুক্ষণ পূর্বে মারা গেছে সে। কাঠিন্যের ঢল নেমেছে সমস্ত শরীরে। মনের মধ্যে হু-হু করে উঠল মধুর। রিলি চলে গেল! তার অপরাধ কি? চলে যাওয়া ছাড়া তো উপায় ছিল না। এত উপেক্ষা, এত অত্যাচার ওই ছোট্ট প্রাণে আর কতদিন সইবে?

বিছানায় মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মত মধু হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। এইভাবে কতক্ষণ কেঁদেছে জানে না। মুখ তুলল একসময়—সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে তখন। অস্থিসার, বিবর্ণ রিলির ওপর মাছির উপদ্রব আগেকার মতই রয়েছে।

মধু নিজের মনের মধ্যে দৃঢ়তা আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তাকাল না সুনন্দার ছবির দিকে। দু-হাত দিয়ে রিলির প্রাণহীন দেহ তুলে নিল। বাড়ির বাইরে এসে একটা রিক্সায় উঠে বসল, রিক্সা-চালককে নির্দেশ দিল নিমতলায় যেতে।

শ্মশান থেকে মধু ফিরল রাত দশটার পর। এখন যে কোন পরিচিত লোক তাকে দেখলে চমকে উঠতেন। এই ক'ঘণ্টায় তার বয়স বেড়ে গেছে যেন দশ বছর। সমস্ত মুখ রেখায় রেখায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। শ্লথ পায়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করার মুখে দেখা হয়ে গেল রেবার সঙ্গে; ও ভয়-চকিত মুখে দাঁড়িয়েছিল।

মধু কিছু বলবার আগেই ও কিন্তু-কিন্তু গলায় বলল, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল—এ-রকমটা হতে পারে আমি বুঝতে পারিনি।

মধু এই কথাগুলির অপেক্ষায় বোধ হয় ছিল; ফেটে পড়ল একেবারে—ছোটলোক, ইতর মেয়েমানুষ, বুঝতে পারোনি। ষড়যন্ত্র করে আমার জীবনের কোমল অবলম্বনকে এইভাবে কেড়ে নিয়ে এখন বলছ, তুমি বুঝতে পারোনি!

তুমি বিশ্বাস করো...

থাক, কোন কথা আমি শুনতে চাই না। রিলি চলে গেছে, তোমারও এই বাড়িতে থাকা হবে না। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে!

ঘটনা এইপথে গতি নেবে কল্পনা করতে পারেনি রেবা। কান্না জড়ানো গলায় বলল, কি বলছ তুমি! বেরিয়ে যাব—কোথায় বেরিয়ে যাব!

যাবার জায়গার অভাব কি? এতক্ষণ আমার মান-সম্মান নিয়ে যার সঙ্গে খেলা করে এলে, সে তো তোমায় লুফে নেবে।

ক্ষমা করো তুমি আমায়, আমার ভুল হয়ে গেছে। এ-রকম ভুল জীবনে আর হবে না।

আমার জীবনটা ছারখার করে দেবার পরও অভিনয়! আমি তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না।

আরো কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল মধুর, কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ধীরগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে বাড়ির বাইরে চলে এল। চারদিকের অবস্থা তখন থমথমে। আকাশের পরতে পরতে মেঘ। বৃষ্টি নামবে। মধুর মনের আকাশে বৃষ্টি হবার কিন্তু কোন সম্ভাবনা নেই, ঝড় বইছে, প্রবল ঝড়।

নিজের কাহিনী শেষ করে মধুসূদন গুপ্ত অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরালেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন মৃগাঙ্ক ঘোষ। সুকুমারও। ওই মানুষটির জন্য দুজনের মনেই সহানুভূতি তিরতির করে কাঁপছিল।

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল নীরবেই। শেষে মৃগাঙ্ক বললেন, শেষ পর্যন্ত কি হল?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললেন, সেদিন সারাটা রাত পার্কেই কাটিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরেছিলাম, সকাল আটটার পর। ফিরে এসে রেবাকে দেখতে পাইনি। হাট করে খোলা ছিল সদর দরজা। শূন্যতায় বাড়িখানা খাঁ খাঁ করছিল। ফিরে এসে দশ মিনিটও অপেক্ষা করলাম না সেখানে, বাড়িতে তালা লাগিয়ে সোজা চলে এলাম স্টেশনে। বহরমপুর গিয়ে ওখানকার কলেজে যোগ দিলাম—অবশ্য মন বসিয়ে কাজ করতে পারলাম না! ওখান থেকে গেলাম রামপুরহাটে। এইভাবে কলেজে কলেজে ঘুরতে ঘুরতে মুঙ্গেরে গেছি। কতদিন টিকতে পারব জানি না। আমার কথা শেষ হল। মিস্টার ঘোষ, এবার আপনি আরম্ভ করুন।

মৃগাঙ্ক বললেন, আমার কাহিনী আপনার বা সুকুমারবাবুর মত ব্যর্থতার ইতিহাস নয়। বরং বলতে পারেন, রসাল উপন্যাস, যা তারিয়ে তারিয়ে পড়তে ভালো লাগে। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, কাহিনী শেষ করতে দুপুর-রাত হয়ে যাবে। যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব সেরে নিচ্ছি।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন। কাহিনীটা মনের মধ্যে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন বোধ হয়। গলা খাঁকারি দিয়ে আরম্ভ করলেন শেষে।

আমাদের আদি বাড়ি হল রানাঘাটে। একান্নবর্তী পরিবার ও বিরাট ছক-মেলানো বাড়ির চার-দেয়ালের মধ্যে আমার প্রথম যৌবনের সোনালি দিনগুলো কেটেছিল। লেখা-পড়ায় বিশেষ ভালো ছিলাম না। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করি, তাও অবশ্য গুরুজনরা চাইতেন না। তাঁরা চাইতেন, প্রাথমিক শিক্ষাটুকু কোনরকমে শেষ করতে পারলেই হল। তারপর ঢুকে পড়ো পৈতৃক ব্যবসায়ে।

বছর পনেরো বয়েস হবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের পরিবারের পুরুষদের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু নেই। ঠাকুর্দা বেঁচে থাকাকালীন দেখতাম, বাবা ও কাকারা মদে চুরচুরে হয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন।

নিজেদের স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতেন, প্রহার করতেন নির্দয়ভাবে। যেটুকু সঙ্কোচ ছিল—অবশ্য সঙ্কোচ যদি থেকে থাকে, ঠাকুর্দা মারা যাবার পর তাও ঘুচে গেল। বাইরের বাড়ির ঘরে-ঘরে বাঙালী-অবাঙালী অনেক মেয়ের আবির্ভাব হল। তাদের চেহারার জেল্লায় চোখ ধাঁধিয়ে যেত। আমার গুরুজনেরা তাদের নিয়ে রাতের পর রাত কামনার সাগরে সাঁতরে বেড়াতে লাগলেন।

এই দেখতে দেখতেই আমি বড় হলাম। সময় সময় মন উদ্বেল হয়ে উঠত, একটা পাশব চিন্তা মনকে সাপটে ধরত। আজ বলতে লজ্জা হচ্ছে—সেদিন মনে হত, ওদেরই মধ্যে একজনকে সকলের অগোচরে কাছে টেনে আনি। নিরানন্দ মনে দিন কেটে যাচ্ছিল।

দৈবাৎ একটা সুযোগ এসে উপস্থিত হল। খুড়তুতো বোনের বিয়ে ছিল। বাড়িতে বিরাট ধুমধাম। বাবা লক্ষ্ণৌ থেকে এক নামকরা বাঈজী আনলেন। দুলারীবাঈ—যেমন তার চেহারার চটক, তেমনি তার চলনে-বলনে দুর্বার আকর্ষণ। যৌবন অবশ্য মুঠো থেকে বেরিয়ে গেছে। বছর চল্লিশের কিছু নিচে। কোন বিশেষ কৌশলে শরীরকে ধরে রেখেছে বলে মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে বুঝতে পারা যায় না।

বাবা ও কাকাদের মধ্যে দুলারীবাঈকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম। উঁচু ঘরানার বাঈজীরা গান গেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়। দেহের বেসাতি করে না। দুলারীবাঈ কোন উঁচু ঘরানার কিনা আমার জানা ছিল না, তবে দেহের বিনিময়ে কিছু উপরি রোজগার করে নেওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না সহজেই বুঝতে পারলাম।

দুলারীবাঈ সম্পর্কে আমার কোন দুর্বলতা ছিল না। আমার বয়স তখন বাইশ। কামনার আগুনে যতই জ্বলতে থাকি না কেন, তবু নিজের বয়স অপেক্ষা পনেরো-ষোল বছরের বড় কোন নারীর ওপর দুর্বলতা প্রকাশ করার মত নিম্ন রুচি আমার ছিল না। আমি প্রেমে পড়ে গেলাম দুলারীবাঈয়ের ষোড়শী কন্যা নিম্মির।

আমাকে স্টেশনে পাঠান হয়েছিল ওদের রিসিভ করে আনতে। একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে সকলে নামল। তবলচি, সারেঙ্গী-বাদক ইত্যাদি সকলকে নিয়ে জন ছয়েক লোক। ওদের মধ্যে নিম্মিকে আবিষ্কার করলাম। আমার মাথা ঘুরে উঠল। বাপ-কাকাদের দয়ায় সুন্দরী মেয়ে কম দেখিনি, তবে এমনটি আগে দেখেছি বলে স্মরণ হল না।

এক বাটি দুধের মধ্যে দশ ফোঁটা আলতা ফেলে দিলে যেমন রঙ হয়, নিম্মির গায়ের রঙ ঠিক তেমনি। হরিণ চোখ বুঝি একেই বলে। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট। সুদৃশ্য মাপসই নাক। নাকে মুক্তা বসানো নথ, সোনার চেন দিয়ে কানের সঙ্গে আটকানো।

অকারণেই অসহ্য আনন্দ আমাকে পেয়ে বসল। প্রায় টলতে টলতে ওদের নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। চোখে-চোখে রাখতে লাগলাম নিম্মিকে। হাজার চেষ্টা করেও কিন্তু একান্তে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নিতে পারলাম না। তাকে

শুধু নিজের পরিচয়টুকু দিতে পেরেছিলাম স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে।

বিয়ের রাতে গানের আসর বসল।

সকলের সঙ্গে আমি বসলাম তাকিয়া হেলান দিয়ে। ছায়ানটের সে সুর আজও কানে লেগে আছে, কি গানই গেয়েছিল সেদিন দুলারীবাঈ। গানের দিকে কান থাকলেও আমার চোখ ছিল নিম্মির মুখের ওপর, নির্বিকার মুখে সে বসেছিল বৃদ্ধ তবলচির পাশে।

পৌনে এগারোটার সময় নিম্মি আসর ছেড়ে উঠে গেল—এখুনি নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু সাড়ে এগারোটা বেজে যাবার পরও ফিরল না। আমার মাথায় একটা পবিকল্পনা খেলে গেল—সকলে এখানে রয়েছে, এই অবসরে নিম্মির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে দোষ কি? সমস্ত রাত গান চলবে, আসব ছেড়ে দুলারীবাঈ বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের কারুর উঠবার সম্ভাবনা নেই।

উঠি উঠি করেও বারোটার আগে উঠতে পাবলাম না। চলে এলাম গেস্ট-হাউসে। কারুর চোখ বাঁচিয়ে আসার জন্য কোন সতর্কতা অবলম্বন করবার প্রয়োজন ছিল না। সন্ধ্যা লগ্নে বিয়ে হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নিমন্ত্রিতরা চলে গেছেন দশটার আগে। যাঁরা রয়ে গেছেন, তাঁরা গিয়ে বসলেন গানের আসরে। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। জোরালো আলোটা নেভানো ছিল, জ্বলছিল বেডরুম ল্যাম্প। প্রথমে কিছু ঠাহর করতে পারলাম না।

মিনিট খানেকের মধ্যে চোখ সয়ে এল। দেখলাম, বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে আছে নিম্মি। ঘুমিয়ে পড়েনি, এপাশ ওপাশ করছে। বিছানার পাশে চন্দন কাঠের টিপয়ের ওপর পোর্টের বোতল। গেলাসে তরল নেশা টলটল করছে। কয়েক মিনিট ইতস্তত করলাম আমি, চৌকাঠের ওপাশেই আমার পা অনড় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত নিজের ইতস্তত ভাবকে আমি জয় করলাম। মনে ধিক্কার এল, বাইজীর মেয়ের সঙ্গে কথা বলব, তার জন্য এত ইতস্তত কিসের! ঘরে প্রবেশ করলাম।

নিম্মি মোহময় চোখে তাকাল আমার দিকে। স্খলিত গলায় বলল, কে...

আমি।

আমি কে?

আমি মৃগাঙ্ক।

ও।

তুমি আসর থেকে চলে এলে কেন?

হাসল নিম্মি—এক আঁচলা মুক্তা ঝরে পড়ল। বলল, আমার নেশার সময় হয়ে গিয়েছিল যে!

তুমি মদ খাও?

খাই।

এই বয়সে!

আমার কত বয়স হয়েছে বলুন তো?

কত আর হবে, পনেরো।

উনিশ। বাইজীর মেয়েরা কত বয়সে মদ ধরে জানেন?

না।

বারো বছর থেকে। বুঝতে পারছেন বোধ হয়, আমি পুরোন পাপী।

ঈষৎ জড়ানো হলেও নিম্মির অসঙ্কোচ কথাবার্তা আমার মনে ক্রমেই দাগ কেটে চলল। বিছানার একপাশ দেখিয়ে দিয়ে, গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম, বসব?

বসুন।

বসলাম। কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। নিম্মি তাকিয়ে রইল আমাদের এক পূর্বপুরুষের অয়েল-পেন্টিংয়ের দিকে। মরণ-উন্মুখ মুগ্ধ পতঙ্গ যেমন প্রদীপের চারপাশে পাক খেতে থাকে, আমার চোখ সেইভাবে নিম্মির মুখের চারপাশে পাক খেয়ে চলেছে বলতে পারলে ভালো হত। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজের যেন দু-চোখ দিয়ে তাকে লেহন করে চললাম।

বেশিক্ষণ এইভাবে কাটল না, দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে ফেললাম—একটা হাত চেপে ধরলাম। বাধা দিল না নিম্মি—নেশায় মন রঙীন হয়েছিল বলে কিনা অবশ্য জানি না। আমার শিরায় শিরায় আগুন ছুটতে লাগল। আমি দু-হাত দিয়ে ওকে আকর্ষণ করলাম।

নিম্মির মুখে প্রশ্রয়ের হাসি।

আমি ঝুঁকে পড়লাম।

এবার বাধা দিল সে। মৃদু গলায় বলল, এখুনি কেউ এসে পড়বে।

কেউ আসবে না।

বাজিয়েদের মধ্যে কেউ এসে পড়তে পারে।

করুণ গলায় বললাম, আমাকে কাছ থেকে সরিয়ে দিও না নিম্মি, তোমার জন্যে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি।

নিম্মি কিছু বলল না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমার ঘরে যাবে?

আপনার ঘরে!

হ্যাঁ। সেখানে কেউ আসবে না। আপত্তি করো না, চলো।

হাত দিয়ে আমাকে সরিয়ে নিম্মি উঠে দাঁড়াল। টিপয়ের ওপর থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে পোর্টের শেষ বিন্দুটুকু গলায় ঢেলে দিল। পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললাম। সে আমার বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেল। আমি সবিস্ময়ে শুনলাম; সে বলছে, আপনার ঘর কত দূরে?

কাছেই; এস।

আমরা দুজন অগ্রসর হলাম।

এরপরে আমার কয়েক ঘণ্টা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ দিয়ে মোড়া ছিল। গানের আসর শেষ হবার আগে অর্থাৎ ভোর হবার মুহূর্তে, নিম্মিকে তার ঘরে ফিরিয়ে

দিয়ে আসব এই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে উঠল না।

ঘুম ভাঙল প্রবল ডাকাডাকিতে। ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম। নিম্মিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল; সে নিজের প্রায় নগ্ন দেহটাকে তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে নিল। আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়তে লাগল। কাচের জানলা ভেদ করে সূর্যের আলো ঘরে ঠিকরে পড়েছিল। বেশ বেলা হয়ে গেছে।

তবে কি জানাজানি হয়ে গেল? প্রায় কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দরজা খুললাম। যা ভেবেছিলাম, তার একচুল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম না। বাবা কাকাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গম্ভীর মুখে। দুলারীবাঈও উপস্থিত। দরজা খুলে দিতেই ছোটকাকা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। পরমুহূর্তে নিম্মির হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেলেন। আর সকলে আমার ওপর বজ্রাঘাতের মত কটাক্ষ হেনে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

আমি ভয়ে আধ-মরা হয়ে নিজের ঘরে পড়ে রইলাম। নিজের অসতর্কতার জন্য হাত কামড়াতে ইচ্ছে করতে লাগল। ঘুমিয়ে না পড়লে এই কেলেঙ্কারি হত না। নিম্মি সকলের অগোচরে নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারত, এই ঘটনাকে আঁচ করে নেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব হত না। বেলা গড়িয়ে চলল। সাড়ে দশটার সময় অনন্ত এল।

অনন্ত আমার পিসতুতো ভাই—আমাদের বাড়িতেই থাকে। বয়সে কিছু বড় হলেও দুজনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। সে ঘরে ঢুকেই বলল, বেশ খেল দেখালে যা হোক।

কি এমন দোষ করেছি? বাপ-কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করা কি অন্যায়?

এ-বাড়িতে অন্যায় নয়। আসল কথা হল, ছুঁড়িটা যদি নথ পরে না থাকত, তাহলে কোন গোলমালই বাধত না।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, নথ! নথের সঙ্গে গোলমালের কি সম্পর্ক?

অনন্ত আকাশ থেকে পড়ল, তুমি কিছুই জান না?

না তো!

অবাক কাণ্ড! এই জাতের উঠতি বয়সের নথ-পরা মেয়ে দেখলে বুঝবে তারা ভার্জিল। বুঝলে কিছু? সে যে কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে রাত কাটায় নি—নথ হল তার সাইন।

বেশ; তারপর?

তারপর আর কি, অনেক পয়সাওয়ালা বাবু তার উমেদার হবে। ওদেরই মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে নথ খুলে সে তার খাস হয়ে থাকবে। চড়া টাকায় নিম্মির নথ খুলবেন তোমার ছোট কাকা স্থির হয়ে রয়েছে। এদিকে তার নাকে নথ থাকতে থাকতেই তুমি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসলে।

আমি অবাক! নথের নেপথ্যে এত ব্যাপার আছে কে জানত?

আধঘণ্টাটাক থাকার পর অনন্ত চলে গেল। আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে

লাগলাম। কাকাদেব আবির্ভাব হল ঘণ্টাখানেক পবে। পুত্রেব ব্যবহাবে নিদারুণ লজ্জিত হয়ে পড়ায় বাবা বোধ হয় আব এলেন না। তাঁবা ঘরে ঢুকেই আমাকে তিনদিক থেকে আক্রমণ করলেন। লেকচারের ফোযারা ছুটিয়ে দিলেন। আমার মত চরিত্রহীন ছেলে নাকি তাঁদেব বংশে আর জন্মায নি। কথার পর হাত ছুটল। বলাবাহুল্য ছোট কাকা নিজের মনের ঝাল ঝাডলেন আমাব ওপর জুতো দিয়ে।

নির্বিকার মুখে আমি মাব খেলাম। শেষে তাঁবা জানালেন, আমি বাড়িতে থাকলে দুলাবীবাঈ এখানে থাকবে না। নিম্মিকে নিয়ে চলে যাবে বিকেলেব ট্রেনে। সুতরাং আমার এখানে থাকা চলবে না। আমাকে যেতে হবে গ্রামের বাডিতে গোমস্তাদের কাজ তদারক করতে। বাবাবও এই মত।

আমি কোন কথা বললাম না।

নিদারুণ অভিমান মনেব মধ্যে গুলিযে উঠতে লাগল। দুলারীবাঈ চলে যাবে বলে এঁরা আমাকে বাড়ি থেকে সবিয়ে দিতে চাইছেন! বাড়ির ছেলেব চেয়ে বাঈজী এঁদের কাছে অনেক বড। বিকেলে একটা সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামে গেলাম না। গেলাম কলকাতায়। এরপর পাঁচটা বছর কেমন ভাবে কেটেছিল, তাব ইতিহাস নাই বা শুনলেন। এইটুকু জেনে রাখুন, সুখে কাটেনি।

পাঁচ বছর পবে মানিকতলাব মোড়ে একদিন রানাঘাটেব এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তাঁব মুখে শুনলাম অনেক পরিবর্তন হয়েছে বাড়ির। কাকারা পৃথক হয়ে গেছেন, বাবা কঠিন রোগে শয্যাগত। প্রতি মুহূর্তে আমাকে খুঁজছেন।

বাড়ি যাওয়াই স্থির করলাম।

বাবা যেন আমার অপেক্ষায় নিজেব প্রাণ ধরে রেখেছিলেন। ওখানে পৌঁছবার পরের দিনই তিনি মারা গেলেন। মা আগেই গত হয়েছিলেন, কাজেই আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হলাম। শ্রাদ্ধ চুকে যাবাব পর আমি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য চলে এলাম। আসবার আগে অবশ্য ছোট কাকাকে একটা আধবয়সী নথ-পরা মেয়েমানুষ উপহার পাঠাতে ভুলিনি। এখন আমার অনেক টাকা। জীবনটাকে ভাসিয়ে দিলাম ফূর্তিব জোযারে। তবে বাবা-কাকাদের মত বেশ্যা আর বাঈজীদের নিয়ে নাচানাচি আমাব পোযাল না। আমি কলগার্ল সংগ্রহ করতে লাগলাম।

সে সমস্ত দিনের বিস্তারিত কাহিনী শোনাতে গেলে আপনাদের ক্লান্তিকব মনে হবে। থাক। আমি বরং আমাব বর্তমানের সঙ্গিনী রক্তিমাকে কিভাবে সংগ্রহ করলাম, তাই বলি।

কলকাতার পচা গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার পর দার্জিলিং গিয়েছিলাম। বেজায় ভিঁড়। যাদেব ক্ষমতা আছে তারা তো বটেই, যাদের ক্ষমতা নেই, তারাও ধারধোর করে গরমকে তালাক দিয়ে এখানে চলে এসেছে।

অনেক কষ্টে হোটেলে জায়গা পেলাম।

হোটেলটি প্রথম শ্রেণীর নয়। না হোক, মাথা গোঁজবার জায়গা যে পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। বোর্ডাররা কেউ সাধারণ শ্রেণীব নয়; জোড়ায় জোড়ায় সব বাসা বেঁধেছেন। আমি কাউকে নিয়ে যায় নি। ইচ্ছে ছিল সম্ভব হলে এখান থেকেই সংগ্রহ করে নেবো।

দিন বেশ ভালোই কাটছিল। মুরগির কারি ওবা রাঁধত চমৎকার। খিদেও বেড়েছিল প্রচণ্ড। খেতাম আর ঘুরে বেড়াতাম। সেদিন বেরিয়েছি, হেঁটে চলেছি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। নির্জন পথ। হঠাৎ দেখলাম, ফুটপাথের রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে দুজন মেয়ে-পুরুষের উচ্চগ্রামে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। কাছে যেতেই চিনতে পারলাম, আমার পাশের ঘরের ব্যারিস্টাব আর তার স্ত্রী। ব্যারিস্টারের সুশ্রী স্ত্রীর মুখ আমার মনে ছাপ ফেলেছিল আগেই। তাকে স্বপ্নও দেখেছি দুদিন। রাস্তার মাঝে তাদের কি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলেছে কে জানে! আমাকে দেখেই দুজনে চুপ করে গেল। আমি কিছু শুনতে পাইনি, এমনি ভান করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম।

আসল ঘটনাটা ঘটল সেদিন মাঝ রাত্রে।

প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। চেঁচামেচি আসছে পাশের ঘর থেকে। ব্যারিস্টার মদের ঝোঁকে চিৎকার করে চলেছে। কান্নাব শব্দও পেলাম। ভদ্রমহিলা কাঁদছেন। আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমার কেন, দোতলার সমস্ত বোর্ডারের। প্রথম দু-একদিন আমরা সকলে ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলাম। ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম, মদ যখন ব্যারিস্টারকে চেপে ধরে, তখন তাঁর আর মুখের আগল থাকে না।

আমি পাশ ফিরে শুলাম। অকথ্য গালাগালি শুনতে শুনতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল দরজায় করাঘাতে। সকাল হয়ে গেল নাকি? বয় চা নিয়ে এসেছে। এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়লাম। দরজা খুলে দিতেই বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। সকাল হয়নি, বয়ও নয়। ব্যারিস্টাব-পত্নী শোচনীয় মুখের অবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

দরজা খুলতেই তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। কাতব গলায় বললেন, দরজা বন্ধ করে দিন।

তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কি হয়েছে বলুন তো?

আমি পালিয়ে না এলে মিঃ রায় আমাকে গুলি করে মারতেন।

মিঃ রায়! ও, ব্যারিস্টার সাহেব। কেন, তিনি আপনাকে গুলি করে মারবেন কেন?

সে অনেক কথা। আপনি ভদ্রলোক, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন?

বলুন!

আমি কাল কলকাতা ফিরে যেতে চাই। একলা যাওয়া অসম্ভব, কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

আমি সতর্কতার সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছিলাম। কোথায় যেন একটা খিচ আছে। শেষ রাত্রে অপরিচিত পুরুষের ঘরে এসে সাহায্য প্রার্থনা করা অতি মাত্রায় নাটকীয় বলে মনে হচ্ছিল।

বললাম, ব্যবস্থা! দেখুন, আপনাদের দাম্পত্য-কলহের মধ্যে আমাব মাথা গলানোটা কি ঠিক হবে?

দাম্পত্য-কলহ!

মানে...আপনার স্বামী ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখবেন না।

ভদ্রমহিলা এবার পরিষ্কার গলায় বললেন, আমি কারুর বিবাহিত স্ত্রী নই।

আমি হতভম্ব! মানে...আপনি...

আমাকে কাল চলে যেতে হবেই। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, না অন্য কারুর সাহায্য নিতে হবে?

আমার উপবাসী মন রসাল খাদ্যেব সৌরভে চনচনে হয়ে উঠল। স্ত্রী নয় ব্যারিস্টারের—রক্ষিতা। কোন কারণে আর বনছে না। ঝগড়া ঘোবাল হয়ে উঠেছে। ভালোই হল। ভগবান আছেন স্বীকার কবতেই হবে। আর প্রশ্ন নয়, এবার বাস্তবেই বোধ হয় এই রূপময়ীকে কবাযত্ব করা যাবে।

কালই যেতে চান?

হ্যাঁ।

বেশ, বেলা আটটার সময় আমি মল রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব, আপনি আসবেন। ট্রেন ধরতে অসুবিধে হবে না। আপনি এখানে বিশ্রাম করুন, আমি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ট্রেনে আলাপ জমে উঠল। কলকাতা পৌঁছবার আগেই রক্তিমাকে আমি নিজেব করে নিতে পারলাম। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তার নাম রক্তিমা। এই পেশায় নেমেছে অনেকদিন। কলকাতার অনেক রুই-কাতলার মনের মানুষ হযে তাব দিন কেটেছে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে। রক্তিমার এখন আমি বাঁধা খদ্দেব। অবশ্য রক্ষিতা বললে তার ওপর অবিচার করা হয়। সে আমার স্ত্রীর মত হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিজের কাহিনী শেষ করে হাই তুললেন।

সুকুমার কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

মধুসূদন গুপ্ত সিগারেট ধরালেন।

মৃগাঙ্ক বললেন, এবার উঠি, অনেক রাত হল। ভালো কথা, কাল দুপুরেব খাওয়াটা আপনারা আমার বাসায় সারবেন।

এসব ঝামেলা আবার কেন করলেন? সুকুমার বলল।

ঝামেলা নয়, কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম। রান্না কিন্তু রক্তিমাই করবে। তার হাতে খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি নেই।

সুকুমার বলল, ও-সমস্ত সংস্কার আমার নেই।

মিঃ গুপ্ত...

মধুসূদন সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললেন, আপত্তি আবার কিসের? যাব।

হোটেলে প্রত্যহ চপ, কাটলেট খাচ্ছেন। আমি সামান্য ঝোল ভাতের ব্যবস্থা করব। একটু মুখ বদলাবেন আর কি। চলি---

মৃগাঙ্ক ঘোষ বিদায় নিলেন।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সুকুমারকে নিয়ে মধুসূদন পৌঁছোলেন মৃগাঙ্কর বাড়িতে। ঠিকানা জানা থাকলেও আগে কখনো আসেন নি। টালির ছাদ দেওয়া বাংলো-বাড়ি। এক-দেড় কাঠার ওপর ফুল বাগানও আছে।

দরজার গোড়ায় মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়েছিলেন। মহা সমাদরে দুজনকে নিয়ে গেলেন ভেতরে।

সম্পূর্ণ দিশী প্রথায় বসবার ঘরটি সাজানো।

তক্তপোষের ওপর তিনজনে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসলেন। মিনিট দশেক কথাবার্তার পর মৃগাঙ্ক বললেন, বারোটার সময় খেতে বসলেই হবে, কি বলেন? তার আগে বরং রক্তিমার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।

সুকুমার বলল, বেশ তো।

তিনি ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে এলেন, সঙ্গে অপূর্ব এক নারী-মূর্তি। সাজের বাহুল্য চোখে পড়ে না। নমস্কার করে দাঁড়াল সে। মৃগাঙ্ক পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুকুমার স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এক নজর দেখে সে মাথা নত করে নিল। এক নজরেই এতদিন পরেও রত্নাকে তার চিনতে অসুবিধে হয়নি। তার হৃদয়কে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছিল, সেই রত্না এত নীচে নেমে এসেছে!

রত্নার স্বভাব ভালো ছিল না। ছিল না হৃদয় বলে কিছু। এর-ওর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করেই সে আনন্দ পেতো। কল্পনার শেষ প্রান্তে চলে গেলেও সুকুমারের মনে স্থান পেতো না। রত্নার পরবর্তী জীবন কাটবে এই নক্কারজনক জীবিকায়।

সে কি সুকুমারকে চিনতে পারছে?

মধুসূদন গুপ্ত থরথর করে কাঁপছেন। একি দেখলেন তিনি! মৃগাঙ্ক ঘোষের রক্ষিতা তাঁর স্ত্রী রেবা!! রেবার নৈতিক মান ভালো ছিল না। তবে সে যে এতদূর নীচে নামতে পারবে, তিনি কল্পনা করেননি। প্রবল বিরক্তি মধুসূদনকে গ্রাস করল। কেন আসতে গেলেন তিনি নৈনিতালে? এখানে না এলে তো রেবার এই রূপ দেখতে হত না!

ও কি চিনতে পেরেছে তাঁকে?

মৃগাঙ্ক দুজনের ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। রক্তিমাকে তাড়া দিলেন, বেলা চড়ে গেছে, এবার আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো---

সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে, হাসি মুখে রক্তিমা ভেতরে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে দরজার পর্দা সরিয়ে, মুখ বাড়িয়ে বলল, ভাত দেওয়া হয়েছে, ওঁদের নিয়ে এসো।

মৃগাঙ্ক বলেছিলেন, দুটি ঝোল-ভাতের ব্যবস্থা হবে। খেতে বসে সুকুমার দেখল রাজসিক ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য ঝোল অনুপস্থিত। খেতে ইচ্ছে করছিল না; সমস্ত কিছু বিস্বাদ লাগছিল। ইচ্ছে করছিল কাউকে কিছু না বলে এক ছুটে কোথাও চলে যায় এখান থেকে।

মধুসূদন কিছুই খেলেন না। বারংবার মৃগাঙ্কের অনুরোধকে এড়িয়ে যেতে পেট ভারের দোহাই দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ভাত হাতে করে তিনি উঠলেন। তিনজনে গিয়ে বসলেন বাইরের ঘরে।

মৃগাঙ্ক অনুযোগ করলেন, কিছুই খেলেন না আপনারা। এরকম পাখির মত আহার করলে শরীর টিকবে ভেবেছেন?...ইয়ে . কেমন দেখলেন আমার রক্তিমাকে?

মধুসূদন ধরা গলায় বললেন, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ।

সুকুমার ভায়া, আপনার মত কি?

সুকুমার গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, এত সুন্দরী মেয়ে আমি আগে কোথাও দেখিনি!

পান এলো—রক্তিমা দিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক আরো কথাবার্তা হল। গল্প তেমন জমল না। শিষ্টাচার বজায় রইল ঠিকই, কোথায় যেন তাল কেটে যেতে লাগল। মৃগাঙ্ক সতর্কতার সঙ্গে দুজনের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি বললেন, গল্প তেমন জমছে না। রক্তিমা আপনাদের মনে কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে!

মুখে হাসি টেনে আনবার ব্যর্থ চেষ্টা করে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, আপনি তো মশাই আমাদের হিংসার পাত্র হয়ে উঠলেন। মধ্যযুগ হলে কি করে বসতাম বলা যায় না—

গলা ফাটিয়ে হাসলেন মৃগাঙ্ক।

সুকুমার বলল, এবার আমি উঠব। গোটা কতক চিঠি লিখতে হবে হোটেলে গিয়ে।

আমিও উঠব। মিঃ ঘোষ, আপনি নিশ্চযই বিকেলে আসছেন?

সুকুমার ও মধুসূদন নিষ্ক্রান্ত হলেন।

হোটেলে নিজের ঘরে ফিরে সুকুমার চিঠি লেখেনি। কাউকে চিঠি লেখবার ছিল না। কথাটা বলেছিল, ওখান থেকে চলে আসবার অজুহাত হিসেবে। ফিরে

এসে শুয়ে পড়েছিল। বিচিত্র সমাপতন। যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, সেই কিনা দিনের পর দিন মৃগাঙ্ক ঘোষের পাশব মনোবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে চলেছে! কেন দেখা হল রত্নার সঙ্গে সুকুমারের?

কাটা ঘায়েব ওপর নুনের ছিটে পড়েছে যেন। যে নৈনিতালে আসবার জন্যে সে বছরের পর বছর ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করেছে, কত রঙীন কল্পনা তার মনকে রসাসিক্ত কবে তুলেছে, সেই নৈনিতালে সুকুমারের আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না।

অজস্র চিন্তায় সুকুমারের মন ভারি হয়ে উঠল।

মধুসূদন গুপ্ত ঘরে ছিলেন না। ঘরের লাগোয়া ঝুলন্ত বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। ঘুনের মত অসংখ্য চিন্তা তাঁর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কি আশ্চর্যেব বিষয়! এই সুন্দর নৈনিতালে রেবার সঙ্গে এই ভাবে দেখা হয়ে যাবে কে ভেবেছিল।

মধুসূদন স্থির করে ফেললেন নৈনিতালে আর নয়। শৈলাবাসে শান্তিতে দিন অতিক্রম কববার সাধ তাঁর মিটেছে। রেবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া যেন শুকিয়ে যাওয়া ঘায়ের ওপর নতুন করে খোঁচা লেগে যাওয়ার মত। তবে যাবার আগে একটা কাজ সেরে যাবেন মধুসূদন। তাঁর জীবনকে ছন্নছাড়া করে দিয়ে রেবা যে পরম নিশ্চিন্ততায় জীবন কাটাবে, তা হবে না। তা তিনি হতে দেবেন না। ওব সুখ-শান্তিতে প্রচণ্ড আঘাত করে তবে এখান থেকে বিদায় নেবেন।

অন্যান্য দিনেব মত মৃগাঙ্ক এলেন সন্ধ্যার সময়।

অন্ধকাব বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন মধুসূদন। সুকুমার ঘরেই ছিল। বিকেলেব পর থেকে একটা বিষয় তার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছিল। হঠাৎ মধুসূদন গুপ্ত আবার অন্য মানুষ হয়ে গেলেন কেন? তাঁর এই ভাবান্তরের কারণ কি? রত্নাকে দেখে কি তাঁর অন্য কারুর কথা মনে পড়ে গেল?

মৃগাঙ্কের সাড়া পেয়ে মধুসূদন ঘরে এলেন।

সুকুমার বলল, আপনারা বসুন; মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি এক জায়গা থেকে ঘুরে আসছি।

দুজনকে কোন প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি অতিক্রম কবে, পার্লার পেরিয়ে হোটেলের বাইরে এলো। মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি পৌঁছতে মিনিট পাঁচেকের বেশি সময় লাগল না। সামনেটা অন্ধকাব, শুধু একটা জানালার ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে হাল্কা আলোর আভা চোখে পড়ছে।

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কলিংপুশটা হাতের কাছে পেলো সুকুমার। আঙুল দিয়ে বার কয়েক চাপ দেবার পর দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে রক্তিমাকে দেখতে পেলো সুকুমার। কোন কথা না বলে সে ভেতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে দিল তারপর।

দুজনেই নির্বাক কয়েক মিনিট।

তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ?

হ্যাঁ।

যাক, তবু ভালো। আমি তো ভেবেছিলাম অচেনার ভান করে চমৎকার অভিনয় করবে।

নির্বিকার গলায় রক্তিমা বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে—সশ্লেষে সুকুমার বলল, তাই নাকি! এসে কি বলব, তাও বোধ হয় আঁচ করে নিয়েছ?

পুরোন সম্বন্ধটা বোধ হয ঝালিয়ে নিতে চাও!

ওকথা তুলতে তোমার লজ্জা করছে না! শুধু তোমার ব্যবহারে আমি সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপর খড়গহস্ত হয়ে আছি, তা কি জানো?

বোকার মত তুমি যদি কাজ করে থাকো, সে জন্যে দায়ী আমি নই। বরং আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত—পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছি।

বাঁচিয়েছ, না আরো ডুবিয়ে দিয়েছ?

রক্তিমা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ডিয়ার সুকুমার, বাঁচিয়েছি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই পাগলের মত প্রেমে পড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাত্রীর উপযুক্ততা বিবেচনা করে দেখতে হয়। তুমি নির্বোধের মত আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলে। আমার ব্যবহার ভবিষ্যতের জন্যে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছে।

উত্তেজিত গলায় সুকুমার বলল, কপাল দেখে মানুষ চেনার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই মিশতাম না।

চরিত্র তখন আমার একেবারে খারাপ হয়ে যায় নি। তখন আমাকে অ্যামেচার বলা যেতে পারত, এখন প্রফেশনাল।

চমৎকার! এই ঘৃণ্য জীবন যাপন করার চেয়ে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে না তোমার?

কেন, কোন্ দুঃখে? আমিও তো বলতে পারি, ওই সমস্ত বস্তা-পচা সেন্টিমেন্টকে নদীর জলে তোমরাও তো পারো ভাসিয়ে দিতে। যাক, পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগে না। জানতে পারি কি, চরিত্রবান পুরুষটি ঘোষমশাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এখানে কেন এসেছেন?

সুকুমার গম্ভীর গলায় বলল, আমি এসেছি তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে।

প্রতিশোধ!

চমকে উঠছ কেন? পৃথিবী বিরাট জায়গা। আবার যে তোমার দেখা পাব, ভাবতে পারিনি। দেখা যখন পেয়েছি, ছেড়ে দেবো না তোমাকে। আমার মত নির্বিরোধ সাদামাটা মানুষকে তুমি ঠকিয়েছিলে; আজও মৃগাঙ্ক ঘোষের মত ধনী, হাল্কা চরিত্রের মানুষকে ঠকিয়ে চলেছ। এ সুযোগ আর তুমি পাবে না।

কি করবে?

প্রশ্ন করো কি করব না! তোমার ওই সুন্দর মুখ অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দেবো।

আর্ত-চিৎকার করে উঠল রক্তিমা। ছিটকে সরে গেল ঘরের আরেক প্রান্তে।

কি বললে?

বললাম তো, অ্যাসিড দিয়ে তোমার সুন্দর মুখ গলিয়ে দেব, তখন পৃথিবীর বোকা পুরুষও তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না। তোমার মুখময় দগদগে ঘা হয়ে যাবে, রস পড়বে। চোখ চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যেতে পারে—চুল পুড়ে যাবে।

না,...না...

ভয় পেয়ে যাচ্ছো?

তুমি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ।

মিথ্যে নয়, বাস্তবে এই ঘটনা ঘটবে।

কেন তুমি আমাকে এরকম করবে সুকুমার? আমাকে ঘৃণা করো, আমাকে উপেক্ষা করো...

জোরে হেসে উঠল সুকুমার।

ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করলে দেখছি! এতগুলো বছর ধরে তোমাকে ঘৃণা করেছি, উপেক্ষা করেছি, তখন ভাবিনি আবার দেখা হবে। দেখা যখন হয়ে গেল, প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। নিজের বুকের জ্বালা মেটাবার জন্য শুধু এ প্রতিশোধ নয়। জানি, মৃগাঙ্ক ঘোষই তোমার শেষ মক্কেল নয়। একদিন এঁকে লাথি মেরে তুমি আরেক জনের কাছে চলে যাবে—আরেক পয়সাওয়ালার কাছে। তাকে দেউলিয়া করে যাবে অন্য জনের কাছে। অর্থ-সংগ্রহের জন্যে এই বেপরোয়া পরিক্রমা আমাকে অ্যাসিডের সাহায্যে প্রতিরোধ করতে হবে। এখন চললাম।

সুকুমার, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ...

তোমার সুন্দর মুখ আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সুকুমার...

আর দিন তিনেক সময় তুমি হাতে পাচ্ছো। চলি।

সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপর্যস্ত মন নিয়ে রক্তিমা দাঁড়িয়ে রইল। তার অসম্ভব ভয় করতে লাগল। অসম্ভব রাগ হতে লাগল মৃগাঙ্কের ওপর। কেন সে উপযাচক হয়ে এদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। শুধু সুকুমার নয়, মধুসূদনও আছে। তার অভিযোগ সুকুমারের চেয়ে অনেক বেশি। সে কি আসবে না কিছু বলতে?

রক্তিমা বেশিক্ষণ চিন্তা করবার অবকাশ পেল না। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর। একটু ঝুঁকে পড়া তাঁর শীর্ণ শরীর দামী স্যুটে ঢাকা। কুৎসিত মুখে অতৃপ্তির হাসি। হাতে সুদৃশ্য হাতির দাঁতের ছড়ি। ছড়ি দোলাতে দোলাতে তিনি এগিয়ে গেলেন।

চমকে উঠেছিল রক্তিমা। কুমার বাহাদুরকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। মধুসূদন

গুপ্ত নয়।

আমার বুলবুলি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে কেন?

এমনি। আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে কেউ দেখেনি তো?

না। তবে আমি একজনকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। কে ছিল লোকটা?

রক্তিমা হাসবার চেষ্টা করল—আমার একজন প্রাক্তন প্রেমিক।

নৈনিতাল পর্যন্ত ধাওয়া করেছে! বাহাদুর ছোকরা তো!

ধাওয়া করেনি; হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে।

পকেট থেকে হুইস্কির চেপ্টা বোতল বার করলেন কুমার বাহাদুর। বেশ কয়েক আউন্স গলায় ঢেলে দিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে বললেন, এই সমস্ত প্রেমিকরা কিন্তু ডেঞ্জারাস হয়। কি বলে গেল?

আমি নাকি তার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। ভ্যাজর ভ্যাজর করে কত কি তো বলে গেল। ও নাকি অ্যাসিড দিয়ে আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে।

বলো কি! অ্যাসিড পর্যন্ত গড়িয়েছে? যাক, ও-সমস্ত কথা দূরে কেন দাঁড়িয়ে বুলবুল, কাছে এস।

রক্তিমা কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, আমার ভীষণ ভয় করে—আপনি কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করবেন না।

কুমার বাহাদুর নিজের দুই শীর্ণ হাত দিয়ে সাপ্টে ধরলেন রক্তিমাকে। নিজের অ্যাল্‌কোহলের গন্ধে ভরপুর মুখ ওর শরীরের এখানে ওখানে ঘষতে লাগলেন।—এলেই যেতে বলো, এইভাবে কতদিন চলবে?

আপনি তো জানেন, আমি নিরুপায়। ঘোষ যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। আপনাকে দেখলে...

ঘোষ, ঘোষ আর ঘোষ—আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের খনখনে গলা আরো খনখনে হয়ে উঠল, তুমি কি তার কেনা বাঁদী নাকি? যদি দেখেই ফেলে, কি আসবে-যাবে! আমার সামনে তোমায় অপমান করবে ভেবেছ? সে সাহস তার হবে না। আমি বুঝতে পারি না বুলবুল, তুমি কেন তাকে এখনও ধরে রয়েছ?

কারণ আছে। আপনাকে পরে বলব।

পরে নয়। এখন বলো।

বলছি তো বলব। দু-একদিনের মধ্যেই বলব।

রক্তিমাকে ছেড়ে কুমার বাহাদুর পেছিয়ে এলেন। অধৈর্য গলায় বললেন, এত কথা আমি বুঝি না। আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই, তুমি এই ঘোষের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আমার কাছে আসবে কিনা?

আসব না বলিনি তো! শুধু দিন দশেক সময় আমাকে দিন। কিন্তু আর নয়, আর অপেক্ষা করা চলবে না আপনার। এতক্ষণে ঘোষ বোধ হয় সিলভার-অ্যারো হোটেল থেকে রওনা হয়েছে।

কুমার বাহাদুর কি বলতে যাচ্ছিলেন, রক্তিমা তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, আপত্তি করবেন না। আমি কাল দুপুরে বরং কোন রকমে সুযোগ-সুবিধা করে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার বাড়ি থেকে ঘুরে আসব।

অনিচ্ছার সঙ্গে কুমার বাহাদুর বিদায় নিলেন। অবশ্য যাবার আগে একশ' টাকার ক'টা নোট রক্তিমার হাতে গুঁজে দিতে ভুললেন না।

মধুসূদন গুপ্ত মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি পৌঁছলেন বেলা দশটার সময়। তিনি শুনেছিলেন, প্রতিদিন মৃগাঙ্ক এই সময় লেকে যান বোটিং করতে। সুতরাং রেবার বাড়িতে একলা থাকারই কথা। সুকুমারের চোখ বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে আসতে হয়েছে বলা বাহুল্য।

রক্তিমা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ছুটে এল বাইরের ঘরে। এখনও তো মিনিট পনেরোও হয়নি মৃগাঙ্ক বেরিয়েছে, ফিরে এল নাকি? দরজা খুলে দিতেই বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেল রক্তিমা। মৃগাঙ্ক নয়, গাম্ভীর্যের মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মধুসূদন।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা আছে।

সুকুমার আসবে, এ-ধারণা রক্তিমার হয়েছিল—কেন হয়েছিল বলা যায় না। সত্যি যখন সুকুমার এল, তখন তাই তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা আরম্ভ করতে পেরেছিল। মধুসূদন অন্য ধাতুর মানুষ, তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। আর যাই হোক, রক্তিমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না এটা ঠিক। সেই মধুসূদন এসেছেন।

গলা কেঁপে গেল রক্তিমার—আপনি...

হ্যাঁ। আমি।

উনি তো বাড়ি নেই, লেকে গেছেন। ফিরে এলে কি বলব বলুন?

অভিনয় করো না, আমায় চিনতে ঠিকই পেরেছ।

মধুসূদন ঘরের মধ্যে এলেন, এখন বোধ হয় এ-কথাও ভুলে যাওনি, তুমি আমার স্ত্রী। স্বামী বর্তমান থাকতে অন্যের সঙ্গে এইভাবে বসবাস করার অধিকার আইন তোমাকে দেয়নি।

রক্তিমা দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল।

তুমি চুপ করে থাকলেও আইন তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না।

তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

ডাইভোর্স তো করিনি।

রক্তিমা এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। অধৈর্য গলায় বলল, ঘোরাল কথা আমি শুনতে চাই না, যা বলবার পরিষ্কার করে বলো। আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি?

এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই।

নিয়ে যেতে চাও! আমি নষ্ট হয়ে গেছি জেনেও...

তুমি পবিত্র ছিলে কবে? চিবিয়ে চিবিয়ে মধুসূদন গুপ্ত বললেন, অন্য যে-কোন লোক হলে আগেই বুজতে পারত, আমি অত্যন্ত বোকা তাই বুঝতে পারি নি—একটা নষ্ট মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করে চলেছি। বুঝতে পারিনি, দিনের পর দিন এঁটো পাতা চাটছি। সেদিন বুঝতে পারলে, আমার রিলি ওইভাবে মারা যেত না।

এখন সবই যখন বুঝতে পেরেছ, তবে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছ কেন?

কেন! মধুসূদন জোরে হেসে উঠলেন। তোমাকে চাবুক মারবার জন্য। সেদিন যা করা উচিত ছিল, আজ তা করতে চাই। চাবকে পিঠ ফাটিয়ে রক্ত বের করে দিতে চাই।

রক্তিমার নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়তে লাগল। সে গম্ভীর গলায় বলল, পরের বাড়িতে এসে চেঁচামেচি করাটা ভদ্রতা নয়। যা বলবার তুমি বলেছ, এবার যেতে পারো। মৃগাঙ্কবাবু এসে পড়লে, আমাব চেয়ে অনেক বেশি অসুবিধায় তুমি পড়বে।

আমি তো চাই, সে এসে পড়ুক। হেঁচড়াতে হেঁচডাতে তোমাকে টেনে নিয়ে যাব, তার সাধ্য হবে না আমাকে বাধা দেবার। কিছুক্ষণেব জন্যে আইন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে রেবা। তারপর তুমি আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পারো। কিন্তু একটা কথা জেনে রেখো, মৃগাঙ্ক ঘোষ তোমাকে তখন সাহায্য করবে না—যে মুহূর্তে সে জেনে ফেলবে তুমি আমার স্ত্রী। তার সমস্ত ভালোবাসা উবে যাবে। সে ভয় পেয়ে যাবে। আমার জীবনটা নষ্ট করে দিয়ে তুমি সুখে থাকবে, তা আমি হতে দেব না।

তীব্র গলায় রক্তিমা বলল, যা করবার করতে পারো। এখন যাও, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

মধুসূদন আর কিছু বললেন না, তাঁর মুখে উপেক্ষার হাসি খেলা করতে লাগল। তিনি নিজে বহুবল্লভা পত্নীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ওদিকে রান্নাঘরে তরকারি পুড়ছিল। তাব উৎকট গন্ধ নাকে এসে লাগলেও রান্নাঘরে যাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও হল না রক্তিমার। ভাবনার পাযাণ ভার তার মাথায় এসে এখন চেপে বসেছে। এ-রকম গুরুতর সমস্যায় সে কখনও পড়ে নি। সুকুমার আর মধুসূদন—দুজনের হাত থেকে বিভিন্নভাবে সে নির্যাতিতা হতে চলেছে।

রক্তিমার সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল মৃগাঙ্কের ওপর। কি প্রয়োজন ছিল তার এই হাঙ্গামা বাধাবার? আগেও তো এসেছে নৈনিতালে, কত লোকের সঙ্গে মৃগাঙ্কের আলাপ হয়েছে—কোন বার তো বাড়ি ডেকে এনে কাউকে খাওয়ায় নি! এবার এই দুর্মতি কেন?

হাতের কাছে সহজ একটা উপায় আছে, কাউকে কিছু না বলে এখান থেকে

সরে পড়া। আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর মুখিয়ে আছেন, তাকে নিয়ে ভারতের সুদূরতম প্রান্তে চলে যেতে তাঁর আপত্তি হবে না। এক ঢিলে তিন পাখি মারা যায় এতে। সুকুমার ও মধুসূদনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। মৃগাঙ্ককে আর ভালো লাগছে না—তার হাত থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

হাতের কাছে এই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রক্তিমা গ্রহণ করতে পারছে না, দুটি বাধা তার পথ রোধ করে আছে। এই বাধা দুটির সৃষ্টিকর্তা মৃগাঙ্ক ঘোষ স্বয়ং। কতক্ষণ এইভাবে বসে বসে রক্তিমা ভাবত বলা যায় না—তার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল এই সময়।

মৃগাঙ্ক ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে প্রবেশ করলেন, তাঁর জামা-কাপড় ভিজে সপসপ করছে। চুলের ফাঁক দিয়ে জল ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে গালে। তিনি কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, বোট থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম।

কথাটা বলেই তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পরে। জামা-কাপড় বদলে এলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কি বিশ্রী ব্যাপার বলো, লেকের মাঝখানে বোট উল্টে গেল! ভাগ্যিস সাঁতার জানতাম, নইলে আমার লীলাখেলা শেষ হয়েছিল আর কি।

কথা বলতে রক্তিমার ইচ্ছে করছিল না; কিন্তু কিছু না বললেই নয়, তাই গলার স্বর স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে বলল, প্রতিদিন নৌকায় চড়ার যে কি দরকার আমি বুঝি না।

তোমার বুঝি মনে হয়, ডুবে যেতে পারি?

বিপদের কথা তো বলা যায় না।

মৃগাঙ্ক হাসলেন, ডুবে গেলে তোমার তো বিধবা হবার সম্ভাবনা নেই, তবে কেন এত চিন্তা। আচ্ছা রক্তিমা, একটা সত্যি কথা বলতো, তোমার কোনদিন কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল?

রক্তিমার শরীরের সমস্ত রক্ত বুকের ওপর আছড়ে পড়ল, তোমার কি মনে হয়?

আমার কোন ধারণা নেই, এমনি প্রশ্ন করলাম। যাক ও-কথা, দিন কয়েকের ব্যবহার উপযোগী জামা-কাপড় সুটকেশে গুছিয়ে দিও, আজ বিকেলে আমার লক্ষ্ণৌ যেতে হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ! কেন?

সঠিক কারণ তোমায় বলতে পারব না, আমি নিজেই জানি না। লেকে যাবার আগে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি স্যাভয় হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, আমি যেন অবিলম্বে লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গত বছর ওই হোটেলেই তো আমরা উঠেছিলাম। কি যেন নাম ভদ্রলোকের. .

নিবারণ দত্ত। আমার বিশেষ বন্ধু। গিয়ে শুনে আসি, তিনি কি বলতে চান।

ইতিমধ্যে তুমি একটা কাজ কববে।

বলো?

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না মৃগাঙ্ক। সিগারেট ধবালেন। ঘনঘন টান দিলেন কয়েকবার। গাঢ় কালচে হলদে রঙের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মুখ। কপালে অনেকগুলি রেখার সৃষ্টি হল, আবার সরল হল।

হাতের কাছে অ্যাস্ট্রে ছিল না। ঘরের মেঝেয় ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন. এক সোরাই জল ভরে এনে কেউ যদি বারংবার খেতে থাকে, তাহলে সোরাই শেষ হতে বেশি সময় নেবার কথা নয়। তেমনি ব্যাঙ্কে যতই কারুর টাকা থাক না কেন, এন্তার চেক কেটে গেলে জমানো অঙ্ক একদিন শেষ হবেই। তুমি জানো, আমার ব্যাঙ্ক ভর্তি টাকা ছিল। খরচ কি বকম করি, তাও তুমি দেখেছ।

তুমি আমার কি একটা কাজ করতে হবে বলছিলে?

ভূমিকাটুকু সেরে না নিলে সে কথায় আসা যাবে না। ক্রমেই আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে, আমি এখনই সতর্ক হতে চাই। ব্যাঙ্ক আবার ভরে ফেলতে চাই। এ-বিষয়ে তুমি আমাকে আশাতীতভাবে সাহায্য করতে পার।

কিভাবে?

রূপের জালে কিছু বড়লোককে তোমায় ফাঁসাতে হবে।

কি বলছ তুমি!

মৃগাঙ্ক জানালা গলিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলেন, বর্তমানে আমার যা বলা উচিত—প্রশ্ন উঠতে পারে, তুমি আমাব জন্যে এ-কাজ করবে কিনা। করতে যে তোমার হবেই। তুমি নিশ্চয় ভুলে যাবে না, আমার অনুগ্রহে কলকাতার একটা লকারে তোমার ত্রিশ হাজার টাকা আছে। লকারের চাবি এবং ওই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ও আমার হাতের মুঠোয়। টাকাটা সহজেই তুলে নিতে পারি, কিন্তু নেব না। তবে তুমি আমার কথা না শুনলে, কি হবে বলতে পারি না।

নিজের মনের মধ্যেকার প্রবল উত্তেজনাকে দমন করতে করতে রক্তিমা বলল, আমি তোমার অবাধ্য হব, এ-কথা বলিনি।

মৃদু হেসে মৃগাঙ্ক বললেন, জানি অবাধ্য হবে না। অন্তত কিছুদিন নয়। দশ বছরের বস্তু তোমাকে দিয়ে আমি করিয়ে নিয়েছি। এখন বেশ কিছুদিন তোমাকে অনুগত হয়ে থাকতে হবে। এক এক সময় তোমার নিশ্চয় মনে হয়, ঝোঁকের মাথায় বণ্ডে সই করে দিয়ে অত্যন্ত বোকামিব কাজ করেছ।

ও-কথা থাক, আমায় কি করতে হবে বলো?

কয়েকদিন আগে দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন খাওয়া-দাওয়া করতে; বয়স্কজন হলেন মধুসূদন গুপ্ত। লোকটার অনেক টাকা আছে। তোমায় নিংড়ে নিতে হবে।

মধুসূদন গুপ্ত!!

একি বলছে মৃগাঙ্ক! সে কি ইচ্ছাকৃত ভাবে একথা বলছে? সে কি জেনে ফেলেছে তার মধুসূদনের মধ্যে একাকার সম্পর্কের বিষয়, না এটা নেহাৎই

পরিকল্পনা? পরিকল্পনা মনে দানা বাঁধার পর মধুসূদনকে লুব্ধ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল?

একটা উত্যক্ত ভাব রক্তিমাকে অসম্ভব উতলা করে তুলল।

আমি পারব না।

পারবে না কেন?

একজন নতুন লোককে বশ করা শক্ত কাজ।

বলো কি! এ যে নতুন কথা শোনাচ্ছে আজ? পারতেই হবে তোমাকে। লোকটার বউ তার চোখে ধুলো দিয়ে অন্যের সঙ্গে প্রেম করত। আঘাত পাওয়া লোক। সেই আঘাতে সহজেই তুমি প্রলেপ লাগাতে পারবে। বেশি লোভ আমার নেই। হাজার বিশেক টাকা টেনে নাও, তারপর অন্য শিকারের সন্ধান দেখা যাবে।

কিন্তু...

কোন কিন্তু নয়। একটা বিষয় তুমি ভেবে দেখছ না, আমার যেমন আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তোমার তেমনি যৌবন ফুরিয়ে আসছে। তারপর কি হবে? যাতে কিছুই না হয়, সেই চেষ্টা আমি করছি। এই পরিকল্পনাকে ক্রমাগত সুষ্ঠ রূপ দিতে পারলে, বছরখানেকের মধ্যেই আমরা লাখ দেড়েক টাকা সংগ্রহ করতে পারব। বাকি জীবন আমাদের দুজনের পাযেব ওপর পা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

সবই বুঝলাম। আমি শুধু ভাবছি...

কিভাবে তার কাছাকাছি পৌঁছবে। আমি এখুনি তাকে ফোন করে বলছি, সন্ধ্যার সময় যেন একলা এখানে আসে, বিশেষ কথা আছে। সন্ধ্যায় এসে দেখবে আমি নেই, তখন—। মোট কথা হল, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি মধুসূদন গুপ্তর মাথাটা চিবিয়ে খাবে।

মৃগাঙ্ক ঘোষ পাশের ঘরে গেলেন ফোন করতে।

রক্তিমা চিন্তার আগুনে ছাই হতে লাগল। অতীতে তার জীবনে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, হেলায় কাটিয়ে উঠেছে সে। কিন্তু আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান সহজে হবে বলে মনে হয় না।

হোটেলে ভিড় কিছু কমেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছেন মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জি। ভিড় হালকা হওয়ায় মধুসূদন গুপ্ত অন্য ঘরে চলে গেলেন। আজই তাঁর নতুন ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দিলীপ। দ্রুত চোখে তিনি এখন হিসেবটা দেখে নিচ্ছেন। হিসেব দেখা হয়ে যাবার পর হাতে কোন কাজ নেই।

সশব্দে সাতটা বাজল দেয়াল-ঘড়িতে।

কাজ শেষ করে চোখ তুলতেই দিলীপ দেখলেন, আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর

কাচের ভারি দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর একটু নুয়ে পড়া শীর্ণ চেহারা দামী ওভার কোটে ঢাকা।

তিনি এগিয়ে এসে খনখনে গলায় বললেন, কি করছেন ম্যানেজার?

এইমাত্র কাজ শেষ করলাম। আর কিছু করবার নেই। আপনি এসে পড়ে ভালোই হল। আসুন, আমার প্রাইভেট চেম্বারে।

নতুন কিছু আমদানী হয়েছে নাকি?

হয়েছে বৈকি।

বস্তুটি কি?

খাঁটি বারগাণ্ডি। চোরা-পথ দিয়ে ফ্রান্স থেকে আমার হাতে এসেছে।

খুশি হলেন কুমার বাহাদুর, আপনি মশাই কাজের লোক। কিছুক্ষণের জন্যে আপনার প্রাইভেট চেম্বারে যেতে হচ্ছে দেখছি। কিন্তু তার আগে একটা ইনফরমেশন দিন তো?

বলুন?

মৃগাঙ্ক ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। আজ এসেছেন কি?

না। তিনি লক্ষ্ণৌ গেছেন।

লক্ষ্ণৌ! কি বলছেন?

ঘণ্টা তিনেক আগে আমি বাসস্টাণ্ডে গিয়েছিলাম একজনকে রিসিভ করতে। দেখলাম, তিনি রওনা হচ্ছেন।

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন কুমার বাহাদুর। কাউন্টারের কাছ থেকে কয়েক পা সরে গিয়ে দ্রুত গলায় বললেন, বারগাণ্ডি দিয়ে গলা ভেজান এখন আর হল না ম্যানেজার সাহেব। চলি। আরেক দিন আসছি। সবটুকু একাই শেষ করে ফেলবেন না যেন।---তিনি ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন।

কুমার বাহাদুরের ভাবভঙ্গী দেখে দিলীপ মুখার্জি হতভম্ব।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ ঠাণ্ডা অনেক বেশি। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছাদিত। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে বরফ পড়া আরম্ভ হতে পারে। সিজিনে যা সম্পূর্ণ বিরল সম্ভাবনা। ঠাণ্ডার মধ্যেই কুমার বাহাদুর দৌড়তে দৌড়তে প্রায় চলেছেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি যখন পৌঁছলেন, তাঁর সমস্ত শরীর তখন ঘামে জবজব করছে। হাঁপাচ্ছেন। অনভ্যাসে ফোঁটা। পুরোন কাশিটাও এই সময় আবার চাগিয়ে উঠল। কাশির দমক সামলাতে কয়েক মিনিট গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছলেন কুমার বাহাদুর। অপূর্ব সুযোগ পাওয়া গেছে। মৃগাঙ্ক ঘোষ লক্ষ্ণৌ গিয়ে চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁকে। আজ সমস্ত রাত এই বাড়িতেই থেকে যাবেন।

দরজার সামনে পৌঁছে কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হল, তালা লাগান। অর্থাৎ

রক্তিমা বাড়ি নেই। এই কনকনে সন্ধ্যায় কোথায় গেল সে? চিন্তিত কুমার বাহাদুর দরজার কাছ থেকে সরে এলেন। বাগান পেরিয়ে রাস্তায় নামলেন। এদিকে আরেক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। কুমার বাহাদুব যখন বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছেন, সুকুমার তখন বাগানের গেটের সামনে পৌঁছেছে।

সে বাগানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল, একজনকে দেখতে পেয়ে পিছিয়ে এল। কিছুদূর পিছিয়ে আসতেই আরেকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল সুকুমার। আবছা অন্ধকারের মধ্যে মধুসূদনবাবু ও সুকুমারের দৃষ্টি-বিনিময় হল। দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। কুমার বাহাদুর চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুজনের মধ্যে কোন কথা হল না।

তুমি এখানে?—মধুসূদন আগে প্রশ্ন করলেন।

আমারও তো ওই একই প্রশ্ন।

আমি এসেছিলাম মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

চিবিয়ে চিবিয়ে সুকুমার বলল, আমি কেন এসেছি বলুন তো?

কেন?

মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়েটির সঙ্গে! কেন?

তার সঙ্গে আমার একটা বোঝা-পড়া হবে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না সুকুমার?

বুঝতে না পারারই কথা। প্রথম জীবনে আমার বুকে যে দগদগে ঘা সৃষ্টি করেছে, সেই রত্নাই হল আজকের রক্তিমা।

মধুসূদন হতবাক হয়ে গেলেন। কথাটা সম্পূর্ণ অচিন্ত্যনীয়। অথচ সুকুমারের উক্তিকে হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় তো নেই। রেবার পক্ষে সমস্তই যে সম্ভব, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষে বললেন, তোমার কি একবারও মনে হয়নি ওই রক্তিমা আমার স্ত্রী রেবা হতে পারে?

দ্রুত গলায় সুকুমার বলল, কি বললেন, আপনার স্ত্রী!

হ্যাঁ, সুকুমার; আমার স্ত্রী।

আমি...মানে...অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তার কার্যকলাপে আমিই কি কম অবাক হয়েছি! যাক, তাব সঙ্গে কি রকম বোঝাপড়া করতে এসেছিলে? বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে। তোমার হাতে ওটা কিসের বোতল?

বোতলটা লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সুকুমার বলল, সিরাপের!—যে লোকটা এখান থেকে বেরিয়ে গেল, তাকে চেনেন আপনি?

না। রেবার কোন নতুন নাগর হবে!

মধুসূদন অগ্রসর হলেন—হোটেলের পথ ধরলেন তিনি।

সুকুমার অবসন্ন মনে দাঁড়িয়ে রইল।

কুমার বাহাদুর দ্রুত ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। রক্তিমাকে না পেয়ে বেশ হতাশ হয়েছেন তিনি। কোথায় আবার চরতে গেল সে। ওভারকোটের বোতাম খুলতে খুলতে ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেলেন।

রক্তিমা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। কুমার বাহাদুরকে দেখে সে বলল, কোথায় ছিলেন? আমি প্রায় এক ঘণ্টা এখানে বসে আছি।

কুমার বাহাদুর নিজের খনখনে গলাকে আপ্রাণভাবে নরম করবার চেষ্টা করে বললেন, একদিকে আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি বুলবুলি। মৃগাঙ্ক ঘোষের সুবুদ্ধিব উদয় হয়েছে বলতে হবে। ক'দিনের জন্যে গেছে, বলে গেছে কি?

ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি নিজের মনস্থির করে ফেলেছি।

অর্থাৎ...

ঘোষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়েছে, আমি আপনার কাছে চলে এসেছি।

কুমার বাহাদুর লাফিয়ে উঠলেন, বলো কি! তোমাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাব, এ যে আমি ভাবতেই পারছি না। কিন্তু বণ্ডের কি হবে? ঘোষ যে তোমাকে দিয়ে বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছে?

এখান থেকে চলে গেলে কিছু হবে না। ঘোষ কি ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা আমাকে আতিপাতি করে খুঁজবে ভেবেছেন? সে ধৈর্য তার নেই। কালই আমায় কোথাও নিয়ে চলুন।

সবই বুঝলাম। তবে...

অবাক হয়ে রক্তিমা বলল, আপনি ইতস্তত করছেন কেন? গতকাল পর্যন্ত তো আমায় কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন!

তা ছিলাম। তবে..., কুমার বাহাদুরের গলায় আগেকার সতেজ ভাব নেই। প্রায় চুপি চুপি তিনি বললেন, বণ্ড সম্পর্কে আমায় বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে। কোন রকম আইনের খচাখচির মধ্যে আমি যেতে চাই না। তাছাড়া এইভাবে চলে গেলে লকারের ত্রিশ হাজার টাকার গয়না তোমার হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

যাক। আমি আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই কুমার বাহাদুর। দুজন লোক আমার পিছু লেগে রয়েছে। সুকুমারকে তো দেখেছেন? আমার সেই প্রাক্তন প্রেমিক। সে আমার মুখ অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়। আর আছেন মধুসূদন গুপ্ত। শুনলে অবাক হবেন, তিনি আমার স্বামী। চাবকে আমার পিঠ ফাটিয়ে দেবার জন্যে তিনি তৎপর হয়ে রয়েছেন। আর আছে মৃগাঙ্ক ঘোষের এক বিরক্তিকর প্রস্তাব। এই সমস্ত কিছুর হাত থেকে এখন একমাত্র আপনি আমাকে রক্ষা করতে পারেন।

রক্তিমার প্রতিটি শব্দে আকুল কাকুতি ছিল।

আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর গম্ভীর মুখে সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ার রিঙ রচনা করবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, সমস্ত পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখতে হবে! পথ একটা বেরুবেই। ও-কথা এখন থাক,

আজকের এই সুন্দর রাত অনর্থক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বুলবুলি। আমরা আর বোকামিকে প্রশ্রয় দেব না।—তিনি রক্তিমার দিকে অগ্রসর হলেন।

মৃগাঙ্ক ফিরে এলেন দিন দুয়েক পরে।

তার পরিকল্পনা মত এক পা-ও রক্তিমা অগ্রসর হয়নি জেনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সিলভার অ্যারো হেটেলে গিয়ে দুজনের সঙ্গে সাক্ষাত করবার কোন উৎসাহ বোধ করলেন না। বকাঝকা করলেন খানিক রক্তিমাকে। তারপর টেলিফোনের ডায়েল ঘুরিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

রক্তিমা একটা কথাও বলল না।

গুরুতর ঘটনাটা ঘটল দিন দুয়েক পরে।

মৃগাঙ্ক ঘোষের পাশের বাড়িটায় বাসা বেঁধেছেন এক সিন্ধ্রী পরিবার। বাড়ির কর্তার হাঁপানি আছে। রোগের জ্বালায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন না, জেগেই কেটে যায় রাতের পর রাত।

টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই পড়ছিলেন। হঠাৎ মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ চিৎকার তাঁকে সচকিত করে তুলল। তিনি ডেকচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই দ্বিতীয়বার চিৎকার কানে এল। পাশের বাড়িতে গুরুতর কিছু ঘটেছে বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কারণ অনুসন্ধান কববার জন্যে ব্যস্ত হলেন।

কাউকে ডেকে তোলবার জন্যে পাশেব ঘরে যাবার আগেই তাঁর বড়ছেলে এ-ঘরে এল—সেও শুনেছে চিৎকার। দুজনে গায়ে জামা-কাপড় চাপিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন। অন্যান্য বাড়ি থেকে আরো কয়েকজন বেরিয়ে এসেছিলেন। সকলে দেখলেন, অন্ধকারে ডুবে রয়েছে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাংলো। আর কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বাইরের ঘরের খোলা দরজার পাল্লা দুটো আছড়ে আছড়ে পড়ছে হাওয়ার ঝোঁকে চৌকাঠের ওপর। সকলের মনে সন্দেহ জট পাকাতে লাগল।

চিৎকারে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল, অথচ বাড়ির দুজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না—সন্দেহের বিষয় বৈকি। কিন্তু কেউ সাহস করে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চাইলেন না। জল্পনা-কল্পনা চলল; শেষে স্থিব হল, পুলিশে খবর দেওয়া হল যুক্তিযুক্ত।

থানা বেশি দূরে নয়, দুজন উৎসাহী ভদ্রলোক ছুটলেন থানার উদ্দেশ্যে। থানা ইনচার্জ প্রথমে আসতে চাননি। চিৎকারটা কিছুই নয়, শোনবার ভুল হতে পারে। অনেক যুক্তিতর্ক অবতারণা করবার পর তিনি কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে এলেন।

মৃগাঙ্ক ঘোষের নাম ধরে কয়েকবার ডাকাডাকি করা হল। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ইন্সপেক্টর সকলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে কনস্টেবলদের সঙ্গে

নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। অন্ধকারের মধ্যে পথ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে টর্চের সাহায্য নিতে হল। প্রথম ঘরখানায় কেউ নেই। দ্বিতীয়টায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

থমকে দাঁড়ালেন না বলে, দাঁড়াতে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে এলেন বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয়। অভূতপূর্ব মর্মান্তিক দৃশ্য তাঁর চোখের ওপর ধরা পড়েছে। তিনি দেখলেন, একজন মহিলা মেঝের কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তার মুখের মাংস কে যেন খুবলে নিয়েছে। দগদগ করছে—রক্তের মত লালচে কাথ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

শুধু মর্মন্তুদ নয়, বীভৎস! দশ বছরের চাকরি-জীবনে ইন্সপেক্টর এ-রকম দৃশ্য দেখার সুযোগ পাননি। হকচকিয়ে গেলেন—অবশ্য পরমুহূর্তে তিনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করলেন। টর্চ ঘুরিয়ে আলোর সুইচবোর্ড খুঁজে বার করলেন। আলো জ্বালালেন। আলোয় ঘর ভরে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন মহিলাটির দেহে প্রাণ নেই।

মুখের বীভৎস অবস্থার জন্যে যে মৃত্যু হয়েছে,তা মনে হল না ইন্সপেক্টরের। বুকের কাছের শাড়ির ওপর কালচে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। দেখলে মনে হয়, ওখানে গুলি লেগেছে! পরীক্ষা না করে যদিও জোর দিয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না—গুলি লেগে থাকলে মৃত্যু ওতেই হয়েছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু গৃহকর্তা কোথায়? এই মেয়েটিই বা কে? গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে বডি এখান থেকে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত কিনা চিন্তা করে দেখলেন ইন্সপেক্টর। মনের মধ্যে নানা সন্দেহ ওঠা-নামা করতে লাগল। তিনি গৃহকর্তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন।

ভালো করে ভোর হয়নি তখনো।

সিলভার অ্যারো হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জি পাশ ফিরে শুলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শুতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এই সাত সকালে কোন কাজ থাকে না। কাজেই আরো ঘণ্টা আড়াই বিছানার উষ্ণতা উপভোগ করতে বাধা নেই। ওয়াড-পরানো কাঁচা লোমের ভারি কম্বলটা ভালো করে টেনে নিলেন গায়ের ওপর।

মিনিট দশেক বোধ হয় কেটেছে,---দরজায় করাঘাত হল।

বিরস মুখে চোখ খুললেন মুখার্জি, কিন্তু উঠলেন না। দরজায় করাঘাত দ্রুত হল। আর উপেক্ষা করা চলে না। আগন্তুকের মুণ্ডপাত করতে করতে তিনি উঠলেন। ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে দিতেই একটা ভয়চকিত বয়ের মুখ দেখতে পেলেন তিনি।

কি চাই?

স্যার, পুলিশ এসেছে...

কপালে ভাঁজ পড়ল মুখার্জির। দ্রুত গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, পুলিশ! কেন—?

বলতে পারছি না স্যার। কোতওয়াল সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ঘর থেকে বেরিয়ে দিলীপ মুখার্জি পার্লারে এলেন। জনকয়েক কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন ইন্সপেক্টর রাজবীর চৌহান। তাঁর মুখে অস্থিরতার ছাপ। ঘনঘন সিগারেট টানছেন।

দিলীপ মুখার্জিকে দেখে তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় এই হোটেলের ম্যানেজার?

ওনার এবং ম্যানেজার দুই-ই। কি ব্যাপার বলুন তো ইন্সপেক্টর, এই শেষ রাত্রে আমার হোটেলে হানা দিয়েছেন?

অহেতুক কাউকে বিরক্ত করা আমাদের পেশা নয় মশাই। কাজেই এসেছি। সুকুমার রায় নামে আপনার কোন বোর্ডার আছে?

আছেন। আমি কিন্তু আপনার আগমনের উদ্দেশ্য এখনো বুঝতে পারিনি—

একটা খুনের তদন্তে এসেছি; এই সম্পর্কে সুকুমার রায়কে আমার দরকার। ঘরখানা দেখিয়ে দিন।

তাঁকে অনুসরণ করে পুলিশবাহিনী সুকুমারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় কয়েকবার জোরে জোরে ধাক্কা মারলেন রাজবীর। চোখ কচলাতে কচলাতে সুকুমার দরজা খুলে দিল। পুলিশ দেখে সে হতভম্ব।

ইন্সপেক্টর ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রশ্ন করলেন গম্ভীর মুখে, আপনার নাম সুকুমার রায়?

হ্যাঁ।

রক্তিমাদেবী নামে কাউকে চিনতেন?

চিনতাম মানে...

মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়িতে আপনার যাতায়াত ছিল?

বার দু-তিন গেছি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ভোরবেলা এসে আমায় এই সমস্ত প্রশ্ন করছেন কেন?

সমস্ত কিছু এখুনি বুঝতে পারবেন। তিনি খুন হয়েছেন। ব্রুট্‌লি মার্ডার্ড।

স্তম্ভিত হয়ে যায় সুকুমার। দরজার পাল্লা ধরে নিজেকে সামলে নেয় কোন রকমে। খুন হয়েছে! ঘটনা যে এতদূর গড়াবে, শুনেও বিশ্বাস করতে মন চায় না।

অসংলগ্ন গলায় সুকুমার বলল, খুন হয়েছে! আমি তো...

বুকে গুলি লেগেছে ভদ্রমহিলার। তাছাড়া হত্যাকারী অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

তাই নাকি! কি ভয়ানক! কিন্তু আপনাবা আমাব কাছে কেন এসেছেন বলুন তো?

রাজবীর চৌহান কথা বলছিলেন আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন সুকুমারকে। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। মুখের প্রতিটি রেখায় যেন নার্‌ভাস্‌নেস্‌।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আপনাকে থানায় যেতে হবে।

কেন, আমায় থানায় যেতে হবে কেন?

আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আপনি জড়িত বলে আমরা সন্দেহ করছি।

হাউ ডেয়ার ইউ ইন্সপেক্টর...!

সুকুমার ঘরের মধ্যে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোককে অযথা হয়রান করবার অধিকার আইন আপনাকে দেয়নি...

আইনকে সঠিক পথে চালিত করাই হল আমাদের কর্তব্য। নিজেব কর্তব্য সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সচেতন। সময় নষ্ট কবে কোন লাভ নেই। যেতে আপনাকে হবেই। আপনার বক্তব্য থানায় গিযে বলবেন। আরেকটা কথা, আত্মপক্ষ সমর্থন করার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা আপনাকে যথা সময় দেওয়া হবে। আসুন...

অসংখ্য প্রতিবাদ সুকুমারের মনেব মধ্যে তোলপাড় করছিল। একি অবিচার! দু-চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেবাব দুর্বার লোভ সংবরণ করা কষ্টকর হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করল সে।

আমি স্লিপিং ড্রেস বদলে নেবার সুযোগ পাব কি?

নিশ্চয়।

সুকুমার জামাকাপড় বদলে চৌহানের সঙ্গে থানায় গেল।

সেখানে গিয়ে বুঝতে পারল, তার অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন। মৃতদেহের পাশে তার ট্রেনের পাশ সমেত পার্সটা পড়েছিল। তাছাড়া সে যে ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খায়, তারও একটা টুকরো পাওয়া গেছে। অ্যাসিডের ভাঙা বোতল পড়েছিল বাগানে। বোতলের গায়ে হাতের ছাপ আছে। তার সঙ্গে সুকুমারের হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখা হবে। পুলিশের ধারণা, মিলে যাবে।

মনের মধ্যে আর জোর খুঁজে পাচ্ছে না সুকুমাব। অসম্ভব ভয় করছে। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত গড়ে উঠেছে। কে তাকে এই ভাবে জড়াল? রক্তিমার ওপর প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা মনের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই; পরিকল্পনাও দানা বেঁধেছিল। কিন্তু...

নটার কিছু পরে ডি-এস-পি হেড কোযার্টার থেকে নৈনিতালে এলেন। অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত করে তুললেন সুকুমারকে।

এক রকম চুপ করেই ছিল সুকুমার; শেষে বলল, আপনি মিথ্যে পরিশ্রম করছেন। আইনজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ না কবে আমি কোন কথা বলব না। শুধু

এইটুকু জেনে রাখুন, খুন আমি করিনি, ও সম্পর্কে কিছু জানিও না।

তিনদিন কেটে গেছে।

সুকুমারের চোখে ঘুম নেই। হাজতের মধ্যে অবিরাম পায়চারি করে চলেছে সে। কি কুক্ষণে নৈনিতালে এসেছিল বেড়াতে। আর কি কুক্ষণে মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল! ঘোষের সঙ্গে আলাপ না হলে রক্তিমার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। মনের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুনও জ্বলে উঠত না তাহলে। এই বিপত্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না সুকুমারকে।

আর কয়েক দিনের মধ্যে কেস আরম্ভ হবে লক্ষ্ণৌ-এ। পুলিশ তার বিরুদ্ধে কেশ ভালোই সাজিয়েছে। প্রমাণগুলি হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। মৃতদেহের পাশে পার্স পাওয়া ছাড়া, অ্যাসিডের ভাঙা বোতলের ওপরকার ছাপের সঙ্গে তার হাতের ছাপের অবিকল মিল হয়েছে।

আত্মীয় বান্ধবহীন বিদেশে এই ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সুকুমারের এক এক সময় ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তাকে চিঠি লেখবার অনুমতি দিয়েছেন। প্রচুর চেষ্টা করেও সুকুমার বাড়িতে একছত্র লিখতে পারে নি। মা ও দাদাদের মনে কষ্ট দিতে তার বিবেকে বেধেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

সুকুমার এটুকু বুঝতে পেরেছে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে নিজেকে বাঁচানো যাবে না। চক্রান্তকারীকে প্রকারান্তরে সহযোগিতা করে যাওয়া হবে বলা চলে। কিভাবে তার ট্রেনের পাশ সমেত পার্স মৃতদেহের পাশে গেল, অ্যাসিডের বোতলে কিভাবে হাতের ছাপ পড়ল—এ সমস্ত কথা ভেবে সময় নষ্ট করা আর বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কিছু করতে হবে—এখুনি কিছু করতে হবে।

অনেক চিন্তার পর সুকুমার দেখল, তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে তাকে এগোতে হবে। প্রথম ঃ একজন ভালো আইনজ্ঞ নিযুক্ত করা। দ্বিতীয় ঃ যে কোন উপায়ে বেলের ব্যবস্থা করা। তৃতীয় ঃ মোকদ্দমা চলাকালীন প্রাইভেট এন্‌কোয়ারি করিয়ে প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান করা।

প্রাইভেট এন্‌কোয়ারি করানোর বিষয় মনে দানা বাঁধার একটা বিশেষ কারণ আছে। সুকুমার জামালপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কসপে কাজ করে। সাধন বন্দ্যোপাধ্যায় তার কলিগ নয়। কয়েক ধাপ ওপরে কাজ করে; কিন্তু দুজনের মধ্যে হৃদ্যতা আছে। সাধনের মুখে সে বহুবার ওর বাল্যবন্ধু প্রখ্যাত গোয়েন্দা বাসবের গল্প শুনেছে। বাসব যেবার জটিল এক খুনের তদন্ত নিয়ে জামালপুর এসেছিল, সাধনের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল সুকুমারের সঙ্গে। সামান্য আলাপ।

এই বিপদ থেকে বাসব তাকে উদ্ধার করতে পারে। ঠিকানা জানা নেই; আর জানা থাকলেও তার অনুরোধ রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। সুতরাং সাধনের সাহায্য নেবে সুকুমার। কালবিলম্ব না করে দীর্ঘ এক চিঠি লিখল সাধনকে।

নিজের বর্তমান সঙ্কটের কথা পরিষ্কার করে লিখল। এ-কথাও লিখল, এই সঙ্কট থেকে তাকে বাসব ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। তাঁকে নিয়ে সাধন যেন অবিলম্বে চলে আসে। তার জীবনমরণ নির্ভর করছে সাধনের ব্যবস্থাপনার ওপর।

চিঠিখানা এক্সপ্রেস করে পাঠিয়ে দিল সুকুমার।

দুশো একচল্লিশের কে হ্যাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমের দেওয়াল ঘড়িতে তখন সশব্দে আটটা বাজছে। বাসব সোফায় আড় হয়ে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, ম্যাগাজিন রেখে সোজা হয়ে বসল।

প্রায় দু-ঘণ্টা একই ভাবে বসে আছে এখানে। শুধু এখন নয়, এক সপ্তাহ অলসের মত সময় কাটিয়ে চলেছে ও। তদন্তে গিয়েছিল বহরমপুর। তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ফিরে আসবার পর হাতে কোন কাজ না থাকায় আলস্যের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

শৈবাল থাকলে অবশ্য এত একঘেয়ে মনে হত না। গল্প-গুজবে সময় ভালোই কাটত। বর্তমানে সে কলকাতায় নেই, মেডিক্যাল কনফারেন্স উপলক্ষে হায়দ্রাবাদ গেছে। তার ফিরতে এখনো দিন পাঁচেক তো বটেই।

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার বার করে পাইপে ভরল। আজকাল সিগারেট ছেড়ে দিয়ে ও পাইপ ধরেছে। এই পরিবর্তন যে নিজের ইচ্ছায় হয়েছে, তা কিন্তু নয়। শৈবালের মুখ্য ভূমিকা ছিল।

সে হাসতে হাসতে বলেছিল একদিন, তোমার অভদ্রতায় সময় সময় আমি বেশ লজ্জা পাই।

বাসব সকৌতুকে উত্তর দিয়েছিল, সেকি ডাক্তার। সকলে তো আমায় ভদ্রতার অবতার মনে করে!

ওই আনন্দ নিয়েই থাকো। আমার অভিযোগ হল সকলের সামনে তোমার অভদ্রের মত সিগারেট খাওয়া নিয়ে।

তোমার আজগুবি অভিযোগ। আমি কি স্কুল-পালানো এপ্রেন্টিস সিগারেটখোর নাকি যে সকলের চোখ বাঁচিয়ে ধোঁয়া ছাড়ব!

তা নয়। তুমি হয়তো একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিগারেট বার করে নিজেই ধরালে, তাকে অফার পর্যন্ত করলে না। অথচ তুমি জানো যে ভদ্রলোক ধূমপায়ী। প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার এই অসামাজিকতা আমি লক্ষ্য করে আসছি।

ঘর ফাটিয়ে হেসেছিল বাসব; হ্যাঁ, এই বদ অভ্যাস আমার আছে, স্বীকার করছি। সামনের লোককে অফার না জানিয়ে নিজে সিগারেট ধরানো অভব্যতা বৈকি! কি করা যায় বলো তো?

সিগারেট ছেড়ে দাও।

তা হয় না ডাক্তার। এতদিনেব অভ্যাস..

আমি তোমাকে সিগারেট ছাড়তে বলেছি; ধূমপান করতে নিষেধ করিনি তো।

অর্থাৎ...

পাইপ ধরো।

পাইপ ধরব!

তোমার মত লোকের পক্ষে ওই ভালো। সিগারেটের মত পাইপ তো আর অফার করা চলে না। ধোঁয়া ছাড়াও হল, সামাজিকতাও বজায় রইল।

সেই থেকে বাসব পাইপ ধরেছে।

পাইপে ঘনঘন গোটা কয়েক টান দিয়ে বাসব বাহাদুরকে ডেকে কফি আনতে বলল। নাইট শোতে লাইট হাউসে যাবে কিনা চিন্তা করতে লাগল।

বাহাদুর তখনো কফি নিয়ে আসেনি, টেলিফোনেব তীব্র ঝনঝনানি শোনা গেল। ভ্রূ-কুঁচকে উঠল বাসবের। ট্রাঙ্ক-সিগন্যাল!

কে আবার ট্রাঙ্ককল করছে?

বাসব সোফা থেকে উঠে রিসিভার তুলে নিল।

অপারেটার জানাল, জামালপুর থেকে একজন কথা বলতে চান।

হ্যালো...

বাসব...আমি সাধন...

বাই জোভ...কি খবর?

বিশেষ একটা অনুরোধ জানাব। ভরসা আছে তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।

স্বভাব একটুও বদলালো না! ভনিতা না করে কি হয়েছে পরিষ্কার করে বলো!

আমার এক অতি পরিচিত ছেলে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছে। হ্যালো...এখন তুমি তাকে বাঁচাতে পারো—

ঘটনাটা কি?

আমি বিশদ ভাবে কিছু জানি না। ঘটনাটা ঘটেছে নৈনিতালে। তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েই তোমাকে ফোন করছি।

হ্যালো...সাধন, আমার একটু অসুবিধা হবে ভাই। একে নৈনিতাল, তায় আবার ডাক্তার এখানে নেই। তুমি তো জানো, একলা বাইরে বড় একটা আমি যাই না।

এড়িয়ে গেলে চলবে না, কেসটা তোমার হাতে নিতেই হবে। নইলে একজন প্রমিশিং ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। শৈবালবাবুর অনুপস্থিতির কথা তুলছো, আমি পাশে থাকলে তোমার কি বিন্দুমাত্র উপকার হবে না? পেমেন্টের কথা ভেবো না, তোমার দাবি সুকুমার নিশ্চয় পূরণ করতে পারবে।

বাসব দ্রুত চিন্তা করল। শুয়ে বসে সময় কাটছে কলকাতায়, কাজ নিয়ে নৈনিতালে কয়েকদিন কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না।

হ্যালো...সাধন পেমেন্টটা সব সময় আমার কাছে বড় কথা নয়। বেশ, কেসটা নিলাম। সম্ভব হলে তুমি আজই নৈনিতাল রওয়ানা হয়ে যাও। আমি যাতে নির্বিঘ্নে তদন্ত চালাতে পারি, পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার ব্যবস্থা করে রাখবে। আমি কাল রওয়ানা হচ্ছি। ওখানকার ঠিকানা বলো?

তুমি আমার মুখ রাখবে জানতাম। তোমার কথা মতই কাজ হবে। ওখানকার সিলভার অ্যারো হোটেলে তোমার জন্য ঘর বুক করে রাখব। ছেড়ে দিচ্ছি। গুডনাইট মাই ডিয়ার।

সাধন লাইন কেটে দিল।

বাসব হাই তুলতে তুলতে আবার সোফায় ফিরে এলো।

বাহাদুর সেন্টার টেবিলের ওপর কফি রেখে গেছে।

নৈনিতালে পা দেবার ঘণ্টা তিনেক পরে বাসব সাধনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেল। ইতিমধ্যে অবশ্য বেসরকারী তদন্তের অনুমতি নিয়ে রাখা হয়েছিল। রাজবীর সহজভাবে বাসবকে গ্রহণ করলেন বলে মনে হল না। তিনি বাসবকে নিজের বিপক্ষে বোধ হয় দাঁড় করিয়েছেন।

সুকুমারকে তাঁরা হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ সেই ব্যক্তিকে নিরপরাধ প্রমাণিত করবার জন্যে বাসব এখানে এসেছে। সুতরাং বাসবের যতই খ্যাতি প্রতিপত্তি থাক না কেন, তাকে সহজভাবে রাজবীর কখনই গ্রহণ করতে পারেন না। অবশ্য মৌখিক ভদ্রতা তিনি বজায় রেখে চলেছেন।

বাসব দাঁতে পাইপ চেপে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। গুলি একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে মাংস ভেদ করেছে। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় নি, রিবে আটকে ছিল। গুলি করা হয়েছে অন্তত হাত আষ্টেক দূর থেকে! গলায় গোটা কয়েক গভীর দাগ আছে—আঙুল দিয়ে চেপে ধরার দাগ।

অ্যাসিডের জন্যে মুখ সম্পূর্ণ গলে গিয়েছিল। চেনবার কোন উপায় ছিল না। অনুমান করা গেছে, গুলি না লাগলেও অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ভদ্রমহিলা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মারা যেতেন।

বাসব রিপোর্টটা টেবিলের ওপর রেখে রাজবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, ভারতের নানা প্রান্তে অনেক জটিল রহস্যের সমাধান করতে আমাকে যেতে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। আশা করি, আপনি তাঁদের পদ অনুসরণ করবেন।

গলা খাঁকারি দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, উপরওয়ালাও আমাকে এই আদেশ দিয়ে রেখেছেন। কি ধরনের সহযোগিতা চান বলুন? তবে এটুকু বলতে পারি, অত্যন্ত সহজ কেস। নতুন করে আপনার কিছু করবার নেই।

সুকুমারবাবু যে হত্যাকারী—এ-সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিন্ত?

ঘটনাটা আগাগোড়া শুনলে আপনিও আমার সঙ্গে একমত হতেন।

এই বন্ধুর মুখে মোটামুটিভাবে শুনেছি সব। সুকুমারবাবুর পার্স মৃতদেহের পাশে পড়েছিল, আপনাদের প্রথমে সন্দেহ হয় এই কারণে?

হ্যাঁ।

এমন তো হতে পারে, তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যে কেউ এইভাবে ব্যাপারটা সাজিয়েছে?

অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করতে গিয়েও চৌহান নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, আমরা কাঁচা কাজ করি না মিস্টার ব্যানার্জি। অ্যাসিডের বোতলের গায়ে সুকুমারবাবুর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। এটা নিশ্চয় অন্যের কারসাজি হতে পারে না?

পাইপ নিভে গিয়েছিল, ধরিয়ে নিল বাসব! একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আপনাদের হাতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে দেখা যাচ্ছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পর আপনি কি করলেন? জানবার অত্যন্ত আগ্রহ হচ্ছে।

আমার যা করা সঙ্গত, তাই করলাম। গৃহকর্তা মৃগাঙ্ক ঘোষের অনুসন্ধান করলাম। তাঁকে বাগানের বাউণ্ডারি-ওয়ালের পাশে পড়ে থাকতে দেখা গেল। রক্তাক্ত কপালে মূর্ছিত অবস্থায় তিনি ছিলেন। জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তাঁকে চাঙ্গা করে তুললাম। ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রান্ত হওযা ছাড়া, এখানে কিভাবে এলেন বলতে পারলেন না। আমি রক্তিমা দেবীর খুন হওয়ার কথা বলতে তিনি ভেঙে পড়লেন। মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা-পার্সটা তাঁকে দেখালাম। ট্রেনের পাশে নাম লেখা ছিল। নাম শুনে মৃগাঙ্কবাবু সুকুমার রায়েব বর্তমান ঠিকানা বলে দিলেন। সিগারেটের টুকরোটাও চিনতে পারলেন তিনি। তারপর আমরা হোটেলে গিয়ে আসামীকে গ্রেপ্তার করলাম।

মৃগাঙ্ক ঘোষ নিজের আক্রমণকারীকে দেখতে পেয়েছিলেন?

না। বুকের ওপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করায় তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেওয়ার আগেই মাথায় আঘাত পান।

রক্তিমাদেবীকে খুন করার কি মোটিভ থাকতে পারে সুকুমার রায়ের, ভেবে দেখেছেন কি?

এর সহজ সমাধান তো চোখের ওপর রয়েছে—মেয়েটির চরিত্র ভালো ছিল না। নিশ্চয় সে প্রলুপ্ত করেছিল সুকুমাবকে। তারপব কোন কারণে আমল দেয় নি। এসব ক্ষেত্রে যা হয়—আসামী ক্রুদ্ধ হয়ে কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে।

আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক। আর বিরক্ত করব না। শুধু সুকুমারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিন।

সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হল।

বাসব অনেক সান্ত্বনা দিল সুকুমারকে। প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিল সমস্ত ঘটনা। সুকুমার কিছু বাদ দিল না, মধুসূদনের সঙ্গে সাক্ষাত, মৃগাঙ্ক ঘোষের

সঙ্গে আলাপ, তিনজনের ব্যক্তিগত জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী. বঙ্কিমাকে ভয় দেখানো ইত্যাদি সমস্ত বলে গেল।

বাসব একাগ্র মনে শুনে যাবার পর বলল, আপনার পার্স দুর্ঘটনার স্থলে কিভাবে গেল, মনে করতে পারছেন?

না।

কোথায় রাখতেন?

ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে।

অ্যাসিডের বোতলটা?

খাটের তলায়।

এ-কথা কেউ জানতো?

অ্যাসিডের বোতলের কথা কেউ জানত না। দেরাজে পার্স রাখতাম মধুসূদন জানতেন। হোটেলের ম্যানেজার আর মৃগাঙ্কবাবুও বোধ হয় ওখানে পার্স রাখতে দেখে থাকবেন।

সেদিন রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন?

বিকেলে বেড়িয়ে ফিরি সাতটার সময়; তারপর থেকে নিজের ঘরেই ছিলাম ভোর পর্যন্ত।

আচ্ছা মিষ্টার রায়, এই ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

সন্দেহ? কাকে সন্দেহ করব বলুন? কে যে এইভাবে আমাকে বিপদে ফেলল ভগবান জানেন। মাঝ থেকে আমার কেরিয়ার গেল, আমিও গেলাম।

মনকে শক্ত করুন, ভেঙে পড়বেন না। নিরপরাধ হলে আপনাকে নিশ্চিতভাবে বাঁচাতে পারব জানবেন।

সুকুমারের কাছ থেকে বাসব ও সাধন বিদায় নিল।

সুকুমারের কাছ থেকে ফিরে এসে কোন কথা বলেনি বাসব। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে ধোঁয়ার জাল বুনে চলেছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

বহু কষ্টে সিলভার অ্যারো হোটেলে এই ঘরখানা সংগ্রহ করেছে সাধন। সেও নিজের তল্পিতল্পা নিয়ে বাসবের সঙ্গে অবস্থান করছে। সাধন ঘুমিয়ে পড়েনি, নিজের বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে ঘনঘন নস্যি নিচ্ছে আর এধার-ওধার তাকাচ্ছে।

এক সময় বাসবের পাইপ নিভে গেল। আড়মোড়া ভাঙল ও।

সাধন বলল, কূল-কিনারা কিছু পেলে?

সকলের সঙ্গে কথা বলা আগে শেষ করি, তবে তো কূলের দিকে যাবার চেষ্টা করব। আমি যতদূর শুনেছি, তার মধ্যেকার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আচ্ছা সাধন, তুমিও তো আমার সঙ্গে ছিলে, খুন সম্পর্কে তোমার

অভিমত কি?

আমি তো চারধারে ঘন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলব, পুলিশ খুনের যে মোটিভ খাড়া করেছে, তা আমার জোরালো বলে মনে হচ্ছে না।

কারেক্ট! মজার কথা কি জানো, এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে যা স্থূল বিষয়, তাকে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বললে অবশ্য ঠিক হবে না। আমি বলতে চাই, পুলিশ ভাইটাল বিষয়টিকে আদপেই লক্ষ্য করেনি।

বিস্মিত গলায় সাধন বলল, তুমি কোন্ বিষয়কে মিন করছ?

বাসব বিছানায় উঠে বসল।—গুলি মারা এবং অ্যাসিড দিয়ে মুখ ঝলসে দেওয়ার কথা বলছিলাম।

ধরতে পারছি না তোমার কথা।

বুঝিয়ে বলছি। ধর, তুমি একজনকে খুন করতে চাও। তখন তোমার প্রধান কাজ হল, যে-কোন অস্ত্র দিয়ে তার প্রাণ নেওয়া, নয় কি? তুমি নিশ্চয় তার মুখ প্রথমে অ্যাসিড দিয়ে ঝলসে দিয়ে প্রাণ নেবে না। প্রাণ নেওয়াই যখন উদ্দেশ্য, তখন মুখ বিকৃত করে দেওয়ার অর্থ কি? যদি ধরে নেওয়া যায়, তার মুখের চেহারা বীভৎস করে দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য ছিল। তবে প্রশ্ন উঠবে, তুমি তাকে গুলি করবে কেন? রক্তিমার মুখও বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে, আবার গুলিও করা হয়েছে—গুরুতর সন্দেহজনক ব্যাপার নয় কি?

তাই তো!

দূর থেকে গুলি করে হত্যাকারী সরে পড়বে, তা নয় কাছে গিয়ে তার মুখে অ্যাসিড ফেলে এত কাণ্ডকারখানা করবার কি দরকার ছিল?

কারণ আছে নিশ্চয়।

কারণ তো আছেই। আবার আরেকটা বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে, অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়েছিল আগে, না গুলি করার পরে।

এই সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

নিশ্চিত অভিমত দেওয়া এই মুহূর্তে কষ্টকর। এটুকু বলতে পারি, এ ব্যাপারে কয়েক রকমের অর্থ হতে পারে। যেমন, যে কোন কারণেই হোক, হত্যাকারী চায়নি, খুন হওয়ার পর রক্তিমার আসল মুখ কেউ দেখুক। কিম্বা মুখ বিকৃত করে দিয়ে পুলিশকে ধাঁধায় ফেলেছে হত্যাকারী। ওই মৃতদেহটা হয়তো রক্তিমার নয়, অন্য কারুর!

সাধন হতবাক, বলো কি!

কিছুই অসম্ভব নয়। আবার এমনও হতে পারে, আমি যা চিন্তা করছি প্রকৃত ব্যাপারের রূপ সম্পূর্ণ অন্য।

বাসব পাইপ ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, অভিজ্ঞতা তো কম হল না। দেখেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাকারীদের মনস্তত্ত্বে অদ্ভুত মিল। সত্যি

কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রে এই মিলটুকু আমাকে পথ নির্দেশ করে দিয়েছে। দেখা যাক, এখানকার জল কতটুকু গড়ায়।

আজ পর্যন্ত কোন তদন্তে তুমি কি অসফল হয়েছ?

না। আমার কাছে এ কিন্তু শ্লাঘার কথা নয়। চোখ-কান খুলে রাখলে যে-কোন মানুষ, যে কোন তদন্তে সাফল্য লাভ করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। ও কথা যাক। সাধন, তোমাকে এখুনি একটা কাজ করতে হচ্ছে।

বলো?

হোটেলের ম্যানেজার—কি যেন নাম ভদ্রলোকের? ডেকে নিয়ে এস তাঁকে একবার।

বেশ তো।

সাধন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

বাসবের মত বিখ্যাত একজনকে বোর্ডার পেয়ে দিলীপ মুখার্জি বেশ গর্বিত ছিলেন। সাধন গিয়ে বলতেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি ওপরে চলে এলেন।

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করে বলল, আপত্তি না থাকলে আপনার কয়েক মিনিট সময় আমি নষ্ট করব মিষ্টার মুখার্জি।

ওভাবে বলবেন না। আপত্তি কিসের?

গোটা কয়েক প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নগুলি অবশ্য রক্তিমাদেবীর খুন হওয়া সম্বন্ধীয়।

দিলীপ মুখার্জি যেন থতমত খেলেন। ও বিষয়ে আমি আর কি বলতে পারি। মানে...আমার তো কিছু জানবার কথা নয়!

আপনি নার্ভাস হবেন না মিস্টার মুখার্জি। আমি পুলিশের লোক নই, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তাছাড়া আমি এমন কোন প্রশ্ন করব না, যা আপনার জানা নেই।

বলুন?

বাসব নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলি কাটল। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্নগুলো সাজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল, সুকুমার রায়কে আপনি সত্যি হত্যাকারী বলে মনে করেন?

আমার মনে করাতে কি যায়-আসে বলুন? তবে ছেলেটিকে দিন পনেরো ধরে ক্রমাগত দেখে মনে হয়েছিল, সে শান্ত ও সংযত চরিত্রের।

তার মানে, সুকুমারকে আপনি হত্যাকারী হিসেবে ভাবতে পারছেন না। রক্তিমাদেবীকে চিনতেন?

না; নাম শুনেছিলাম।

কার কাছে নাম শুনেছিলেন?

আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুর তার ওপর ইন্টাররেস্টেড ছিলেন।

ও! মৃগাঙ্ক ঘোষ সম্বন্ধে কি জানেন?

বেশি কিছু জানি না, ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মুখ চেনাচিনি আছে। সুকুমারবাবু ও মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে গল্প-গুজব করবার জন্যে তিনি হোটেলে যখন-তখন আসতেন। বেশ অমায়িক লোক।

ওঁদের তিনজনের মধ্যে এত কি গল্প-গুজব হত, ও সম্পর্কে বোধ হয় কিছু বলতে পারেন না?

না মশাই।

বাসব পাইপ ধরাল।—আচ্ছা, এখানকার বাজার কেমন? টুরিস্টদের প্রলুব্ধ করবার মত জিনিসপত্র ছাড়া অনেক আন্‌কমন জিনিসও পাওয়া যায় কি? ধরুন, আমি যদি এক বোতল অ্যাসিড কিনতে চাই।

বড় বড় শহরের মত বাজার এখানে নেই। একটা কাপড়-কাটা কাঁচি কিনতে চাইলে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে। সুকুমারবাবুরও এক বোতল অ্যাসিডের দরকার হয়েছিল, আমার একজন কর্মচারী লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁকে এনে দেয়।

মধুসূদনবাবুর কিছু দরকার হয়নি?

দরকার..মানে...

কিছু লুকোবেন না দিলীপবাবু।

না, না লুকোতে যাব কেন! আমি একটা রিভলবার সংগ্রহ করে দিতে পারি কিনা মধুসূদনবাবু একদিন জানতে চাইছিলেন।

বলেন কি? রিভলবার! সে সময় কি তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন?

দিলীপ মুখার্জি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললেন, উত্তেজিত বৈকি! আমি কাউন্টারে ছিলাম; অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়—বলতে পারেন রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে থেকে এসেই আমাকে বললেন, আমাকে একটা রিভলবার সংগ্রহ করে দিতে পারেন? যা টাকা লাগে দেব। আমি তো অবাক। বললাম, আমি রিভলবার পাব কোথা থেকে? তিনি গলায় জোর দিয়ে বললেন, হোটেলের ব্যবসা করেন, চোরাই গুডসের আড়ত তো আপনাদের কাছে। দু-একটা আমেরিকান রিভলবার কি আর নেই? আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কেউ জানতে পারবে না একথা। তাছাড়া আশাতীত টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।—তাঁর কথায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলাম, এবং সিরিয়াস্‌লি জানিয়ে দিলাম নিজের অক্ষমতা।

মধুসূদন গুপ্তের সঙ্গে আপনার যখন কথা হচ্ছিল, সুকুমার রায় তখন কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে। গুপ্ত হোটেলে প্রবেশ করবার মিনিট কয়েক আগে তিনি ফিরে এসে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন।

আমার প্রশ্নে আপনি অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন বুঝতে পারছি, আর নয়। অনেক ধন্যবাদ!

দিলীপ মুখার্জি বললেন, না, না, সে-রকম নয়; আপনাকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।

ভালো কথা, মধুসূদন গুপ্ত কি হোটেলেই আছেন?

হ্যাঁ। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে এখানে থাকতে বলেছে। তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব কি?

তার দরকার হবে না; শুধু তাঁর রুম নম্বরটা বললেই চলবে।

তেইশ।

দিলীপ মুখার্জি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখে তিনি যাই বলুন না কেন, বাসবের প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্বোয়াস্তি বোধ করছিলেন, এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যেন।

বাসব মৃদু হাসল।

এক টিপ নস্যি নিয়ে সাধন বলল, হাসলে যে?

দেখলে না, ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন। তোমার কি মনে হয়, ভদ্রলোক সমস্ত সত্যি কথা বলে গেলেন?

সত্যি বলেই তো মনে হল। মধুসূদন গুপ্তর রিভলবার প্রার্থনা করাটা কিন্তু বেশ নাটকীয়।

নাটকীয় বৈকি! আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দুবার চিৎকারের আওয়াজ প্রতিবেশীরা শুনতে পেয়েছে, গুলির শব্দের কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

তাই তো!

নিঃসন্দেহে সাইলেন্সার ব্যবহার করেছিল হত্যাকারী, এবং তার লক্ষ্য অব্যর্থ, একটা সটেই সে কাজ সারতে পেরেছে।

সাধন নিজের পাওয়ারফুল লেন্সের চশমা নাকের ওপর থেকে নামিয়ে মুছে আবার পরে নিল। স্বভাবতই সে যে-কোন ব্যাপারকে সিরিয়াস্‌লি গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে চরম উত্তেজনা তার মনে সর্বদা বজায় রয়েছে।

মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে দেখা করবে নাকি?

নিশ্চয়। চল, সাক্ষাৎ পর্বটা এখুনি সেরে ফেলা যাক।

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরুল।

ওদের ঘর থেকে তেইশ নম্বর ঘরের দূরত্ব বেশি নয়, সাতখানা ঘরের ব্যবধান মাত্র। নক্‌ করতেই দরজা খুলে দিলেন মধুসূদন। অসম্ভব গম্ভীর তাঁর মুখ। ক'দিন চুলে তেল পড়েনি। সাজপোশাকে পরিপাট্য নেই।

বাসব নিজের পরিচয় দিল।

মধুসূদন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি এসেছেন আমি শুনেছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তাও জানতাম। আসুন—

বাসব সাধনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে মধ্যে প্রবেশ করে বলল, আপনার স্ত্রীর

এই মর্মন্তুদ মৃত্যুর জন্যে আমি মর্মাহত মিস্টার গুপ্ত।

মধুসূদন চমকে উঠলেন, আপনি...

আমি সমস্তই জানি; সুকুমারবাবু আমাকে বলেছেন। কি বিচিত্র পরিহাস, তাই নয় মিস্টার গুপ্ত? দীর্ঘদিন পরে জীবন অনিষ্টকারিণী স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হল, এবং আপনার চোখের সামনে তিনি খুন হয়ে গেলেন।

চোখের সামনে!—গুপ্ত প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, না, না, একি বলছেন আপনি? আমার চোখের সামনে কিছুই ঘটেনি। আমি তো তখন এই ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম।

আপনি কথাটা ধরতে পারলেন না। চোখের সামনে বলতে আপনার উপস্থিতিতে বোঝাতে চাইছিলাম। এখন আপনার মনে...

আমি ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

বাসব মৃদু হাসল। উপায় নেই; মৃতা আপনার স্ত্রী ছিলেন, সুতরাং ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। সুকুমার রায়কে আপনি সত্যি খুনী বলে মনে করেন?

মধুসূদন অধৈর্য গলায় বললেন, অবান্তর প্রশ্ন! পুলিশের ওপর আমার আস্থা আছে, তাদের অনুমান ভুল হতে পারে না। দেখুন, বর্তমানে মনের অবস্থা ভাল নেই, আমি একলা থাকতে চাই।

আপনার শোচনীয় মনের অবস্থার কথা জেনেও আমি নিরুপায়। আরো গোটা কয়েক প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে পারছি না। মিস্টার গুপ্ত, আমি শুনেছি, আপনি নাকি রিভলবার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলেন?

সেকি! কে বললে?

দিলীপ মুখার্জি।

মধুসূদন গলা সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, মিথ্যে কথা। আমি কেন একথা মুখার্জিকে বলতে যাব? তাছাড়া আমি রিভলবার নিয়ে করবটা কি?—ওহো, খুনী ঠাওরেছেন আমাকেই? আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

বাসব পাউচ থেকে মিক্সচার নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বলল, ইমোশনাল হয়ে পড়বেন না মিঃ গুপ্ত। আমার যে কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনি ইচ্ছে করলে না দিতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, বিপদ তাতে আপনার বাড়বে। আপনাকে বুদ্ধিমান হিসেবে ধরে নেওয়া অন্যায় নয়। আমার কথার গূঢ় অর্থ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

মধুসূদন নিজেকে সামলে নিয়েছেন। শান্ত গলায় বললেন, আমি দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, প্রকৃত ঘটনার কিছুই জানি না আমি। রেবা, মানে আমার স্ত্রী—যাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলাম—হঠাৎ এই নৈনিতালে তার নোংরা জীবন-যাত্রার পরিচয় পেয়ে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। দেখা করেছিলাম তার সঙ্গে। শাসিয়েছিলাম। চাবকে পিঠ লাল করে দিয়ে মনের ঝাল মেটাব বলেছিলাম। গিয়েও ছিলাম একদিন চাবুক নিয়ে। সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে

গেল ওখানে। জানতে পারলাম, সে তার পূর্ব প্রণয়ীব মুখ অ্যাসিড দিয়ে ঝল্‌সে দিতে এসেছে! আমি আর ওখানে দাড়াইনি, চলে এসেছিলাম। তারপর শুনলাম রেবা মারা গেছে। এর বেশি আব কিছু জানা নেই।

সুকুমার কি আপনার সঙ্গে সেদিন চলে এসেছিলেন?

না।

মৃগাঙ্ক ঘোষকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?

যে কোন যৌবনবতীকে সে লোভের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। আমি তাকে ঘৃণা করি।

হুঁ। এখন আমবা চললাম, পরে হয়তো আবার আপনার সঙ্গে কথা বলাব সুযোগ আসবে। এসো সাধন—

সাধনকে সঙ্গে নিয়ে বাসব ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। দিন দুয়েক কেটে গেছে বাসবের নৈনিতালে পা দেবাব পর। ব্যস্ততা বেড়েছে অসম্ভব। ঘণ্টা তিনেক আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছিল এক চাবিওয়ালার সন্ধানে। একলাই বেরিয়েছিল; সাধন হোটেলে ছিল। অবশ্য চাবিওয়ালার সন্ধান করবার আগে কিঞ্চিৎ প্রস্তুতি-পর্ব যে ছিল না, তা নয়।

গতকাল সন্ধ্যায় বাসব নিজের মনে পায়চাবি করছিল; কি ভাবছিল ভগবান জানেন। জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সাধনের আব কিছু কববার ছিল না।

হঠাৎ বাসব বলে উঠল, তুমি বলতে পারো সাধন, নৈনিতালে ক'জন চাবিওযালা আছে?

সাধন আকাশ থেকে পড়ল, চাবিওয়ালা!

হ্যাঁ হে, যারা তালাব চাবিটাবি তৈরি করে, তাদের কথা বলছি।

তোমার ভাই অদ্ভুত প্রশ্ন। এত বড জায়গায় অসংখ্য চাবিওয়ালা আছে, তাদেব সংখ্যা নির্ণয় করা কি সোজা কথা? লাইসেন্স হোল্ডার হলেও না হয় একটা কথা ছিল। ক'জন চাবিওয়ালা এখানে আছে জেনে তোমার কি উপকার হবে শুনি?

বিশেষ উপকার হবে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি; অবশ্য একগাদা চাবিওয়ালা আমার দবকার নেই। দরকার বিশেষ একজনকে। আমার অনুমান, এখানে গোটা তিনেকেব বেশি চাবিওয়ালা নেই।

তোমার অনুমানের নিশ্চয়ই দৃঢ ভিত্তি আছে?

দৃঢ় ভিত্তি বলতে যা মিন করছ, তা নেই স্বীকার করছি। তবে আমার অনুমানকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। নৈনিতাল বিখ্যাত মোটামুটি একটা শহর হলেও স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প। এখানে লোক সমাগম হয় সিজিনে; শীত পড়ার মুখে আবার ফাঁকা। সুতরাং মাত্র তিন-চার মাসের জন্যে অসংখ্য চাবিওয়ালা এখানে ব্যবসা কবতে আসতে পারে না। বিশেষ টুরিস্টদের ঘনঘন

চাবি হারাবে, এমন সম্ভাবনা যখন নেই। বললাম বটে তিনজন আছে, খোঁজ হয়তো দেখা যাবে একজনও নেই।

আমি বুঝতে পারছি না, তুমি চাবিওয়ালা-চাবিওয়ালা করে এমন ক্ষেপে গেলে কেন?

বুঝতে পারবে—ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারবে। চলো, ম্যানেজারের কাছে যাওয়া যাক। তিনি হয়তো এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

বাসবের প্রশ্ন শুনে কম অবাক হলেন না দিলীপ মুখার্জি। কোন গোয়েন্দার সংস্পর্শে আগে না এলেও তিনি শুনেছিলেন, তাদের কথাবার্তা সময় সময় একটু অদ্ভুত ধরনের হয়। মুখে বিস্ময়ের ভাব না ফুটিয়ে তিনি বললেন, এখানে কোন পারমানেন্ট চাবিওয়ালা নেই। বছর দুই থেকে দেখছি সিজিনে একটা লোক লক্ষ্ণৌ থেকে আসে।

সাধনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বাসব বলল, সেই লোকটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

তার আস্তানার সন্ধান আপনাকে দিতে পারব না, তবে কার্টার রোডের মোড়ে তাকে বসে থাকতে দেখি মাঝে মাঝে।

ধন্যবাদ মিঃ মুখার্জি। সাধন, তুমি ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

বাসব হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এলো এখন।

কি হে, চাবিওয়ালার সন্ধান পেলে?

পেলাম বৈকি; কার্টার রোডের মোড় আলো করে বসেছিল সে। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, পুলিশের ভয় দেখাতে বাছাধন স্বীকার করল, মোমের ছাপ দেখিয়ে একজন তার কাছ থেকে একটা চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে গেছে।

চাবি! কোথাকার চাবি? কে চাবি তৈরি করালো? আমি তো বুঝতে পারছি না!

বাসব এ কথার কোন উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। সাধন বুঝতে পারল উত্তর পাবার সম্ভাবনা আর নেই।

ইতিমধ্যে মৃগাঙ্ক ঘোষ ও আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বাসবের আলাপ হয়ে গেছে। কুমার বাহাদুরের ঠিকানা হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল ও।

আহত মৃগাঙ্ক ঘোষকে হেল্‌থ সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি নিজের বাড়িতে থাকবার সুযোগ পাননি। পুলিশ বাড়ির দরজা সিল করে রেখেছে। তিনি হোটেল অ্যাম্বাসাডারে উঠেছিলেন। বাসব গিয়েছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বাসবের কথা তিনি পুলিশের কাছ থেকে শুনেছিলেন। একথাও শুনেছিলেন, ও আসবে নিজের প্রশ্নের তালিকা নিয়ে। সাধনের মনে হল তাদের দুজনকে

দেখে মৃগাঙ্ক কিছু অপ্রসন্ন হলেন।

আলাপের প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর বাসব বলল, আপনি আমাকে সমস্ত খুলে বলুন মিঃ ঘোষ..

মৃগাঙ্ক কনুইয়ের ভরে উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে বললেন, এই হত্যাকাণ্ডের আমি কি জানি যে খুলে বলব? আমায় মেরে কে অজ্ঞান করে গেল তাই আমার জানা নেই।

হত্যাকারীকে যে আপনি স্বচক্ষে দেখেননি, একথা মেনে নিতে বাধা নেই। তবে এমন হয়তো অনেক ছোটোখাটো কথা তুচ্ছ মনে করে আপনি পুলিশকে বলেননি, যা তদন্তের সুবিধার দিক থেকে মোটেই তুচ্ছ নয়।

একটু ভেবে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললেন, সেদিন সন্ধ্যা গাঢ় হবার পরই ফিরে এসেছিলাম সিলভার অ্যারো হোটেল থেকে। অল্প কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল রক্তিমার সঙ্গে। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি। এর পরের ঘটনা পুলিশের মুখ থেকে শুনে থাকবেন।

কথাবার্তা বলার সময় রক্তিমাদেবীর কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন?

ব্যতিক্রম...তা ধরুন...কথাবার্তা একটু অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল। তাছাড়া...

থামবেন না, বলুন...

আমার মনে হয়েছিল সে নৈনিতাল ছেড়ে চলে যেতে চায়।

কিভাবে বুঝলেন?

আমি বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, ও সুটকেশ গোছাচ্ছে। হঠাৎ অন্যায় ধরা পড়ে গেলে মানুষ যেমন থতমত খেয়ে যায়—আমাকে দেখে ওর অবস্থা ঠিক সেই রকম হল। এই সময় আমাকে আশা করা যায় না। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, সুটকেশটা এমনি গুছিয়ে রাখছে।

উত্তর আপনার মনঃপুত হয়নি?

না।

কেন?

মৃগাঙ্ক একটু হাসলেন। শ্লেষের হাসি।

রক্তিমা যে জাতের মেয়ে ছিল—কোন একটি পুরুষের অধীনে থাকা চিরকাল বোধ হয় সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। অবশ্য রক্তিমা আমার চোখে ধুলো দিতে চাইলে আইন তাকে আটকে রাখত।

অর্থাৎ—

মৃগাঙ্ক বণ্ডের ব্যাপারটা বললেন।

পাইপে মিক্সচার ভরা হয়ে গিয়েছিল বাসবের। এবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, প্রয়োজনের সময় ও-বণ্ড কোন কাজেই লাগত না। এই বিরাট দেশে কোথায় খুঁজে বেড়াতেন তাঁকে? ওই ধরনের বণ্ড করিয়ে নিলে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় কার্যকরী করা যায় না কখনো।—একটা

কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। এখানে আসবার পর রক্তিমাদেবীর কি কোন ইয়ে জুটেছিল?

সে বুঝতে না পারলেও আমি জেনে ফেলেছিলাম, তার সঙ্গে আড্ডাবাড়ির কুমার বাহাদুরের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

হুঁ। আচ্ছা, একথা কি আপনার মনে হয়নি, উনি সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন কুমার বাহাদুরের সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্য?

কথাটা শুনে মৃগাঙ্ক উত্তেজিত গলায় বললেন, হতে পারে। কি আশ্চর্য, এ-কথা তো আমার আগে মনে হয়নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। নইলে...কিন্তু...

বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সাধনও।

রাস্তায় এসে সাধন প্রশ্ন করল, হোটেলে ফিরবে তো?

না। আমাদের আরেকবার কুমার বাহাদুরের বাড়ি যেতে হবে।

আবার!

হ্যাঁ, নতুন করে তাকে বাজিয়ে দেখতে চাই।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দুজনে আড্ডাবাড়ি হাউসে এসে পৌঁছাল। কুমার বাহাদুর হুইস্কির বোতল সামনে রেখে বসেছিলেন। নেশার ব্যাপারে তাঁর কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই। ওদের দুজনকে দেখে তাঁব মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না।

পার্লারেই বসেছিলেন। বেতের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খনখনে গলায় বললেন, আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য আমার, আবার আপনাদের দেখা পেলাম...

এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করবাব ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু একটা নতুন সূত্র হাতে এসে পড়ায় চলে এলাম। বক্তিমাদেবী সম্পর্কে গোটা কয়েক স্পষ্ট প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবেন না। হোটেল-ম্যানেজারের মুখে আমি শুনেছিলাম, আপনার মৃতার সম্পর্কে ইন্টারেস্ট ছিল! আগের সাক্ষাতে এই কথা তুললে আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে শুনে এলাম—ম্যানেজাবের কথা অভ্রান্ত। এবার আপনার মুখে শুনতে চাই আসল কথাটা...

কুমার বাহাদুর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। দ্রুত হাতে গেলাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে তীব্র খনখনে গলায় বললেন, মৃগাঙ্ক ঘোষ আমার বিরুদ্ধে আপনাকে বলেছে, তার এত সাহস?

ভুলে যাবেন না, দিলীপ মুখার্জিও বলেছেন...

মুখুজ্যেব কথা বাদ দিন। তার হোটেলেই তো গত বছর এই রক্তিমাকে নিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ হয়ে গেছে!—তাজ্জব ব্যাপাব! দুনিয়া শুদ্ধ লোক আমার পিছনে লেগে পড়ল কেন?

কেউ আপনার পিছনে লাগেনি। কথায় কথায় আমি জানতে পেরেছি। যাক, মূল প্রশ্নটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। নেশার সময় ব্যাঘাত ঘটিয়েছি—যত তাড়াতাড়ি

আমাদের বিদায় করে দেন, আপনাব পক্ষে ততই ভালো কিন্তু।

নেশার আমার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অ্যাল্‌কোহলের হাতছানি আমি সর্বক্ষণই পাই—বসে পড়লেই হল।

কথাটা শেষ করে একটু চিন্তা করে নিয়ে কুমার বাহাদুর আবাব বললেন, রক্তিমা মৃগাঙ্ক ঘোষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। সুতরাং তাব মত মেয়েব সঙ্গে আমাব যদি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাতে অন্যায়ের কি আছে?

বাসব নির্বিকার গলায় বলল, কিছু মাত্র অন্যায় নেই। আপনাবা কি এখান থেকে চলে যাবার প্ল্যান করেছিলেন?

সে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি।

রাজি হননি কেন?

আমি ফুর্তিবাজ লোক মশাই, প্রাণ ভরে ফুর্তি করলাম—হয়ে গেল। দায়িত্ব-টায়িত্ব ঘাড়ে নিতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আইনের মারপ্যাঁচও একটা ছিল। ভালো কথা, আপনাদের জিজ্ঞেস করাই হয়নি। চলে নাকি?

হুইস্কির বোতলের দিকে কুমার বাহাদুর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আমরা ও-রসে বঞ্চিত। সিলভার অ্যারো হোটেলে গত বছর রক্তিমাদেবীকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল বলছিলেন?

ও-জাতীয় মেয়েদের নিয়ে যা হয় আব কি!

ঘটনাটা বলতে আপত্তি আছে কি?

বিন্দুমাত্র না। গত বছরও আমি এসেছিলাম এখানে। মৃগাঙ্ক ঘোষ ও রক্তিমাও এসেছিল। তখনই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ওরা উঠেছিল সিলভার অ্যারোতে। আলাপ হলেও তখন আমি এবারেব মত রক্তিমা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড ছিলাম না। বিনায়ক সেন তার রূপে মজলেন। দুজনেব যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন মৃগাঙ্ক টের পেয়ে গেল। এরপব যে কাণ্ড হল মশাই, তা বলে বোঝাবাব মত নয়। হোটেলের লবিতে সমস্ত বোর্ডারেব সামনে দুজনের মধ্যে প্রায় ডুয়েল হবার উপক্রম। সে এক বিশ্রী কাণ্ড! তারপরই মৃগাঙ্ক মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়ল নৈনিতাল থেকে।

হুঁ। বিনায়ক সেনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? কি করেন তিনি? বয়স কত?

দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই, এত প্রশ্ন এক সঙ্গে করবেন না, আমি একটুতেই বড ঘাবড়ে যাই। অল্পই আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে, কলকাতায় ব্যারিস্টারি করেন। বয়স ধরুন, ষাট-বাষট্টির মধ্যেই।

আর আপনাকে বিরক্ত করব না চলি। এস সাধন।

কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলেই ফিরল বাসব ও সাধন। বাসব অসম্ভব গম্ভীর, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে মনে হল। সাধনের মনে

অজস্র প্রশ্ন ওঠা-নামা করলেও সে চুপ করে রইল। সাধন জানে, এখন উত্তর পাওয়া যাবে না।

কাউন্টারেই দিলীপ মুখার্জি ছিলেন; কথা বলছিলেন মধুসূদন গুপ্তর সঙ্গে। ওরা কাছে আসতেই বললেন, সেই কোন সাত-সকালে বেরিয়ে গেছেন, কোথায় গিয়েছিলেন?

বাসব পকেট থেকে পাইপ ও পাউচ বার করতে করতে বলল, কয়েকটা কাজ সেরে এলাম। থানা থেকে আমার খোঁজে কেউ এসেছিল নাকি?

না।

মধুসূদন গুপ্ত চলে যাচ্ছিলেন; বাসব বলল, আপনি যাবেন না মিস্টার গুপ্ত, কথা আছে। আগে মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে কথা শেষ করে নিই। কুমার বাহাদুরের মুখে শুনলাম, বিনায়ক সেন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নাকি এই হোটেলের মৃগাঙ্ক ঘোষের তুমুল ঝগড়া হয়েছিল গত বছর?

ঠিকই শুনেছেন। এরকম বিশ্রী কাণ্ড আমার হোটেলে আর কখনও হয়নি। আমি তো ভেবেছিলাম, মিস্টার ঘোষ ওই ব্যাপারের পর আর কখনও নৈনিতালের পথ মাড়াবেন না।

সাধন বলল, আপনার অনুমান ঠিক হয়নি।

তাই তো দেখছি। এমন কি দিনের পরদিন তিনি এই হোটেলেও এসেছেন গল্প-গুজব করতে।

এরপর দিলীপ মুখার্জি ঘটনাটা বললেন—কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন সেই একই কথা।

বাসব পাইপ ধরিয়েছিল; ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বিনায়ক সেনের ঠিকানা জানেন?

না। সারা বছর ধরে কত বোর্ডার আসছে, সকলের পার্মানেন্ট ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব?

তা বটে। আসুন মিস্টার গুপ্ত, ওপরে যাই।

সাধন ও মধুসূদনকে নিয়ে বাসব সিঁড়ির দিকে এগুলো। নীরবে অর্ধেক সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর বাসব হঠাৎ বলল, মিস্টার গুপ্ত, আপনি রিভলবার পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কেন?

আমি?

তাই তো শুনলাম।

মধুসূদন আমতা আমতা করতে লাগলেন, না...মানে...আপনাকে বলল কে?

কে বলল, সেটা বড় কথা নয়; সম্ভব হলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

ও বুঝেছি, দিলীপবাবু বলেছেন। দেখুন, আমি...আসল কথা হল, রেবার জঘন্য জীবন-যাত্রা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। আমি একটা রিভলবার সংগ্রহ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলাম, ওকে গুলি করে মারবার জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন

মিস্টার ব্যানার্জি, রিভলবার সংগ্রহ করতে আমি পারিনি, বেবার খুন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

আরেকটা কথা, আপনি চাবিওয়ালার সন্ধান করছিলেন কেন? প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করবেন না। আপনার বয়ের মুখ থেকে কথাটা জানতে পেরেছি, আপনি তাকে চাবিওয়ালা ডাকবার কথা বলেছিলেন। কেন মিস্টার গুপ্ত?

আমার ঘরের চাবি হারিয়ে গিয়েছিল।

চাবি হারিয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু আপনি চাবিওয়ালার অনুসন্ধান করলেন কেন বুঝলাম না, সে দায়িত্ব তো হোটেল অথরিটির। তারা আপনাকে ডুপ্লিকেট চাবি সাপ্লাই করত।

আমি ওঁদের কাছে চাবি চেয়েছিলাম, দিতে পারেননি। কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নেই। এমন কি মাস্টার কী-ও না। তখন অবশ্য পরে আমি বারান্দা থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম চাবিটা।

আর কোন কথা হল না, চুপচাপ তিনজনে সিঁড়ি অতিক্রম করবার পর মধুসূদন নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। সাধন এক টিপ নস্যি নিল। চিন্তিত বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার জন্য উসখুস করতে লাগল।

আরো কয়েক-পা এগুবার পর বাসব বলল, মনে হচ্ছে তুমি যেন কিছু বলতে চাও?

তুমি তো সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে আছো, মধুসূদনবাবুর বেয়ারার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে তো দেখিনি।

কথা বলিনি তো।

তবে বললে যে!

ও-রকম বলতে হয়। আসলে চাবিওয়ালা যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল, তাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম মধুসূদন তার কাছে গিয়েছিলেন।

তাই বলো। আচ্ছা বাসব, একটা বিষয় কিন্তু আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।

কোন্ বিষয়ে?

হোটেলের কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি না থাকাটা একটু অদ্ভুত নয়? এমন কি মাস্টার কী-ও নেই!

এরকম অবস্থা কিন্তু অনেক হোটেলেই আছে। তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলছি! ধর, বোর্ডার ঘর বন্ধ করে চাবি নিয়ে বেড়াতে গেলেন। এই অবসরে হোটেলের কোন কর্মচারি ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুলে মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে নিল। এই ধরনের ঘটনা অনেক বড় বড় হোটেলে মাঝে-মধ্যে ঘটেছিল দেশের অনেক জায়গায়। স্বাভাবিক ভাবেই এই অবস্থার প্রতিবাদে আওয়াজ উঠেছিল। কাজেই ডুপ্লিকেট রাখার ব্যবস্থা অনেক হোটেল বাতিল করে দিয়েছে।

যাক, আমার এ-সমস্যাটা মিটলো।

তবু আমি ডুপ্লিকেটের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নেব। এখন আমি ভাবছি...

কি ভাবছ?

না, কিছু নয়।

তার মানে, বলতে চাও না। তোমার এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় আমার ভালো লাগে না। কত দূর কাজ এগুলো বলবে কি?

মৃদু হেসে বাসব বলল, এ তোমার রাগের কথা সাধন। তোমার চোখের ওপরই আমি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি—তুমিই বলো না, কেসটা বর্তমানে কি রকম স্টেজে রয়েছে?

সাধন ঘনঘন কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে বলল, আমার ধারণায় কেসটা বেশ জটিল হবে। সমাধানে পৌঁছবার জন্য তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

বর্তমানে আমার ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। কেসটা মোটেই জটিল নয়। বরং বলতে পারি, বহুদিন এরকম সহজ কেস আমি হাতে পাইনি।

বলো কি! এতই সহজ যদি তবে সল্‌ভ করে ফেলছ না কেন?

সহজ বলতে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, তা তুমি ধরতে পারনি। সহজ বলতে, আপাতদৃষ্টিতে এই হত্যাকাণ্ড যতই রহস্যজনক মনে হোক না কেন, অনুসন্ধান করে দেখার পর বুঝেছি তা নয়। হত্যাকারী নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রাখার জন্য আহামরি কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেনি। এমন একটা স্থূল কাজ সে করে ফেলেছে, যার জন্য এই রকম নাটকীয় হত্যাকাণ্ডের নায়ক হিসেবে তাকে আমার ভালো লাগছে না।

তার মানে, তুমি জানো কে হত্যাকারী?

জানি বললে বেশি বলা হয়, আঁচ করেছি। আমি এখন ভাবছি, মোটিভের কথা। কোন্ মোটিভ তাকে প্ররোচিত করেছিল রক্তে হাত রাঙাতে? মোটিভ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বেরুবেই। বুঝলে সাধন, কলকাতায় না গিয়ে অনুসন্ধানের কাজ যদি এখানেই শেষ হত, তাহলে আমি বলতে দ্বিধা করতাম না, এর চেয়ে কম সময়ে আর কোন কেস সল্‌ভ করতে পারিনি।

তুমি কলকাতা যাচ্ছ নাকি?

ওরা নিজেদের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল; দরজার তালা খুলতে খুলতে বাসব বলল, কালই রওনা হতে হবে। দিন চারেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারব আশা রাখি।

বিস্মিত সাধন ওর পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করল।

বাসব কলকাতা চলে গেল।

সাধনকে বলে গেছে, চোখ-কান খুলে রাখতে। তাছাড়া ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিল, মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ির আসবাবপত্র ও সামনের দরজার ওপর ফিঙ্গার-প্রিন্ট পেলে তুলে নিতে।

চার দিনের দিন বাসব কলকাতা থেকে ফিরল। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

ওখানে এত সহজেই যে কার্যোদ্ধার করতে পারবে ভাবেনি। অবশ্য হোমিসাইড স্কোয়াডের মিঃ সামন্তর পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে কিছুই করা সম্ভব হত না। পুলিশকে ভয় করে না এমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

সাধন সতর্ক ছিল, কিন্তু চোখে পড়বার মত বিশেষ কোন ঘটনা সে লক্ষ্য করেনি। কুমার বাহাদুর একবারও আসেননি হোটেলে। মৃগাঙ্ক ঘোষের সঙ্গেও সাক্ষাত হয়নি। মধুসূদন গুপ্ত এই ক'দিনের মধ্যে বার তিনেক হোটেল থেকে বেরিয়েছেন, কোথায় গেছেন সাধন তার খোঁজ রাখেনি।

চোখ-কান খুলে থাকলেও বলতে গেলে এই ক'দিন তার সময় কেটেছে দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে গল্প করে। ব্যবসাপত্র নিয়েই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। আগেকার মত গত বছর থেকে আর ব্যবসা করতে পারছেন না বলে আক্ষেপ করেছেন মুখার্জি। রক্তিমাকে নিয়ে মৃগাঙ্ক ও বিনায়কের মধ্যে যে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে—এরপর অনেক বোর্ডার হোটেল ছেড়ে চলে যান। সেই থেকেই মন্দা ব্যবসার সূত্রপাত।

কি মনে হওয়ায় সাধন হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, আপনাদের পরিচিতদের মধ্যে এখানে কার কার রিভলবার আছে বলতে পারেন?

আমার পরিচিতদের মধ্যে দুজনের রিভলবার আছে জানি। তার মধ্যে একজনকে আপনিও চেনেন, কুমার বাহাদুরের কথা বলছি।

সাইলেন্সার কি?

তা বলতে পারব না।

বাসব সোফায় ক্লান্তভাবে বসে পড়ে বলল, গতর একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। বলতে গেলে ঝড়ের গতিতে কলকাতা গেলাম আর এলাম।

নস্যি নেবার পর সাধন প্রশ্ন করল, কাজ কিছু হল?

হল বৈকি? বলতে পারো, আমার অনুমান নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তোমার কি খবর বলো?

সাধন ঘটনাহীন দিন কয়েকের বর্ণনা দিয়ে গেল।

ভাবছিলাম একটু বিশ্রাম করব, কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আর হাতে নেই। চলো, আগে থানায় ঘুরে আসি, তারপর বিশ্রাম।

দুজনে থানার দিকে রওনা হল।

ইন্সপেক্টর অফিস ঘরেই ছিলেন; ওদের নিরুৎসুকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর দু-চোখের তারায় অবজ্ঞা ঝিলিক্ দিয়ে উঠল। বললেন, কেসটার কিছু সুবিধা করতে পারলেন?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, আপনার কি ধারণা?

আমার ধারণার কথা বাদ দিন। ভাল কথা, ইন্‌ফরমেশন সেক্ জানিয়ে রাখি, আগামী ৭ই অর্থাৎ চারদিন পরে কেস উঠবে আদালতে। একদিন আগে সুকুমারবাবুকে আমরা এখান থেকে চালান দেব।

এখনও তো চারদিন সময় রয়েছে, এর মধ্যেই কাজ গুটিয়ে নিতে পারব।

আপনি কি বলতে চাইছেন মিস্টার ব্যানার্জি?

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আপাতত কুমার বাহাদুরের বাড়ি। তারপর মৃগাঙ্ক ঘোষের বন্ধ-বাড়িতে। ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো তুলেছিলেন কি?

হ্যাঁ; আপনাকে কপি দেব। কিন্তু...

পথে বলব সব। আসুন।

তিনজনে থানা থেকে বেরুল।

কুমার বাহাদুর পার্লারেই ছিলেন।

সামনের ছোট টেবিলটার ওপর হুইস্কির বোতল ছিল না। খালি গেলাসও নেই। দ্রুতহাতে কি লিখছিলেন তিনি। জুতোর শব্দে মুখ তুলতেই তাঁকে প্রসন্ন বলে মনে হল না।

বাসব বলল, আপনাকে আজ আবার বিরক্ত করতে এলাম কুমার বাহাদুর।

কুমার বাহাদুর তাঁর খনখনে গলায় বললেন, এবার সত্যিই আমি বিরক্ত হচ্ছি। সময় নেই, অসময় নেই চলে আসছেন—এর মানে কি?

মানে না থাকলে কি আসি? নিরর্থক মানুষকে বিরক্ত করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ কুমার বাহাদুর।—বাসব নির্লিপ্ত গলায় কথাটা বলল।

যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন, আমার কিছু কাজ আছে।

নিশ্চয়।

বাসব বলল। ইন্সপেক্টর ও সাধন অনুসরণ করল ওকে।

আপনার অনুমতি ছাড়াই বসলাম বলে কিছু মনে করবেন না। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনার রিভলবার আছে?

আছে।

মনে হল কুমার বাহাদুরের গলার আওয়াজ কেঁপে গেল।

একবার দেখান তো।

দেখাতে হবে?

প্রয়োজন না থাকলে দেখতে চাইতাম না।

একটু ইতস্তত করে কুমার বাহাদুর আসন ছেড়ে উঠলেন। ডিভানের ওধারে দেয়ালের গা ঘেঁষে যে কারুকার্য করা সেকেলে টেবিলটা রাখা ছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেরাজ খুলে কি একটা বার করে নিয়ে আবার ফিরে এলেন তিনজনের কাছে। সাধন দেখল, তাঁর হাতে রিভলবারের বদলে রয়েছে রেক্সিনের মোড়া একটা সরু বই।

কুমার বাহাদুর বইটা বাসবের হাতে তুলে দিলেন।

সবিস্ময়ে বাসব বলল একি?

রিভলবারের লাইসেন্স।

ইন্সপেক্টর একটু চড়া সুরেই বললেন, আমরা রিভলবারটা দেখতে চেয়েছি কুমার বাহাদুর, লাইসেন্সটা দেখাচ্ছেন কেন?

না...মানে..., কুমার বাহাদুর আমতা আমতা করতে লাগলেন।

কি হয়েছে বলুন তো? বাসব প্রশ্ন করল।

বিশেষ কিছুই হয়নি। মানে...

কিছু হয়নি যখন, রিভলবারটা দেখাতে এত আপত্তি কিসের?

এবার প্রায় মরিয়া ভঙ্গিতে কুমার বাহাদুর বললেন, রিভলবারটা আমার কাছে নেই, চুরি হয়ে গেছে।

চুরি!!!

তিনজনই হতবাক।

আপনারা বিশ্বাস করুন,— কুমার বাহাদুর আবার বললেন, সত্যিই আমার কাছ থেকে ওটা চুরি গেছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, লাইসেন্সযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র হারানো দণ্ডনীয় অপরাধ একথা নিশ্চয়ই জানেন? কবে জানতে পেরেছেন, ওটা হারিয়েছে?

বেশ কয়েকদিন হল।

আমাদের খবর দেননি কেন?

আমার তাই ইচ্ছে ছিল...কিন্তু...কেমন...

এসব ক্ষেত্রে ভয়কে জয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ কুমার বাহাদুর। মনে করে বলুন তো, ওটা কবে চুরি গিয়েছিল। রক্তিমাদেবীর খুন হওয়ার আগে, না পরে?

বোধ হয় আগে—না, না, পরে...পরেই মনে হচ্ছে।

কুমার বাহাদুর দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, তাঁর খনখনে গলাকে এখন কেমন চেরা-চেরা মনে হচ্ছে, মানে...ব্যাপারটা কি জানেন, রিভলবারটা খুনের আগে কি পরে কবে চুরি গেছে আমার ঠিক জানা নেই। খুন হওয়ার দিন দুয়েক পরে আমি জানতে পারি।

বাসব বলল, ওই দেরাজেই থাকত অস্ত্রটা?

হ্যাঁ। নৈনিতালে পা দেবার পর থেকেই ওই দেরাজে আমি রিভলবারটা রাখতাম।

কাউকে সন্দেহ হয়?

কাকে সন্দেহ করব?

হুঁ। আপনার রিভলবারটা কত বোরের ছিল বলতে পারেন?

৩৮ বোরের।

তাই নাকি! আপনাকে তাহলে জানিয়ে রাখতে হয়, ৩৮ বোরের গুলিই পাওয়া গেছে রক্তিমাদেবীর বডি থেকে।

অ্যাঁ!

কুমার বাহাদুরের করুণ মুখের দিকে এবার না তাকিয়ে বাসব বলল, আমাদের এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। চলুন ইন্সপেক্টর, এবার ফেরা যাক। সাধন এবার

সোফাব মায়া ত্যাগ করো।

ও উঠে দাঁড়াল।

কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনজন রাস্তায় নামল। পাইপের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাসব গানের কলি ভাঁজছে।

আনন্দে ফেটে পড়ছ মনে হচ্ছে? সাধন প্রশ্ন করল।

কি আনন্দ নয়। মানুষ ভয় পেলে, আমার ভালো লাগে।

ইন্সপেক্টর বললেন, মুখে যতই হম্বিতম্বি করুন না কেন, কুমার বাহাদুর ভয় পেয়ে গেছেন এটা ঠিক। কি রকম বুঝলেন? ওঁর কথা আপনার কাজে লাগবে নাকি?

প্রত্যেকের কথাই আমার কিছু না কিছু কাজে লাগছে ইন্সপেক্টর। চলুন, এবার একবার মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ি যাওয়া যাক।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে...

ইন্সপেক্টরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসব বলল, জানি, তিনি অন্যত্র আছেন। তাঁর সঙ্গে বর্তমানে আমার দেখা করবার ইচ্ছে নেই। আমি তাঁর বাড়িটা আরেকবার ভালো করে দেখতে চাই।

কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়ির দূরত্ব বেশি নয়। তিনজন এসে উপস্থিত হল বাড়িটার সামনে। গেটের এক-ধারে কনস্টেবল দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজনকে পাহারায় মোতায়েন করা হয়েছে বোঝা গেল। ইন্সপেক্টবকে দেখে তারা তটস্থ হয়ে উঠল।

গেট অতিক্রম করে, পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে ইন্সপেক্টর বারান্দায় উঠলেন। তালা সীল করা ছিল। সীল ভেঙ্গে চাবি দিয়ে তালা খোলেন ইন্সপেক্টর, পিছু-পিছু বাসব ও সাধন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

রিক্ততায় খাঁ খাঁ করছে। একটি অপূর্ব সুন্দরী নাবীর জীবন-নাট্যের ওপর যবনিকা পড়েছে এখানে। সাধনের মনে হল রক্তিমার প্রেতাত্মা এই চার-দেয়ালের মধ্যেই অবিরাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চলেছে।

যে-ঘরে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, বাসব তার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি মনে হয়, এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হত্যাকারী গুলি চালিয়েছে?

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুসারে ভিক্‌টিমের সঙ্গে হত্যাকারীর দূবত্ব ছিল হাত পাঁচেকের। উত্তরের জানালার ঠিক নিচে পড়েছিল মৃতদেহ। এখান থেকে জানালার দূরত্ব হাত পাঁচেকের বেশি হবে না।

বাসব ঘরটা পরীক্ষা করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে বললে, আজ সন্ধ্যায় এই ঘরে সকলকে উপস্থিত করতে পারেন?

সকলকে বলতে যদি সুকুমার রায়কেও বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু সম্ভব হবে না।

তাও তো বটে! বেশ, আপনাব অফিস-ঘরে সকলকে জড়ো করুন। সুকুমার রায়কে ওখানে উপস্থিত কবতে না পারার নিশ্চয় কোন কারণ থাকতে পারে না।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু বারংবার এত জিজ্ঞাসাবাদ করবার কি অর্থ, আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আমার তদন্ত করাব পদ্ধতি কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর ইন্সপেক্টর! কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি কূলে এসে নিশ্চিন্তভাবে পৌছব জানবেন। এ প্রসঙ্গে অতীতের অসংখ্য নজীরের কথা নাই বা তুললাম। আপনি শুনলে নিশ্চযই খুশি হবেন, হত্যাকারীকে আমি জেনে ফেলেছি।

জেনে ফেলেছেন! সুকুমাব রায় কি?

সাধন উত্তেজিত গলায় বলল, বলো কি বাসব—কে সে?

এ-কথা এখন স্বচ্ছন্দে বলা চলে, সে আর যেই হোক, সুকুমাব বায় নয়। ও-কথা থাক, তার চেয়ে সেই ভয়ঙ্কর বাতকে নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা চালানো বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।

ইন্সপেক্টরের মনের মধ্যে উত্তেজনা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। তিনি বাসবেব কথা বলার ভঙ্গিতে কিছু বিবক্তবোধও করছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। এই লোকটির শক্তিমত্তার ওপর কর্তৃপক্ষের পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

সেই রাতের বিষয় কি ধবনের আলোচনা আরম্ভ করতে চান?

ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল বলে আপনার ধারণা।

সে কথা তো আমরা আগেই জেনেছি, নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করে লাভ কি?—ইন্সপেক্টরের গলায় শ্লেষের আমেজ।

আছে। সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে চাইলে, আলোচনাব প্রয়োজনীয়তা আছে। বাস্তবকে সব সময় উপেক্ষা করে চলবেন না ইন্সপেক্টাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে ঠকতে হয়। আপনি চিন্তা করে দেখেছেন কি, গুলির শব্দে মৃগাঙ্ক ঘোষের ঘুম ভাঙেনি কেন? তাঁকে কি রক্তিমাকে খুন করবার আগেই আহত করা হয়েছিল? কিম্বা তিনি আমাদের যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী? আহত হয়ে পড়ে থাকাটা সাজান ঘটনা? এরপর আরো প্রশ্ন আছে। যেমন, মাঝরাতে দরজা খোলা থাকবার কথা নয়। হত্যাকারীকে কে দরজা খুলে দিয়েছিল? রক্তিমা না মৃগাঙ্ক? মৃগাঙ্কই কি হত্যাকারী, না হত্যাকারীর সহযোগী? অথবা সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি? হত্যাকারী কোন বিশেষ উপায়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল?

এতগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই ইন্সপেক্টর বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। পাইপটা অনেক আগেই নিভে গিয়েছিল। বাসব ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

সাধন তুমি কিছু বলতে পারো?

ঘনঘন কয়েক টিপ নস্যি নিয়ে সাধন বলল, আমার মনে হয়, হত্যাকারীকে

দরজা খুলে দিয়েছিল রক্তিমা। তারপর দুজনে মিলে গিয়ে মৃগাঙ্ককে আহত করেছিল। এবং...

হত্যাকারীর উদ্দেশ্য কি? রক্তিমাকে খুন করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে সে মৃগাঙ্ককে আহত করতে যাবে না। অনেক চিন্তা করবার পর আমি এই বিষয়ের কনক্লুসানে এসেছি। আমার মনে হয়, সে রাত্রে মৃগাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়ার পর রক্তিমা বাড়ি থেকে বেবিয়েছিল। কেন বেরিয়েছিল, তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এই সম্ভাবনা হত্যাকারীর কাছে অজ্ঞাত ছিল না—ওৎ পেতে ছিল সে। রক্তিমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরই, ভেজান দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢোকে। ভাল কথা, মৃগাঙ্ক ঘোষ যদি হত্যাকারী না হন, তাহলেই কিন্তু আমার এই থিওরি স্ট্যাণ্ড করবে। যা হোক, বাড়িতে প্রবেশ করে সে ঘুমন্ত মৃগাঙ্ককে আহত করল। তাব বডিটা অন্যত্র ফেলে এসে অপেক্ষা করতে লাগল রক্তিমার জন্য। রক্তিমা ফিরে এসে হত্যাকারীকে দেখে নিশ্চয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে সে তখন চেঁচামেচি করেনি, কারণ আগন্তুক তার পরিচিত ব্যক্তি। দুজনের নিশ্চয় ক থাবার্তা হয়েছিল। তারপর—হ্যাঁ, তারপরই অসতর্ক মুহূর্তে সে রক্তিমার গলা চেপে ধরেছিল। এই সময়কার আর্তনাদই শুনতে পেয়েছিল পাড়ার লোকেরা।

বাসব থামতেই সাধন বলল, এরপর বোধ হয় মুখে অ্যাসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি বাসব?

উদ্দেশ্য জলের মত পরিষ্কার। সুকুমাববাবু ভয় দেখিয়েছিলেন অ্যাসিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেবেন, একথা কোনক্রমে জানতে পেরেছিল হত্যাকারী। তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্যই সে অ্যাসিড ব্যবহার করেছিল। এ প্রসঙ্গের আলোচনা তো আমাদের মধ্যে বোধ হয় আগেই হয়েছে। এবার গুলি ছোঁড়ার কথায় আসা যাক। এই প্রসঙ্গে দুটো সম্ভাবনার কথা উঠতে পারে। প্রথম, গলা টেপা ও অ্যাসিড ব্যবহারের পরও তার সন্দেহ ছিল রক্তিমা মরেনি, তাই সেগুলি চালিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়, কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার এও আরেকটা পন্থা হতে পারে।

নিরস কণ্ঠে ইন্সপেক্টর বললেন, তদন্তের ক্ষেত্রে কল্পনাকে এত প্রশ্রয় দেওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

অসার কল্পনা ও বাস্তব ঘেঁষা কল্পনার মধ্যে পার্থক্য আছে, নিশ্চয় স্বীকার করবেন। যাক, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার ফেরা যেতে পারে। আজ সন্ধ্যায় কিন্তু সকলকে আপনার অফিস-ঘরে একত্রিত করতে ভুলবেন না।

বিকেলের কিছু পরেই অন্ধকার ঘন হয়ে এল। নৈনিতালের সমস্ত দিনটা মনোরম—কিন্তু অন্ধকার ঘিরে আসবার পরই কেমন ছমছমে ভাবের ছোঁয়া লাগে।

কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে নৈনিতাল। আজ আবার সমস্ত আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একত্রিত হয়ে অকাল বর্ষণ আরম্ভ করবে কিনা,

বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতেই থানায় এলেন মধুসূদন গুপ্ত। ইন্সপেক্টর তাঁকে পূর্বাহ্নেই এখানে আসবার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন।

মধুসূদন অফিস-ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, কুমার বাহাদুর, মৃগাঙ্ক ঘোষ ও দিলীপ মুখার্জি উপস্থিত রয়েছেন। কারুর মুখে কথা নেই, সকলেই কেমন নিরাসক্ত ভাব নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ইন্সপেক্টরও আছেন ঘরে; নির্বিকার মুখে সিগারেট ফুঁকছেন তিনি। বাসব ও সাধন এল ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়।

বাসব সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, সুকুমারবাবুকে এবার এখানে আনতে পারেন ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টর দরওয়াজাকে ডেকে নিচু গলায় কি বললেন, দরওয়াজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই সুকুমারকে নিয়ে ফিরে এল। সুকুমারের চেহারায় আগেকার জেল্লা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। সমস্ত মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িতে পূর্ণ। দু-চোখের কোলে কালি। শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে সুকুমার বসল।

বাসব বলল, আপনারা সকলেই বিরক্ত বোধ করছেন বুঝতে পারছি। আপনাদের এইভাবে ডাকিয়ে আনানোর জন্য আমি মর্মাহত। অবশ্য এই ঘটনার আর যে পুনরাবৃত্তি হবে না, এ নিশ্চয়তা আমি এখুনি দিতে পারি। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। আপনারা শুনলে নিশ্চয় আনন্দিত হবেন, আমি তদন্তের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। হত্যাকারী আমার চোখের ওপর আকার নিতে আরম্ভ করেছে। তবে সে যে কে এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। আপনারা আমায় যদি পূর্ণ সহযোগিতা করতেন, তাহলে এই গোলক ধাঁধায় ঘুরতে হত না।

বাসব থামল। সকলে নির্বাক।

ও আবার আরম্ভ করল, হত্যাকারীর কথা এখন থাক। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল, সেই আলোচনায় আসা যাক। একটা কথা আগেই জানিয়ে রাখতে চাই, কারুর চরিত্রকে কটাক্ষ করা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয়। মৃগাঙ্ক ঘোষ উপযাচক হয়ে পরিচিত হলেন মধুসূদন গুপ্ত ও সুকুমার রায়ের সঙ্গে। দুজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া ছাড়া এইভাবে পরিচয় করার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা আমি জানি না। তিনজনের মধ্যে আলাপ বেশ জমে উঠল। মৃগাঙ্ক আমন্ত্রণ জানালেন দুজনকে নিজের বাসায়। ওখানেই রক্তিমার সঙ্গে সাক্ষাত হল মধুসূদন ও সুকুমারবাবুর। দুজনেই স্তম্ভিত। একজন নিজের স্ত্রীর সাক্ষাত পেলেন, আর অন্যজন দেখলেন তাঁর প্রেমিকাকে। মৃগাঙ্কবাবু এ-সমস্ত বুঝতে পারলেন না। তবে..

ওকে থামিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় মৃগাঙ্ক বললেন, বলেন কি মশাই, রক্তিমা ওঁদের পূর্ব-পরিচিতা ছিল।

পরিচিতা শুধু নয়, মধুসূদনবাবুর স্ত্রী ছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য এই সাক্ষাতের পর অতীতের ভুলে যাওয়া অনেক বিশ্রী ঘটনা খোঁচা-খাওয়া ঘায়ের মতই দগদগ করে উঠল। দুজনেই দুজনের অনুপস্থিতিতে দেখা করলেন রক্তিমাদেবীর সঙ্গে।

সুখকর কথাবার্তা হল না, একথা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। মধুসূদন বললেন, চাবকে পিঠ রক্তাক্ত করে তুলবেন ওই পন্যা নারীর। সুকুমারের মন-বাসনা হল, ওই সুন্দর মুখ অ্যাসিড দিয়ে গলিয়ে দেবেন। রক্তিমাদেবীর পক্ষে ঘাবড়ে যাওয়া নিশ্চয় অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাঁর নতুন নাগর কুমার বাহাদুরকে বললেন সব কথা। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা হল। কিন্তু কুমার বাহাদুর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহসী হচ্ছিলেন না। কারণ একটা আইন-ঘটিত ব্যাপার হাইফেনের মত বিরাজ করছিল। মৃগাঙ্ক ঘোষ সতর্ক লোক, একটা বণ্ড সই করিয়ে নিয়েছিলেন প্রেমিকাকে দিয়ে। এই প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় বলে নেওয়া দরকার। গত বছরও এই সময় মৃগাঙ্কবাবু এখানে এসেছিলেন রক্তিমাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে। উঠেছিলেন আলাদা কোন বাসায় নয়, সিলভার অ্যারো হোটেলে। কলকাতার একজন বৃদ্ধ ব্যারিস্টারও তখন হোটেলের বোর্ডার। রক্তিমাদেবীকে কেন্দ্র করেই এক বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে ওই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান খুনের কোন সম্পর্ক নেই মনে হলেও—আমার ধারণায় দুটি ঘটনার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

রক্তিমা খুন হলেন। দুর্ঘটনার স্থলে সুকুমারবাবুর পার্স ও তাঁর হাতের ছাপ সমেত ভাঙা অ্যাসিডের বোতল পাওয়া যাওয়ায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। এবার আপনাদের প্র্যাক্‌টিক্যাল দিকটা চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করি। সুকুমারবাবুকে এতটা বোকা মনে করা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে তিনি এত পরিকল্পনা করে খুন করলেন, অথচ ঘটনাস্থলে ফেলে এলেন এমন সমস্ত স্থূল প্রমাণ, যাতে ফাঁসির দড়িকে বরণ করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। সুতরাং কি প্রতিপন্ন হচ্ছে? সুকুমার রায় হত্যাকারী নন। অন্য কেউ নিষ্ঠুর ভাবে রক্তিমাদেবীকে খুন করে দোষ চাপিয়েছে তাঁব ঘাড়ে। এখন প্রশ্ন উঠবে তাঁর বন্ধ ঘর থেকে হত্যাকারী কিভাবে পার্স ও অ্যাসিডের বোতল নিয়ে গেল? আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি কোন ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি নেই। এমনকি মাষ্টার-কীও না। সুকুমারবাবু নিজের ঘরের চাবি কখনই হাতছাড়া করেননি। এবার একটি মাত্র সম্ভাবনা বাকি রইল। হত্যাকারী নকল চাবি তৈরি করিয়েছিল। সে আমাকে জানিয়েছে, দুজন বাঙালি ভদ্রলোক সম্প্রতি তার কাছে গিয়েছিলেন চাবি তৈরি করানোর ব্যাপারে। ওই দুজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। তিনি অবশ্য বলেছেন, চাবি তৈরি করাতে গেলেও শেষ পর্যন্ত তৈরি করাননি। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি না। আমার সামনে এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে—চাবিওয়ালার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করা। এবং পুলিশের সাহায্যে তাকে আপনাদের সামনে এনে আইডেন্টি করানো, কে প্রকৃতপক্ষে চাবি তৈরি করিয়েছিল। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে কোথায় জানেন? সেই চাবিওয়ালাকে এখন খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা।

আপনারা সমস্ত কথা শুনলেন। আপনাদের কেন ডাকিয়েছি, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন বোধ হয়। দ্বিধাহীন ভাবে সহযোগিতা করুন। বুনো হাঁসের পিছনে

কোথায় ছুটে বেড়াব? কারুব বিশেষ কোন কথা জানা থাকলে আমায় বলুন। তার সূত্র ধরে আমি এই রক্তাক্ত ঘটনাব ওপর যবনিকা ফেলে দিই।

এতক্ষণ একটানা বলবার পর বাসব থামল। ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। মাঝে একবার দম নেবার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করেছে বুঝতে পারা গেল। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এত কথা বলা, তাঁরা কিন্তু সকলেই নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ শুধু ওয়াল ক্লকের শব্দ নীরবতাকে ভেঙে চলল।

শেষে—

আমি এবার যেতে পারি কি? কুমার বাহাদুরের খনখনে গলা শুনতে পাওয়া গেল।

আপনারা সকলেই যেতে পারেন। ইন্সপেক্টর বললেন, তবে আপনাদেব সকলকেই সাবধান করে দিচ্ছি, নৈনিতালের বাইরে পা দেবাব কেউ চেষ্টা কববেন না। বিশেষ করে কুমার বাহাদুর একথা স্মরণ রাখবেন।

আমি! আমার ওপর আপনার এই বিশেষ অনুগ্রহ কেন?

আপনার মালপত্র প্যাক হয়ে গেছে, ট্যাক্সি রিজার্ভ করবার জন্য আপনি অতি মাত্রায় তৎপর,—আমরা পুলিশের লোক, আমাদের সমস্ত সংবাদই বাখতে হয়। এখান থেকে চলে যাবার তাড়ায় আপনি একটা কথা ভুলে গেছেন, বিভলবাব খোয়া যাওয়া আইনের চোখে বিরাট বড় অফেন্স। আপনাকে যে কোন মুহূর্তে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি। অবশ্য আইন মেনে নেয এমন উত্তর আপনি তাড়াতাড়িই দেবেন এ বিশ্বাস থাকায় আমরা আর জল ঘোলা কবতে চাইনি।

কুমার বাহাদুরের শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে উঠল।

সকলে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবাব।

রাত দশটার পর বৃষ্টি নামল। অবিশ্রান্ত ধারায় নয়, টিপটিপ কবে।

মেঘের মৃদুমন্দ ডাক থেকে থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এত অন্ধকার নৈনিতালকে আগে বুঝি কখনো গ্রাস করেনি। মনে হচ্ছে ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করে কাটা যাবে।

বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনকনে হাওয়া আরম্ভ হয়েছে। হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা সাপটে ধরেছে শৈলনগরীকে।

পেটা ঘড়িতে কোথায় সশব্দে বারোটা বাজল।

পথ নির্জন।

পথে চলা মানুষ তো দূরের কথা, একটা মোটর কারেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

সুখশয্যার আশ্রয়ে নৈনিতাল এখন সুপ্ত।

মাঝে মাঝে নাম না জানা নিশাচর পাখিরা ডেকে যাচ্ছে। এই সমস্ত দিনেই হায়নার দল তাদের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে শহরে আসে। কিসের সন্ধানে

আসে কে জানে? তিমির পিঠের মত অ্যাসফ্যাল্টে মোড়া রাস্তাগুলোর ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়ানোর মধ্যেই বোধ হয় তাদের আনন্দ।

লেকের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে বহু দূর—একজন সাইকেল আরোহীকে দেখা গেল সেখানে। শোচনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ রাস্তার দু-পাশের অসংখ্য নিয়ন লাইটের আলোকে স্তিমিত করে রেখেছে। এই স্তিমিত আলোয় সাইকেল চালককে ভাল করে চেনা যায় না।

কালচে সবুজ রঙের অলেস্টারে তার সমস্ত শরীর ঢাকা। ফারের টুপি গলা পর্যন্ত নেমে এসেছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরা হাত দুখানা চামড়ার দস্তানায় মোড়া। লেকের পাশ দিয়ে কিছু দূর যাবার পর সে অন্য পথ ধরল।

ক্রমে নৈনিতালের অভিজাত বসতিকে ছাড়িয়ে এলো সাইকেল চালক। এধারে নিম্নবিত্তের লোকেদেরই বসবাস। সাইকেলের গতি এখন অনেক মন্থর। একটা ছোট্ট কাঠের ঘরের সামনে এসে সাইকেল থেকে সে নামল।

কাঠের ঘরটা শোচনীয় অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। কতকাল আগে এটা তৈরি হয়েছিল, তা অনুমান করা পর্যন্ত কঠিন। এই অঞ্চলে অসংখ্য এই ধরনের ছোট ছোট ঘর ছড়িয়ে রয়েছে। সাইকেল চালক সাইকেলটা একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে থেকে আলোর রেশ বাইরে এসে পড়েনি।

সাইকেল চালক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ঘরের মালিক ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল বোধ হয়। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাপ দিল। খুলল না দরজা। ভেতর থেকে আঁটা। অবশ্য একটু জোরে চাপ দিলেই নড়বড়ে দরজার আগল ভেঙে পড়ত। সাইকেল চালক ও-পথ মাড়াল না।

পকেট থেকে লোহার বোনার কাঁটার মত কি একটা বার করে দরজার দুই পাল্লার মধ্যে চালিয়ে দিল। এরপর সহজেই খুলে গেল খিল। এভাবে ছাড়া যে দরজা খোলা যাবে না, এ সম্পর্কে সে আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল বুঝতে পারা গেল। এবং ওখানে যে সে আগেও কয়েকবার এসেছে, এ সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দরজা পেরিয়ে ঘরে এলো সাইকেল চালক।

একধারে ছোট একটা জলচৌকির ওপর নিবু-নিবু অবস্থায় প্রদীপ জ্বলছে। বাইরের হাওয়ার ঝাপ্টা ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করায় প্রদীপের এই অবস্থা। হাল্কা ভাবে কোন রকমে দেখা যাচ্ছে ঘরখানা। সাইকেল চালক চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল,—আসবাবপত্র যা আছে, সমস্তই দারিদ্র্যের পরিচায়ক। ঘরখানাও বিশেষ বড় নয়। আট ফুট বাই আট ফুট টেনেটুনে হলেও হতে পারে।

চৌকির ওপর জরাজীর্ণ কম্বল মুড়ি দিয়ে গৃহকর্তা শুয়ে রয়েছে। এক-পা এগিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে সেই দিকে তাকাল সাইকেল চালক। অলেস্টারের

ডান দিকের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে বার করে আনল রিভলবারটা। দ্রুত সেফটি ক্যাচ সরিয়ে নিল। তারপর চাপা একটা যান্ত্রিক শব্দ

পরমুহূর্তে ঝলসে উঠল গোটা কয়েক টর্চ। ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল সাইকেল চালক।

বাসব তখন প্রায় তার মুখোমুখি। হাল্কা গলায় বলল, নাউ ইয়োর গেম ইজ আপ মিঃ মুখার্জি!

টর্চের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল দিলীপ মুখার্জির। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে, পাসকাট খেয়ে তিনি ঘরের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আর কোন পথ আছে কিনা তার অনুসন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠলেন। চমকে উঠে হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে যাওয়ায় অনুশোচনা হতে লাগল। ওই মারণাস্ত্র হাতে থাকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ সহজেই করে নেওয়া যেত।

বাসব দরজার গোড়ায় একা দাঁড়িয়ে নেই; ইন্সপেক্টর রয়েছেন, রয়েছেন কয়েকজন কনস্টেবলও। তাছাড়া সাধন তো আছেই।

ও আবার বলল, আপনি পালাবার বৃথা চেষ্টা করছেন। পুলিশ ঘিরে রেখেছে ঘরখানা। আমার ফাঁদে আপনি পা দেবেন—এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। সমস্ত আয়োজনই আমাকে করে রাখতে হয়েছে। যাকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবার জন্য এত রিস্ক নিয়ে আপনি এখানে এসেছিলেন, একটা গুলিও খরচ করলেন, সেই চাবিওয়ালা কিন্তু ওই বিছানায় শুয়ে নেই। সে পুলিশের হেফাজতে নিরাপদে আছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, সিলভার অ্যারো হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার দিলীপ মুখার্জিকে এবার আপনি আসামী হিসেবে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

চিৎকার করে উঠলেন দিলীপ, আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই...

এক্সাইটমেন্ট অনেক সময় মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলে মিঃ মুখার্জি। সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনার হাত থেকে পড়ে যাওয়া রিভলবারটা। ওটা কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে চুরি করেছিলেন। রক্তিমাদেবীর শরীর থেকে যে ৩৮ বোরের গুলি পাওয়া গেছে, তা এই রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছে প্রমাণিত হবে। তাছাড়া একজন গরীব চাবিওয়ালার বিছানা লক্ষ্য করে কেন গুলি ছুঁড়লেন, তার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। রাত অনেক হল—আমার কাজও শেষ। এবার আমরা হোটেলে ফিরব ইন্সপেক্টর। এসো সাধন—

ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর দিলীপ মুখার্জির হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়েছেন। মাটি থেকে রুমালে মুড়ে রিভলবারটা পকেটে পুরলেন এবার।

বাসব ও সাধন নিষ্ক্রান্ত হয়েছে ততক্ষণে। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ধারায় রূপান্তরিত হল।

অমৃতসর মেলে জায়গা পাওয়া গেল না। ডাউন দুন এক্সপ্রেসে কলকাতার

যাত্রী হয়েছে বাসব ও সাধন। সাধন অবশ্য কলকাতা পর্যন্ত যাবে না। গয়ায় নেমে গিয়ে জামালপুরের গাড়ি ধরবে। ওদের সঙ্গে মধুসূদনও চলেছেন। সুকুমারের এ যাত্রায় যাওয়া হল না। আইন ঘটিত সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ শেষ করে কয়েক দিন পরে সে ফিরবে।

জলে ভিজে বাসব ও সাধনের ঠাণ্ডা লেগে গেছে। মধুসূদন এই কামরাতেই রয়েছেন। চতুর্থ বার্থের অধিকারী হলেন একজন জাঁদরেল পাঞ্জাবী ভদ্রলোক।

সাধন কাচের শার্সিটা নামিয়ে দিয়ে বলল, এরকম ঠাণ্ডা আমার অনেকদিন লাগেনি! নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি!

বাসবের ঠোঁটের আগায় জ্বলন্ত পাইপ ঝুলছে।

মুখ থেকে পাইপ না নামিয়ে ও বলল, নেহাৎ কপাল না ভাঙলে এত সস্তায় নিউমোনিয়া হয় না। বালিয়া আর কতদূর? ওখানে চা খেয়ে নিতে হবে।

মধুসূদন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, মিনিট কুড়ি সময় লাগবে আরো।—একটা প্রশ্ন ছিল মিঃ ব্যানার্জি।

বলুন?

এখনো বিশ্বাস করতে মন চায় না যে দিলীপ মুখার্জিই হত্যাকারী! আচ্ছা, আপনি কিভাবে ওঁর সম্পর্কে স্যাঙ্গুইন হলেন?

আপনার এই ছোট্ট প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু খুব ছোট্ট নয় মিঃ গুপ্ত!

না হোক,—সাধন বলল, তুমি আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো। মিঃ গুপ্ত ভালো প্রশ্নই তুলেছেন।

ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দেবার পর বাসব আরম্ভ করল ঃ তদন্ত হাতে নেবার পর কিভাবে অগ্রসর হবো, প্রথমে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। তবে সুকুমারবাবু যে নিরপরাধ, এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কেন নিশ্চিত ছিলাম, সেকথা সকলের সামনে আমি বলেছি। কাজেই সন্দেহ করবার পাত্র রইলেন তিনজন ঃ কুমার বাহাদুর, মৃগাঙ্ক ঘোষ ও আপনি মিঃ গুপ্ত। দিলীপ মুখার্জিকে সন্দেহ করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। রক্তিমাদেবীকে কিসের স্বার্থে তিনি খুন করবেন? বাকি তিনজনের স্বার্থ আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করে দেখলাম। এতদিনের পোষা পায়রা ক্লাচের বাইরে চলে যাচ্ছে লক্ষ্য করে রেগে অন্ধ হয়ে মৃগাঙ্ক খুন করে থাকতে পারেন রক্তিমাদেবীকে। কুমার বাহাদুর আশাভঙ্গের বেদনায় ভুগছিলেন বোধ হয়। হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ পাচ্ছিলেন না লাস্যময়ীকে। তাঁর কামনাকে উসকেই সে চলে যাচ্ছিল অন্য পুরুষের কাছে। শেষে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হয়তো এই অপকর্ম করে ফেলেছেন। মিঃ গুপ্তর ইসুটা আলাদা। তিনি স্ত্রীর এই কদর্য রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের শনি এই নারী এখনও অসংখ্য পুরুষকে এক্সপ্লয়েট করে সুখে আছে লক্ষ্য করে তিনি মেন্টাল ব্যালেন্স হারিয়েছিলেন। হয়তো এতদিনে তাঁর মেয়ে রিলির মৃত্যুর প্রতিশোধ ওই ভাবে নিয়েছেন। এরপরই দুটো বিষয় আমার মনে

খটকা জাগাল। আমি সচেতন হলাম দিলীপ মুখার্জি সম্পর্কে। অ্যাসিডের অভাব নেই বাজারে। যে কেউ লক্ষ্ণৌ থেকে ও জিনিসটা আনিয়ে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত অ্যাসিডের বোতলে সুকুমারবাবুর হাতের ছাপ থাকবে না নিশ্চয়। কাজেই হত্যাকারী ও-পথে না গিয়ে তাঁব বোতলটা চুরি করে কাজে লাগিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। বন্ধ ঘব থেকে বোতল কিভাবে চুরি হল, যেক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট চাবি হোটেলের ভাঁড়ারেও নেই? আব সন্দেহ রইল না হত্যাকারী নকল চাবি তৈরি করিয়েছিল। নৈনিতালের মত হিল স্টেশনে অসংখ্য চাবিওয়ালা থাকবাব কথা নয়। আমি সহজেই সেই বিশেষ চাবিওয়ালার সন্ধান পেলাম। পুলিশের ভয়ে সে আমার কাছে স্বীকার করল, দুজন বাঙালি লোক তার কাছে এসেছিল চাবি তৈরি করাতে। মধুসূদনবাবুর চেহাবাব বর্ণনা দিয়ে বলল, ইনি শেষ পর্যন্ত চাবি তৈরি করাননি। দিলীপ মুখার্জির চেহারাব বর্ণনা দেবার পর জানাল, ইনি মোমের ছাপ এনে চাবি তৈরি করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এবার আমি মুশকিলে পড়লাম মোটিভ নিয়ে। অন্যান্যদের খুন করার মোটিভ জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু দিলীপ মুখার্জি বক্তিমাদেবীকে খুন করবেন কেন? দ্বিতীয়বার আমাকে যেতে হল কুমার বাহাদুরেব কাছে। কথায় কথায় তিনি বললেন, গত বছর সিলভার অ্যারো হোটেলে রক্তিমাদেবীকে কেন্দ্র করে মৃগাঙ্কবাবু ও কলকাতার এক ব্যারিস্টারের মধ্যে বিশ্রী রকমেব ঝগড়া হয। আমি আলোর সন্ধান পেলাম। দিলীপবাবুকে ব্যারিস্টারেব ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, কত লোক আসছে হোটেলে, সকলের ঠিকানা মনে রাখা কি সম্ভব? তিনি মিথ্যে কথা বলছেন বুঝতে পারলাম। হোটেলে ঘর নিলেই রেজিস্টারে ঠিকানা লিখতে হয়; মনে রাখবার তো কোন প্রয়োজন নেই। রেজিস্টারের পাতা ওল্টালেই ঠিকানা পাওয়া যেত। আসলে ব্যারিস্টারেব ঠিকানা তিনি দিতে চান না। অগত্যা আমায় কলকাতা ছুটতে হল। হোমিসাইড স্কোয়ার্ডের মিস্টার সামন্ত আমাকে অনেক সাহায্য করলেন। তিনি হাইকোর্টবার থেকে ব্যারিস্টারের ঠিকানা সংগ্রহ করলেন। আমরা দুজন গেলাম তাঁর বাড়ি। পুলিশ বড ভযঙ্কর জিনিস, তাদেব ভয় করে চলে না, এমন লোকের সংখ্যা হাতে গোণা যায় বোধ হয়। ব্যারিস্টার সাহেব আমার ও সামন্তর জেরার মুখে পডলেন। খুনের কেসে জড়িয়ে পড়বার ভয়ে শেষ পর্যন্ত বললেন সব কথা। দিলীপ মুখার্জির সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের চেনা-জানা। এগারো হাজার টাকা ধাব নিয়েছিলেন একবার দায়ে পড়ে। টাকাটা শোধ করতে না পারায় নানা অ্যাডভাণ্টেজ নিয়ে চলেছেন তাঁর ওপর দিলীপ। গত বছর তার করে ডাকিয়ে পাঠালেন নৈনিতালে। রক্তিমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আড়ালে বললেন, ওই মেয়েটিকে হোটেলে পার্মানেন্টলি রাখতে হবে, প্রচুর ধনী বোর্ডার পাওয়া যাবে তাহলে। আমি প্রপোজ করতে পারছি না, আপনি ওকে তাতান।

ব্যারিস্টার সাহেব রক্তিমার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলেন। রক্তিমা ভাবলেন,

ধনী মক্কেল হাতে এসেছে। ক্রমে আসল কথাটা বলা হল। শুধু বোর্ডারদের কাছে দেহ বিক্রয় নয়, চোরাই মদের চালানের ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে হবে—নিজের প্রাইভেট চেম্বারে দিলীপ বুঝিয়ে বললেন সব। লাভের কথাটাও তুললেন। রক্তিমা ও-পথ মাড়ালেন না। অসম্ভব রাগারাগি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। বহুবল্লভা নারীর উক্তি হল, অসংখ্য পুরুষের সঙ্গে রাতের পর রাত অতিবাহিত করা অভ্যাসে নেই। একজন অর্থশালীকে আঁকড়ে থাকতেই সে অভ্যস্ত। মৃগাঙ্ক আর দশজনের মত ব্যাপারটাকে অন্য চোখে দেখলেন। ব্যারিস্টারকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করে ঝগড়া-ঝাঁটি বাঁধিয়ে তুললেন। আমার দৃঢ় ধারণা রক্তিমা দেবী নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছিলেন। এবার নৈনিতালে এসেই তিনি মুখার্জিকে ব্ল্যাকমেলিং করতে আরম্ভ করলেন। টাকা দাও, নয়তো চোরাই মদের কথাটা ফাঁস করে দেব। বিপদে পড়লেন মুখার্জি, অগত্যা তাঁকে এই সঙ্গীন পথটা বেছে নিতে হল। তাঁরই কর্মচারীর হাত দিয়ে অ্যাসিড আনিয়ে ছিলেন সুকুমারবাবু। ঘটনাটা নিশ্চয় মোটামুটি জানা ছিল। সুতরাং পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চমৎকার একটা ব্যবস্থা হল। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল এবার বলি।

বন্ধু কুমার বাহাদুরে ড্রইংরুম থেকে রিভলবারটা সরিয়ে আনতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। নকল চাবির সাহায্যে সুকুমারবাবুর ঘর খুলে অ্যাসিডের বোতল ও পার্স সংগ্রহ করলেন। কুমার বাহাদুরের মুখ থেকেই বোধ হয় শুনে থাকবেন রক্তিমাদেবী তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায়। রাত্রে এই কারণে দেখা করতে আসবেন, তাও জানা ছিল। ওই অনুপস্থিতির সুযোগে মৃগাঙ্ক ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করেন দিলীপ, এবং তাঁকে আহত করেন। তারপর রক্তিমাদেবী ফিরে আসতেই দ্রুত কাজ সেরে পিছনের বাউণ্ডারী-ওয়াল টপকে সরে পড়েন।

একটানা এতক্ষণ বলবার পর বাসব থামল।

সাধন বলল, একেই বলে ভাগ্যের ফের। বেশ ব্যবসা করছিলেন ভদ্রলোক, অতি লোভ করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। আচ্ছা, সেদিন সকলকে ডাকিয়ে এত কথা বললে কেন? দিলীপবাবুকে কি টেম্পেট করলে?

এক্‌জ্যাক্টলি। দিলীপ মুখার্জি হত্যাকারী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেও, তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ তো সংগ্রহ করা যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমাকে ওই পথ অবলম্বন করতে হল। উনি ঘাবড়ে গেলেন, চাবিওয়ালা বলে দেবেই তাঁর নাম পুলিশের কাছে। আমার ফাঁদে তিনি পা দিলেন। চাবিওয়ালাকে শেষ করে দিলে সমস্ত দিক রক্ষা পায়। তারপর কি হয়েছে, তা তো তুমি জানো সাধন।

কথা শেষ করেই বাসব নতুন করে পাইপ সাজতে আরম্ভ করল।

মধুসূদন গুপ্ত প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে, সামনেই আলোকোজ্জ্বল বালিয়া স্টেশন।